Chaprash by Buddhadeb Guha

[Part.2]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

চাপা রাগ

বুদ্ধদেব গুহ

www.Murchona.com

চাপরাস/বুদ্ধদেব গুহ

চাপরাশ যে বহন করে সে-ই চাপরাশি। পেতলের তকমা বুকে লাগানো অনেক চাপরাশিকে আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। রাজ্যপালের, জজসাহেবের অথবা মালিকের চাপরাশি। কিন্তু এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহ এযাবৎ অচেনা এমন অনেক চাপরাশির প্রসঙ্গ এনেছেন যাঁরা শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই চাপরাশ বহন করছে। কী সে চাপরাশ ? এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় তারই আলেখ্য।

এই উপন্যাস যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বহু বুদ্ধিজীবী ও মৌলবাদী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কোপ মারার হুমকি দিতেও ছাড়েননি। অথচ এই উপন্যাসে 'ধর্ম', 'ঈশ্বর' ও অন্যান্য অনেক বিষয় নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। অন্যতর আলোর দিশারী। 'চাপরাশ'-এর বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর, কোথাও কোথাও স্পর্শকাতর এবং তর্কে-বিতর্কে বিপজ্জনক। তবু এক মর্মস্পর্শী, বেগবান গল্পের মাধ্যমে লেখক এই আখ্যানকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। আখ্যানের কল্পিত জগৎ থেকে উঠে এসে চারণ নামের মানুষটি আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে সে। ঈশ্বরবিশ্বাস যে মূর্খামি নয়, ধর্মবিশ্বাস যে গর্হিত অপরাধ নয় তা সে নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

চারণের গভীর উপলব্ধি এই রকম : 'জিষ্ণু মহারাজ একদিন 'চাপরাশ'-এর কথা বলেছিলেন। মনে আছে চারণের। একজন চাপরাশিই শুধু জানে চাপরাশ বইবার আনন্দ। সেই চাপরাশ ঈশ্বরেরই হোক কি কোনও নারীর। অথবা কোনও গভীর বিশ্বাসের।'

যাঁরা ধর্ম মানেন না, ঈশ্বর মানেন না কিংবা যাঁরা মানেন অত্যন্ত অন্ধভাবে—এই দুপক্ষের সামনেই স্পষ্টবাক্, সাহসী এবং সত্যসন্ধ লেখক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহকে যাঁরা শুধুই 'প্রেম' ও 'জঙ্গল'-এর চাপরাশি বলে জানেন তাঁদের কাছে 'চাপরাশ' এক পরম বিস্ময়ের বাহক হয়ে থাকবে।

এই বিশাল ও গভীর উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

নবী চৌধুরী,
অনুজপ্রতিমেষু

চাপরাশ প্রসঙ্গে কটি কথা

ইন্ডানা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান হরিশংকর জালান এবং এস. জি. এস. ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল চিফ এগজিকিউটিভ ড. নরেশ বেদি একাধিকবার আমাকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুঁ হিমালয়ের দেবভূমিতে যাবার সুযোগ না করে দিলে 'চাপরাশ' কখনওই লেখা হত না। তাই তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে আমাকে অগণ্য বইয়ের জোগান না দিলেও এই বই লেখা যেত না। অ্যাডভোকেট নবী চৌধুরী আমাকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও একটা ইংরেজি বই দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তার নাম "In Quest of Infinity", কবিরাজ এ. সি. রায়-এর লেখা। আমার জাপানি বন্ধু হাজিমিসো, তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের ওপরে Robert A. Thuruman-এর লেখা Essential Tibetan Buddhism বইটি উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। সুধাংশু দে বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, কোরাণ এবং নানা সাধকসাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য বইয়ের জোগান দিয়েছিলেন বিন্দুমাত্র বিরক্তি না প্রকাশ করে। তাঁর কার্তিকবাবু সেইসব বই সাইকেলে করে রাতের বেলা পৌঁছে দিয়েছেন দিনের পর দিন। সে কারণে তাঁদের কাছেও অশেষ কৃতজ্ঞ আমি। আমার অফিসের হরেন সুর প্রায় প্রতিদিনই 'প্রতিদিন' অফিসে কমল চৌধুরীর কাছে 'চাপরাশ'-এর কপি ও সংশোধিত পুল দেওয়া-নেওয়া করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

'প্রতিদিন' এবং 'Asian Age'-এর অকালে চলে-যাওয়া সার্কুলেশান ম্যানেজার মদন মিত্র এবং কমল চৌধুরীর নাছোড়-বান্দা পীড়াপীড়ি না থাকলে এই উপন্যাস আরম্ভই করতে পারতাম না। আমি compulsive লেখক নই impulsive লেখক। লেখার মতন কোনও কিছু না জমে উঠলে লিখতে পারি না। বেশি তো লিখিই না। এ কথা আমার পাঠক-পাঠিকারা জানেন।

এই দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে এই উপন্যাস সংবাদ 'প্রতিদিন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল যখন তখন প্রতিটি কিস্তি পড়ে তাদের মতামত প্রতি সপ্তাহে আমাকে জানিয়ে এই কঠিন এবং কখনও কখনও ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজে আমাকে নিয়োজিত রাখার জন্যে, প্রতিনিয়ত দীপিত করার জন্যে, বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লিপিলেখা মুখোপাধ্যায়, মুক্তি ও হীরক মুখোপাধ্যায়, মধুমিতা সেন, সুশান্ত ভট্টাচার্য, ড. কৌশিক লাহিড়ী এবং সুজাতা লাহিড়ীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বড় ধারাবাহিক লেখা লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতন অবস্থা হয় সব লেখকেরই। সেই সময়ে এমন একনিষ্ঠ এবং সৎ পাঠকেরাই, যাঁরা চাটুকার নন, ধ্রুবতারা হয়ে লেখকের মনের আকাশে বিরাজ করেন।

'প্রতিদিন'-এর ডি. টি. পি. ডিপার্টমেন্টের উমাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত বাজে হাতের লেখা কপি কম্পোজ করে এবং পুলের সংশোধনের নির্দেশও নির্ভুলভাবে পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। 'প্রতিদিন'-এর কমল চৌধুরী আমার 'কুখ্যাত' মেজাজ অনবরত হাসিমুখে প্রতিদিনই সহ্য করে গেছেন বলেও তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর ডি. টি. পি.-র সমীর চৌধুরী এবং রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব যত্ন ও ধৈর্যর সঙ্গে এ বই কম্পোজ ও মেক-আপ করেছেন। সে জন্যেও তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বড় টাইপে, রয়্যাল সাইজে নয়নলোভন করে ছেপেছেন এ বই আনন্দ পাবলিশার্স-এর বাদল বসু। বইটি বেশ বড়। সাম্প্রতিক অতীত থেকে কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেড়ে

যাওয়াতে বইয়ের দাম অনেকই হয়ে গেল। প্রকাশকের হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে প্রকাশককে মার্জনা করবেন।

অনুজপ্রতিম প্রচ্ছদ-শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়কেও অশেষ ধন্যবাদ।

বিনত,

বুদ্ধদেব গুহ

পোস্ট বক্স নং ১০২৭২
কলকাতা-৭০০০১৯

www.MurchOna.com

দর্শনের সঙ্গে এরিকা জং-এর জীবন-দর্শনের মিল আছে। এরিকা জং-এর বইটা কি পড়েছেন ?

না। কি বই ?

চারণ পাটনের এই নতুন পড়ুয়া পরিচয়ে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

"সেইভ ইওর ওন লাইফ।" সিরিয়াস বই নয়। মাঝে মাঝে পর্নোগ্রাফি বলেও মনে হবে কিন্তু সেই FUN-FROLICK-এর মধ্যে দিয়ে এক আশ্চর্য জীবন-দর্শনের কথা বলেছেন মহিলা। SALTY, CRISP, ভাল বেকন ভাজলে যেমন খেতে হয়, তেমন বই।

কৃষ্ণমূর্তি বলতেন, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই হয় অতীতে বাঁচি, নয় ভবিষ্যতে। অথচ আমাদের প্রত্যেকেরই ; বাঁচাটা যে বর্তমানেই, এই মুহূর্তটিতেই সবচেয়ে বেশি দরকার, তা আমাদের মধ্যে কজন মানি ? মানা তো দূরস্থান, জানিই বা কজন ?

চারণ চুপ করে রইল।

চারণ সেদিন তার অশিক্ষিত ট্রিলিয়নিয়র মক্কেলের ছেলেকে এখানে দেখে তার সম্বন্ধে যা ভেবেছিল, সেই ধারণা যেন দ্রুত পালটে যাচ্ছে ক্রমশ। ভাবছিল, আমরা মনে করি, কারওকে চিনি কিন্তু সত্যিই কি চিনি বেশি জনকে ? একজন মানুষের মধ্যে সম্ভবত অনেক মানুষ থাকেন।

চারণ বলল, তুমি হঠাৎ স্টেটস ছেড়ে এখানে চলে এলে কেন ? কিসে কামড়াল তোমাকে হঠাৎ ?

কামড়াল, ওই অ্যামেরিকানদের ভোগসর্বস্বতা, ওদের বাক্যাড়ম্বর, ওদের অর্থময় ডলার-মগ্ন অপসংস্কৃতি। ওই দেশটাকে সামাল না দিতে পারলে সারা পৃথিবীকে নষ্ট করে দেবে ওরা। দেবে কি, দিয়েছেই ইতিমধ্যে। সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, আত্মিক জগতে ওরা যা বিপজ্জনক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, পৃথিবীকে সার্বিক সর্বনাশের যতাখানি কাছকাছি এনে ফেলেছে, তা হিরোসিমা-নাগাসাকি উড়িয়ে দেওয়া এক কোটি অ্যাটামবোমা বা দেড় কোটি হিটলারও চেষ্টা করে পারত না। ওদের খুবই কাছ থেকে জানার পরই আমার এই তীব্র বিদ্বেষ জন্মেছে। আমি ইংরেজিতে একটা বই লিখছি। লেখা শেষ হলে সেই বই সারা পৃথিবীতে হই-চই ফেলে দেবে। না, আমি শোভা দে-র মতন লেখক হতে চাই না। ইচ্ছে করলে, শোভা দে-র চেয়ে অনেক বেশি রগরগে পর্নো লিখতে পারি আমি। না, অর্থোপার্জনের জন্যে লিখছি না সেই বই। লিখছি, পৃথিবীর মানুষদের অবধারিত আত্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্যেই।

সব অ্যামেরিকানই কি একরকম ? আমি তো বহুবারই গেছি সে দেশে, যদিও থাকিনি একটানা তোমার মতন, কিন্তু আমার তো ওদের সরল, উদার, খোলামেলা বলেই মনে হয়েছে।

তারা তাই। তবে তাদের স্বার্থমগ্নতাতে তারা এতটাই আত্মমগ্ন হয়ে গেছে যে, শুভাশুভবোধ, ধর্মবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের আত্মিক উত্তরণের সব পথই প্রায় বন্ধ।

তারপরে বলল, ভাল কি নেই ? অবশ্যই আছে। আমার বইয়ের প্রচারতো সেই গভীর মানুষেরাই করবে, যখন বেরোবে।

বাঃ। লেখো। অপেক্ষা করে থাকব। তুমি কি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিকে দেখেছিলে ?

আমি ? না, না। আমি দেখিনি। তবে তাঁর এক শিষ্যাকে দেখেছিলাম রেবেকা ম্যাকগাওয়েন। রেবেকার পরিবার অরিজিনালি স্কটল্যান্ডের। পঁচাত্তর বছর হল স্টেটসে সেটল করেছেন। রেবেকাকে জানলাম বলেই কৃষ্ণমূর্তিকেও জানলাম।

রেবেকার বয়স কত ?

আমারই বয়সী।

তোমার বয়সী সন্ন্যাসিনী !

সন্ন্যাসিনী হতে যাবে কোন দুঃখে।

ও অ্যানথ্রাপলজিতে মাস্টার করে ইয়েল উনিভার্সিটিতে পড়ায়।

তাই ?

হ্যাঁ। আমরা খুব বন্ধু। চিঠি লেখে ও নিয়মিত। আসবে বলেছে এখানে একবার। আমিও যাব ভাবছি। এর পরের বছরে Fall-এর সময়ে। ওই টিকিট পাঠাবে। বাবার পয়সাতে যাব না।

www.MurchOna.com

আমার যা সামান্য নিজস্ব সঞ্চয় ছিল তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিন্তু এখানে থাকলে তো আমার অর্থর তেমন প্রয়োজনও নেই। অর্থর চেয়ে বড় অনর্থ যে আর নেই এই কথা আমার বাবা এবং আপনার আরও অনেক মক্কেলদের দেখেও কি বোঝেননি চ্যাটার্জি সাহেব আপনি এতদিনেও ?

হুঁ।

বলল, চারণ।

তারপর বলল, ওই যে বিদেশি বললেন "ডুড্যাহারী ব্যাব্যা", তিনি কোন বাবা ?

ওঃ হো।

বলেই, হেসে ফেলল পাটন।

বলল, 'ডুড্যাহ্যারী ব্যাব্যা' নন, 'দুধাহারী বাবা'।

তিনি আবার কিনি ?

চারণ শুধোল।

ছিলেন একজন সন্ত। হরিদ্বারে তাঁর আশ্রম। বিরাট ব্যাপার। কয়েক শো কোটি টাকার সম্পত্তি। ইনকামট্যাক্সওয়ালারা শুধু খেটে-খাওয়া মানুষদেরই, সে চাকুরিজীবীই হোক বা পেশাদার বা ব্যবসায়ী, ক্যাঁক করে কলার চেপে ধরে পটকান দিতে চায়, আর "মা বাবাদের" দিকে চেয়েও দেখে না। এমন ব্যবসা আজকাল আর দ্বিতীয় নেই !

বয়স কত ওই বাবার ?

তিনি গত হয়েছেন। শুনেছি দু-দুবার কায়াকল্প করেছিলেন।

কায়াকল্প ! সেটা আবার কি জিনিস ?

ওই পুনর্মুষিকভবঃ-র উলটোটা আর কী ! জীবন ফুরিয়ে গেলে কিছু ক্রিয়াকর্ম করে অবার ব্যাকগিয়ারে ফিরে গিয়ে ফিনসে শুরু করার ফর্মূলাকে বলে কায়াকল্প।

সত্যি ?

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এখানের অনেকেই বিশ্বাস করেন।

তাহলে এই ফরমূলার পেটেন্ট নিয়ে নেয় না কেন কেউ ? আমেরিকানদের তো এত পয়সা ! কায়াকল্প থাকতেও তারা মরতে যায় কেন বুদ্ধুর মতন ? থাকগে, সে কথা। তা সেই বাবার নাম দুধাহারী বাবা কেন ?

বললামই তো, যে সেই বাবা দেহ রেখেছেন। আড়াইখানা আস্ত জীবনের বিস্তর গাঁটওয়ালা গাড়ি পার করে দিয়ে। এখন তাঁর এক শিষ্য সেই আশ্রমের মালিক। মানে, তিনিই গুরুর নির্দেশে সেই সাম্রাজ্য ইনহেরিট করেছেন আর কী ! বহু জায়গাতেই নাকি আছে দুধাহারীবাবার আশ্রম। শুধু হরিদ্বারেই নয়।

তাই ?

হ্যাঁ। আর সেই শিষ্য কিন্তু বাঙালি। কলকাতার এঞ্জিনিয়ার না চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কি না কি ছিলেন তিনি আগে। এখন ঘোর সন্ন্যাসী।

ঘোর সন্ন্যাসী মানে ?

আসলে ঘোরতম বলাই উচিত ছিল। 'ঘোর' কথাটা বেশি ব্যবহার করি বলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

দুধাহারী মানে কি ?

ওরিজিন্যাল বাবা দুধ খেয়ে থাকতেন। ওঁদের আশ্রমে গেলেই এখনও জনগণকে ঘোল বা মাঠা খাওয়ান ওঁরা বিনি-পয়সাতে। আর গণ্যমান্যদের দুধ। অনেক গরু আছে আশ্রমের। সব আশ্রমেরই গরু আছে।

আশ্রমের মধ্যেই গরু থাকে ?

চারণ শুধোল।

পাটন বলল, তা থাকে কিছু। তবে তারা দু-পেয়ে গরু। চারপেয়েদের জন্যে সব বড় আশ্রমেরই

www.MurchOna.com

এক বা একাধিক অন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সেখান থেকে দুধ দুইয়ে নিয়ে আসা হয়। তবে হরিদ্বারে দুধাহারী বাবার আশ্রমের এলাকা বিরাট। সে আশ্রমের ভিতরেও থাকতে পারে গরু। ঠিক জানি না। মনে হয়, থাকে। গরুদের দেখভাল করার জন্যে বহুত লোকও আছে।

দুগ্ধপায়ী বাবা না হয়ে দুধাহারী নাম কেন ?

চারণ শুধোল।

পাটন হেসে বলল, আমি তো নাম শোনা পর্যন্তই সেই কথাই ভাবি। আরও ভাবি, আমি হলে, দুধাহারী না হয়ে স্তন্যপায়ী নাম নিতাম।

চারণ বলল, আমরা সকলেই তো স্তন্যপায়ী। মানুষ মাত্রই তো স্তন্যপায়ী।

পাটন বলল, সে তো মাতৃস্তন্য। আমি আশ্রম করলে মেলা সুন্দরী শিষ্যা জুটাতাম। তারপর স্তন্যপানের অসুবিধা বা অভাব থাকত কি ? নিতান্ত মাথা-মোটা না হলে কেউ দুধাহারী হয় ?

হেসে উঠল চারণ, পাটনের কথাতে।

বলল, তুমি এক নম্বরের বাঁদর।

বাঁদরের ছেলে কি বাঘ হবে স্যার ? আমার পেডিগ্রি তো আপনার জানাই। বাঁদর নাচানোই তো আপনার পেশা ছিল।

তোমার ভোঁদাইবাবা না গাড্ডুবাবা সত্যি কোথায় থাকেন বলো তো ?

ওই নামে কোনও বাবা নেই। ও আমারই দেওয়া নাম। তবে তিনি থাকেন দেবপ্রয়াগে।

অনন্তানন্দ নামের এক বাবাও সেখানে থাকেন বলে শুনেছি, অনেকেরই কাছে।

তিনিই কি তোমার গুরু ?

অনন্তানন্দও থাকেন। তবে আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি থাকেন অন্যদিকে। তাঁকে আমি ভোঁদাইবাবা গাড্ডুবাবা ছাড়াও অন্য একটি নামেও ডাকি। অবশ্যই আড়ালে।

কি নামে ?

মুখখিস্ত্যানন্দ বাবা।

মুখখিস্ত্যানন্দ বাবা মানে ?

মানে, যিনি মুখ খিস্তি করেন।

সমাস নাকি ?

আজ্ঞে না স্যার। সন্ধি। সুধীর চক্রবর্তী মশায়ের বইয়ে পড়েছিলাম। সুধীর চক্রবর্তী মশায় একজন ভার্সেটাইল মানুষ। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন। চমৎকার প্রবন্ধ এবং রম্যরচনাকার। সংগীতজ্ঞ। সংগীত সমালোচক। অত্যন্তই গভীরতা গুণসম্পন্ন মানুষ। সুরসিকও বটেন। যদি গল্প উপন্যাস লিখতেন তবে ঔপন্যাসিক বা গল্পকার হিসেবে মোটা মোটা হরফে যাঁদের নাম বেরোয় বড় বড় কাগজের বিজ্ঞাপনে তাঁদের অনেকেই "হাপিস" হয়ে যেতেন। গুণপনার সঙ্গে এখন তো নাম-যশের কোনও কানেকশান নেই। আপনি জানেন নিশ্চয়ই।

মুখখিস্ত্যানন্দ বাবার কথা ওঁর কোনও বইয়েতে আছে ?

"সদর-মফস্বল"। একটি অসাধারণ বই। আরও অনেক বাবার কথা আছে তাতে।

যেমন ?

যেমন কম্বলনানন্দ বাবা। তদ্বিরানন্দ বাবা। অপ্রিয়সত্যানন্দ বাবা। ভ্রমণানন্দ বাবা। গুরু শব্দটির মানেও তো ওই বইয়েতেই প্রথম পড়েছিলাম। 'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে আলো। যিনি অজ্ঞানকে অন্ধকার থেকে আলোর ইশারা দেন তিনিই হচ্ছেন গুরু। আপনি গুরু শব্দের মানে কি জানতেন আগে ?

না। তা, সুধীরবাবুর ওই বইয়ের প্রকাশক কে ?

প্রজ্ঞা।

পাবলিশারের নাম ?

www.MurchOna.com

ইয়েস। স্থিতপ্রজ্ঞ যাদের নাম তাঁরা ছাড়া এমন ভাল বই আর কেই বা প্রকাশ করতে পারতেন ? ঠিকানা মনে আছে ?

বিলক্ষণ আছে। সুধীর চক্রবর্তীর বই পড়ে কত কী শিখলাম, আর মারলাম আজ পর্যন্ত। আমি কি এমনই নিমকহারাম যে, তাঁর এমন বই-এর একটু প্রচারও করব না ? 'প্রজ্ঞা'র ঠিকানা হচ্ছে ২০ নং, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯। আর সুধীরবাবুর ঠিকানা যদি চান, তাও দিতে পারি।

তাও দাও।

কাগজ আছে ?

তা আছে।

দুর্বুদ্ধিজীবী মাত্ররই পকেটে আর কিছু না থাক কাগজ কলম ঠিকই থাকে সর্বক্ষণ। লিখে নিন। আমি চিঠি দিয়েছিলাম ওঁকে তাই ঠিকানা জানি। এই দুনম্বরী দুনিয়াতে এমন পণ্ডিত, গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তির কদর হয় না আর ব্যাঙ-ব্যাঙাচিরা নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে চড়কের গাজনের বাঘ সেজে। ছিঃ।

পাটনের ছিঃ আর ভীমগিরি মহারাজের ছেঃ রে মধ্যে বিশেষ তফাৎ দেখল না চারণ।

চারণ বলল, সত্যি বলছি পাটন, তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম ছিল। তোমার মধ্যে যে এই মানুষটিও ছিল তা কল্পনারও বাইরে ছিল আমার।

আমার গুরু বলেন, সব বাঞ্চোতের মধ্যে একজন করে পৃথু ঘোষ থাকে। যার মধ্যে অনেকগুলো মানুষ।

সে আবার কে ? পৃথু ঘোষ।

সে এক ফিকশানাল ক্যারেকটার। 'মাধুকরী' উপন্যাসের একটি চরিত্র।

নায়ক নয় ?

না। সেই উপন্যাসে কোনও একজন নায়ক নেই। প্রকৃতিই নায়ক। সব চরিত্রই নায়ক এবং নায়িকাও। কোনও একজন মানুষকেই নায়ক অথবা নায়িকা হওয়ার কৃতিত্ব দেননি লেখক। সে বইটিও পড়েননি আপনি নিশ্চয়ই।

নাঃ। বাংলা উপন্যাস-টুপন্যাস আজকাল পড়তে ইচ্ছে যায় না। নাইন্টি পার্সেন্টিই তো ট্র্যাশ।

বলল, চারণ।

বাঃ। যাচাই করার ধৈর্যটুকুও নেই। বাতিল করাই আপনার সহজ জয়। এক্স-পার্টে জাজমেন্ট। শোভা দে কি সাহিত্য ?

মনে মনে চারণ বলল, কিই-বা পড়েছি আর করেছি। এতগুলো বছর তো তোমার বাবার মতন অশিক্ষিত পয়সাওয়ালাদের চরিয়েই কাটিয়ে দিলাম। বৃথা, বৃথা, বৃথা! তারপর সুধীর চক্রবর্তীর ঠিকানাটি লিখে নিল, রামচন্দ্র মুখার্জি লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিনকোড ৭৪১১০১, পঃ বঃ।

খুব কি ঘুম পেয়েছে আপনার ?

পাটন বলল, একটু পরে।

না তো!

আমি কিন্তু আর কথা বলব না। আমার গাঁজার অমন রমরমে নেশাটাই মাটি হল। সব কনসেনট্রেশনই নষ্ট হল। কিন্তু আপনি হোটেলে ফিরবেন না ? রাতে ঘুমাবেন না নাকি ?

নাঃ। ভাবছি কাল সকালেই ফিরব একেবারে। একটা রাত কাটিয়েই দেখি না বাইরে। তারপর তোমাদের আশ্রমে যদি নিয়ে যাও তো তোমার সঙ্গেই চলে যাব।

যাবেন ? খুবই কষ্ট করে থাকতে হবে কিন্তু। গুহার পাথরের মেঝেতে এক কম্বল বিছিয়ে শোওয়া আর গায়ে আর এক কম্বল। ধুনী জ্বলবে অবশ্য। পারবেন কি স্যার ? শীত তো এখনও পড়েইনি। সবে কলির সন্ধে।

তারপর বলল, তার উপরে মুখখিস্ত্যানন্দর খিস্তি ? পারবেন তো সহ্য করতে ?

তা, তুমি পেরে থাকতে পারলে, আমিও পারব।

গা জ্বালা করবে কিন্তু। অপমানে, মনে হবে, নীচের গঙ্গা বা অলকানন্দাতে ঝাঁপ দিয়ে ইহলীলা

www.MurchOna.com

যোচান। এরকম একটা বদমেজাজি রক্তখেকো মানুষ আমি আর দেখিনি।

এতই যদি অপছন্দ তাহলে থাকো কেন?

সেইটাই তো বুঝি না। মানুষটার অন্তরটা ওয়েসিস আর বাইরেটা কাঁটা-ঝোপ, ক্যাকটাস।

বলল পটন।

ঠিক আছে। এখন আর কথা নয়। ভাবুন। ভাবনাই ধ্যান। নৈশব্দ্যর চেয়ে বড় শব্দময়তা আর কিছুই হয় না। বাইরে থেকে দেখে যখন মনে হবে আপনি নীরব তখন আপনার মাথার মধ্যে যজ্ঞিবাড়ির কড়ায় ফুটন্ত তেলের মতন তরল ভাবনা ফুটবে। আমরা এই জীবনে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বড় বেশি সময় নষ্ট করি। যত কম কথা বলা যায়, মানুষের চিন্তা শক্তি ততই বাড়ে। আমার গুরু বলেন।

তাই?

ইয়েস।

বলেই বলল, চলুন একটু আড়াল খুঁজে বসা যাক। হাওয়াটা বরফের তীরের মতন খোঁচাচ্ছে।

তোমার জামাকাপড়ও তো দেখছি কিছু নেই। শীত করে না?

নাঃ। শরীরের সব অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিতে হবে। এক মারাঠি সন্ত ছিলেন, সন্ত তুকারাম...

শুনেছি।

কার কাছে?

ভীমগিরি মহারাজের কাছে।

তিনি কে?

ধিয়ানগিরি মহারাজের চেলা।

বাবাঃ! আপনি দেখি আসামাত্রই through proper channel হাঁটাহাঁটি শুরু করেছেন।

তা কী আর করা যাবে! একটা কথা মনে হল। তোমাদের আশ্রমে গেলে আমি খাব কি? আমাকে খেতে দেবে কেন তোমরা?

আবার কেন? মোটা মাল দেবেন তাই। আপনার মতন শাঁসালো হঠাৎ-বৈরাগি পেলে ছেড়ে দেবে এমন নিস্পৃহ সাধু কি আছেন?

সাধু-সন্তদের নিয়ে এরকম ইয়ার্কি মারা তো ঠিক নয়।

সকলেই কি আর ফেরেববাজ! সাচ্চাও বহুতই আছেন। Exception proves the rule। তবে অধিকাংশই আমার মতন সাধু।

মাধুকরী করে খেতে পারব না? শুনেছি, সাধুরা সবাই মাধুকরী করেই খান।

"মাধুকরী" শব্দটির মানে জানেন কি?

কে না জানে!

অত সোজা নয় মানেটা। সকলেই ভাবেন যে, জানেন।

বলেই, পটন সিঁড়ি থেকে উঠে ঐ রামজির চাতালের উলটোদিকে একটি সরু চড়াই-এর দিকেই এগোতে এগোতে বলল, সুধীরবাবুর ওই "সদর-মফস্বল" বইয়েতে 'মাধুকরী'র কথাও আছে।

কি কথা?

চলুন। ওখানে ধুনীর পাশে বসেই বলব।

সেই চড়াই উঠেই দেখা গেল গাছ নেই বটে কিন্তু একটি পাঁচিলের আড়ালে একটা চাতাল। এখানে রামজির মূর্তি নয়, মহাদেবের মূর্তি আছে ছোট মন্দিরে। ধুনীর চারপাশে নানা ধরনের সাধু সন্ত বসেছিলেন। একজনই শুধু কথা বলছিলেন। খুবই নিচু স্বরে। এক জটাজুটসমলিত সাধুর সঙ্গে। সেই সাধুর দাড়িগোঁফের অবস্থাও তাঁর দেহাতি কম্বলটিরই মতন। কতদিন যে ধোওয়া হয়নি, কে জানে। সংসার-বৈরাগ্যের সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিরোধ থাকাটা খুব জরুরি কি? কে জানে? ভাবছিল, চারণ।

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

অন্যেরা সকলেই হয়তো নিজ নিজ 'নিজৌষধি'র গুণেই মৌনী হয়ে আছেন। নিমীলিত অথবা অর্ধনিমীলিত চোখ। যাঁদের চোখ খোলা আছে সেই সব অধিকারীর চোখ ঘোরতর রক্তবর্ণ। চারণের গা গুলিয়ে উঠল ওই সব দাড়ি-গোঁফ এবং কম্বলে যে কত রোগের অদৃশ্য জীবাণু এবং কত হাজার ছারপোকা আছে তা ঈশ্বরই জানেন! কেন জানে না, হঠাৎই ছারপোকার বৈজ্ঞানিক নামটা মনে পড়ে গেল ওর। "হেটোরোপটেরা"। তারপরই মনে হল যে, বৈজ্ঞানিক নাম জানলেও ছারপোকার কামড়ে পশ্চাৎদেশ-এ যতখানি জ্বলন হবে, অবশ্য না জানলেও তাইই হবে।

ছিলিমটা পায়ের কাছে নামিয়ে তার হাইওয়াইয়ান চপ্পল-পরা খালি পা দুটি আগুনের দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে পাটন বলল, একটা মজার গল্প বলেছেন সুধীরবাবু তাঁর বইয়ে, মাধুকরী সম্পর্কে।

বলোই না শুনি।

চারণ বলল।

সুধীরবাবুর মতে, 'গিরি' একটা পার্সী প্রত্যয়। আপনি যে সন্ন্যাসীগিরি করে 'মাধুকরী' করে খাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তার আগে একটু ভাবনা-চিন্তা করবেন। বাবুগিরি, মিস্ত্রীগিরি, কুলিগিরির সঙ্গে সন্ন্যাসীগিরি শব্দটি কি আদৌ মানানসই? তা ছাড়া, সাচ্চা সাধুও বেশি দেখতে পাবেন না। সাচ্চা যাঁরা, তাঁরা মিরগেল মাছেরই মতন। শান্ত কালো জলের গহিনে তাঁরা কাদার মধ্যে থাকেন। জলের উপরিভাগের স্তরে অথবা আমাদের দৃশ্যমান সমাজে তাঁদের চিহ্নবাহী বুড়বুড়িটুকুই তল থেকে উঠে বুঝিয়ে দেয় যে তাঁরা আছেন।

'মাধুকরী'র কথা বলছিলে যে।

হ্যাঁ। বলি। গাঁজা আমার জ্ঞান গুলিয়ে দিয়েছে। "সদর মফস্বলে" সুধীরবাবু বলছেন যে "গেরুয়া হল একটা ইন্টারন্যাশানাল পাসপোর্ট আর কমণ্ডুলু হল পরজীবী পরিশ্রমহীন জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।"

এটা কি তোমারও মত পাটন?

আমি কে এসেছি মাকড়া? আমার মতটা ইরেলিভেন্ট।

কমণ্ডুলু "অত্যন্তই সর্বনেশে বস্তু"।

কেন?

যে একবার কমণ্ডুলু থেকে খাওয়ার অভ্যেস করেছে, তাকে আর জীবনে কিছুই করে খেতে হবে না। কমণ্ডুলু বলতে আমরা বোঝাই পেতলের বা তামার ছোট্ট একটি জিনিস। কিন্তু সাধুদের কমণ্ডুলু কাঠের তৈরি হয়। অনেকই বড়। আর সেইটেই হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সাধুরা 'মাধুকরী'তে বেরোন। তারই মধ্যে নানান খাওয়ার জিনিস তুলে দেন গৃহীরা। 'মাধুকরী' করে খাওয়া আর "ভিক্ষা" করে খাওয়া এক নয়। সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা চান না। ভিক্ষা চাইতে তাদের ইগোতে বাধে।

আহা। তুমি যে দেখি আমাদের অনন্ত বিশ্বাসের মতন বললে। কথা বলতে বলতে দেড় মিনিট বাদে বাদে বলেন, "হ্যাঁ। কী যেন বলছিলুম?" 'মাধুকরী'র গল্পটা শেষই করো না।

একদিন এক সাধু, কমণ্ডুলু হাতে গ্রীষ্মদুপুরের নির্জন পথ বেয়ে চলেছেন। এক মোটা-সোটা শেঠ গিন্নী···শেঠানি···

শেঠানি মাত্রই যে মোটা হন না এটা তোমার জানা উচিত। বহুত শেঠ-শেঠানি দেখেছি আমি। এই সব Wrong notions থেকে জনগণকে মুক্ত কর।

জনগণের মুক্তি তো রাজনৈতিক নেতা আর আমেরিকান এনআরআই-দেরই হাতে। আমার কি শক্তি আছে যে ভুবনের ভার হাতে নেব? যাকগে। শেঠানি তো সাধুকে ডেকে পুরী-হালুয়া ইত্যাদি ইত্যাদিতে কমণ্ডুলু ভরে দিলেন। পুণ্যপ্রত্যাশী তিনি বাকিটা সম্ভবত রাখলেন কোনও আনমনা গরু বা একমনা ষাঁড়ের জন্যে।

তারপর?

তারপর সাধুর তো দিল খুশ। ভাবলেন, আজ দুপুরের খাওয়াটা জব্বর হবে। যা গরম! আর-একবার চানটা করেই নেওয়া যাক।

www.MurchOna.com

এই মনস্থ করে পথপাশের এক সুন্দর টলটলে দীঘির সামনে দাঁড়ালেন। এদিকে সুস্বাদু খাবার ভর্তি কমণ্ডুলু নিয়ে কি করেন ? মাটিতে রাখলে কাক-কুকুরে সাবড়ে দেবে। পাখ-পাখালিও ছোঁ মারতে পারে। তাই তিনি বুদ্ধি করে দীঘির পাশের একটি গাছের ডালে, যত উঁচুতে তাঁর হাত পৌঁছয় আর কী, কমণ্ডুলুটি ঝুলিয়ে দিলেন। পাতাপুতার জন্যে পথচারীদের চোখের আড়ালে থাকল আর দ্বিপদ-চতুষ্পদেরও নাগালের বাইরে থাকল।

তারপর ?

তারপর ধরাচূড়া খুলে ফেলে নাগা-সন্ন্যাসী হয়ে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করলেন। তারপর ব্রীড়াবনত বধূর মতন সলজ্জে জামাকাপড় পরে নিলেন।

সলজ্জে কেন ?

একটা মদনটাকি পাকি চোখ টেইর‍্যে দেইকতেচেল তেনাকে দীঘির পাশের পার থেইকি। আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে চান করচিলেন তো। লজ্জা পাওয়া স্বাবাবিক।

চারণের চোখের সামনে একজন শালপ্রাংশু দামড়া সন্নিসীর ন্যাংটো রূপ ভেসে উঠতেই গা গুলিয়ে উঠল। নারীরা কোন চোখে দেখেন তা বলতে পারবে না, কিন্তু রোমশ পুরুষের নগ্নরূপ সম্ভবত পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কুৎসিৎ দৃশ্য।

ব্যোম শংকর।

হঠাৎ বলে উঠল পাটন।

ব্যোম শংকর।

রিফ্লেক্স অ্যাকশানে বলে উঠল চারণ।

চান সেরে, পরিধেয় পরিধান করে, খুশি-খুশি মনে যখন কমণ্ডুলু যে-গাছে ঝোলানো ছিল সে গাছের দিকে ফিরলেন সাধুজী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। দেখলেন, একটা উট, চার পা মাটিতে জম্পেস করে গেঁথে, জমিয়ে পুরী-হালুয়া খাচ্ছে। খাচ্ছে মানে, ততক্ষণে খেয়ে সাবড়ে দিয়েছে।

বল কি ? উট ?

উট কোথা থেকে এল ?

চারণ জিগ্যেস করল অবিশ্বাসের গলাতে। গল্পের গরু গাছে চড়ে বলে শুনেছি কিন্তু গল্পের উটও যে না-চড়েও মজা মারে এমন তো শুনিনি।

পারে। বিলক্ষণ পারে।

পাটন বলল।

উটটা কি তোমারই কবি-কল্পনা ?

আজ্ঞে না স্যার।

উটটা সুধীরবাবুর "বইয়েতেই ছেল।" তবে আমি একটু icing দিয়েছি মাত্র। কেক যদি ভাল baked হয় তবে তার উপরে icing না থাকলে কেকেরই বে-ইজ্জৎ। যে কোনও ভাল গল্প পুনর্বার বলার সময়ে তা যদি পল্লবিত না হয়, তবে গুণী ওরিজিনাল গল্পকারের প্রতি "অচ্ছেদ্দা" প্রদর্শন করা হয়।

তারপর ?

দাঁড়ান, ছিলিমটা ভরে নিই।

ছিলিম না ভরেই তো দিব্বি চালাচ্ছ।

সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের "দেশে বিদেশেতে" পড়েছিলাম, "স্বপ্নেই যখন পোলাও রাঁধবে (নিশ্চয়ই বিরিয়ানির কথাই বলেছিলেন। আহা কতদিন খাই না গো! "কেচ্ছাসাধনে মুক্তি সে মুক্তি আমার লয়।") তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করবে কেন ?" সুধীরবাবুর গল্প মেরেই যখন চালাচ্ছি তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই সে সব একটু পল্লবিত করছি মাত্র।

তারপর বলো, উটকে আমদানি করলে কোত্থেকে ?

www.MurchOna.com

আ মলো যা। আমি আনতে যাব কোন দুঃখে। সে তো গল্পতেই চরছিল। উটটা ধোপার। জায়গাটা যে রাজস্থান! সেখানে উটেরা গাধার কাজ করে আর সেখানের মানুষেরা যখন কলকাতাতে বাণিজ্য করতে আসে তখন বাঙালিরা তাদের গাধার কাজ করে। অর্থাৎ ভার বয়। তা উটের মালিক তো কাপড় শুকুতে-দেওয়া বাঁশের খোঁটা হাতে করে দৌড়ে এসে উটকে দে-দমাদ্দম! দে-দমাদ্দম। সন্ন্যাসীর খাবার খেয়ে ফেলে এমন অধার্মিক উট!

তারপর?

তারপর সাধুজি ঐ নৃশংস প্রহার দেখে দৌড়ে এসে বললেন, করো কি হে, করো কি? অবোলা জীব, না হয় না জেনে অপরাধ করেই ফেলেছে, তাই বলে, তুমি কি তাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে? আমার 'মাধুকরী'র খাবারও না হয় ও খেলেই। কেষ্টর জীবই তো।

ধোপা কাঁদতে কাঁদতে বলল, মারছি আমি সে জন্যে নয় বাবাজি।

তবে কি জন্যে মারছ?

মারছি, কারণ আমি গরীব মানুষ, খেটে খাই। এই রোদের মধ্যে শীতে, গ্রীষ্মে ডাঁই-ডাঁই কাপড় কাচি। ওকে তো কিনেছিলাম আমার মোট বইবারই জন্যে। কিন্তু আজ যে ব্যাটা কমণ্ডলু থেকে খাওয়ার অভ্যেসটি রপ্ত করে ফেলল, আর কি কোনওদিন সে খেটে খাবে? কেষ্টর এই জীবটিও সাধুদেরই মতন আরামি, হারামি হয়ে গেল। আমার কি হবে এখন? হায়! হায়! হায়!

চারণ জোরে হেসে উঠল।

নিমীলিত ও অর্ধ-নিমীলিত কিছু রক্তবর্ণ আধ-ফোটা চোখ চারণের বিব্রত মুখে ল্যাসার বিম-এর মতন ঝলক-ঝলক আলো ফেলেই আবারও মুদিত হয়ে গেল।

পাটন আবারও কলকে ভরে নিয়ে টিকেতে আগুন দিয়ে এক জোর টান লাগাল তাতে।

মুখে বলল, ব্যোম শংকর।

চারণও আবার রিফ্লেক্স অ্যাকশানে বলে ফেলল, 'ব্যোওওম্ শংকর।

ধ্বনি হলে প্রতিধ্বনি তো হতেই হয়! "সাবাবিক"।

আজ দেওয়ালি।

চারণ, দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা আর গঙ্গার সঙ্গমস্থলের সোজা উপরে কালো পাথরের মধ্যে খোদিত যে সব আশ্রয়স্থল আছে, যাদের দূর থেকে বৌদ্ধ গুম্ফার মতন দেখায়, তারই একটিতে বসে ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। আর তেমনই হাওয়া। নানা মন্দির থেকে ঘণ্টাধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে। প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বলছে দিকে দিকে। হাওয়াতে তাদের শিখা সতত আন্দোলিত।

স্থানভেদেও শিশু ও কিশোরদের স্বভাবের কোনও তারতম্য হয় না। তারা পটকা ফাটাচ্ছে। তারাবাজি। রংমশাল। তবে সামান্যই। মেয়েরা সুন্দর আবরণে আভরণে সেজেছে। রাতভর পুজো হবে ঘরে ঘরে। মন্দিরে মন্দিরেও।

আজকে চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল চারণের হৃষীকেশ-এ। মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল তাকে নিয়ে। জানে না, সত্যি সত্যি দেখা হলে, আলাপিত হলে, তারপর কেমন লাগত। তবে একটা কথা ঠিক যে, চারণ যে পাটনের সঙ্গে ত্রিবেণী ঘাটে, ভীমগিরি ও ধিয়ানগিরির সঙ্গ ছেড়ে এমন না বলে-কয়ে হৃষীকেশ ছেড়ে চলে আসতে পেরেছে, এই মস্ত কথা। এতবছর কলকাতাতে শত বন্ধনের মধ্যে অজানিতেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। কোনও বাঁধনই যে ছিন্ন করা যাবে আদৌ, তা ভাবার মতন সাহস পর্যন্ত ছিল না ওর। অথচ দিব্যি তো পারছে।

www.MurchOna.com

ভীমগির, ধিয়ানগিরি, মাদ্রী এবং অদেখা চন্দ্রবদনীদের নিয়ে হৃষীকেশে এই নতুন করে বিনিসুতোর সংসার পাততে পাততেও যে সদ্য-নামানো শিকড় উপড়ে নিয়ে এমন করে চলে আসতে পেরেছে তাতে ওর ভেতরের ছেড়ে-আসার ক্ষমতা সম্বন্ধে ও ক্রমশই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এবারে ও পারবে। আগুন যেমন হাতে একটু একটু করে সওয়াতে হয়, অভ্যেস এবং অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেও বোধহয় তেমনই একটু একটু করে নিজেকে অভ্যস্ত করতে হয়। একটু সইতে সইতেই অনেক সয়।

কোথায় কতদূরে পড়ে রইল কলকাতার উচ্চকিত, তারস্বরে টিভি ও রেডিও চালানো, মিউজিক সিস্টেমস-এর গগন-নিনাদি শব্দময় জগৎ। ট্রাম-বাস, মিনিবাস, অকারণে হর্ন-বাজানো সারি-সারি গাড়ি। আর কোথায় এসে পৌঁছেছে সে! সিনিবালি অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে বহু নীচ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে-যাওয়া গঙ্গা আর অলকানন্দার ঝর-ঝরানি আর সঙ্গমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর সাধু সন্নিসীদের অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টাধ্বনি, নারী ও শিশু কণ্ঠের নিক্কণ।

এক অবিশ্বাস্য, অনাবিল, নতুন জগৎ। চারণ ভাবছিল, এইরকম সব জায়গাতেই প্রাচীন ভারতবর্ষর অবস্থান, হিন্দু ভারতবর্ষ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী। একশভাগ দিশি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষাতে ঋদ্ধ কিছু ভারতবাসীর বাস এখানে। এখানে হাফ-গেরস্তর মতন পণ্ডিতম্মন্য হাফ-আঁতেলদের ভিড় নেই। মিডিয়ারও কোনও ভূমিকা নেই। এখানের ভারতবর্ষ তার নিজের আত্মিক জোরে, নিজের মধ্যের উৎসারিত জ্ঞানগম্যি নিয়ে, ধ্যান-ধারণা নিয়ে, মহানন্দে ঈশ্বর-ভজনা করে কালাতিপাত করে। কোনওরকম ঐহিক ও জাগতিক বাসনা-কামনাই নেই এখানে বাস-করা মানুষদের। দিনান্তে দুমুঠো জুটবে কি জুটবে না, সেই চিন্তাও নেই।

আনন্দের এবং সুখের সংজ্ঞাই যেন চারণের কাছে পুরোপুরি পালটে যাচ্ছে। তবে সবই কি আর অনাবিল? সাদা থাকলে কালো থাকবেই। আর কালো না থাকলে সাদার ভূমিকাই বা পরিস্ফুট হবে কী করে! এই তো "কীওরোস্কিওরো" (chiaroscuro) রেমব্রান্ট-এর জমিদারি।

গতকাল পাটনের গুরুর আশ্রমে বসেছিল সে এই সময়েই। আশ্রমটি দেবপ্রয়াগের ওপারে তো বটেই, অলকানন্দারও ওপারে। পুরনো পায়ে-চলা যে পাথুরে পথটি আছে ভিয়াসি থেকে দেবপ্রয়াগের, তারই পাশে পাহাড়ের উপরের এক কন্দরের অভ্যন্তরে সেই আশ্রম। সেই কন্দরের চাতাল থেকে পুরো দেবপ্রয়াগ, অলকানন্দা, গঙ্গা এবং সঙ্গমও ছবির মতন দেখা যায়। অলকানন্দার উপরের একটি সরু ঝুলোনো সেতু পেরিয়ে আসতে হয় দেবপ্রয়াগে ওদিক থেকে। এদিকটা আজকাল শান্ত। কারণ, একেবারেই জনমানবহীন। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে যেসব গ্রাম আছে সেইসব গ্রামের দুএকজন মানুষ ছাড়া বড় কেউই ঐ পথ আর ব্যবহার করে না। আশ্রমের উপযুক্ততম জায়গা। তবে আজ দিওয়ালি তাই ঘোর কমলা-রঙা সিঁদুর পরে রং-চঙে নতুন শাড়ি পরে পেতলের এবং সোনার গয়না পরে ফর্সা ও দোহারা গাড়োয়ালি মেয়েরা চারদিক থেকেই পায়ে হেঁটে আসছে দেবপ্রয়াগে। কেউ কেউ হয়তো থেকেও যাবে। কেউ কেউ কলকল করে কথা বলতে বলতে নিস্তব্ধ পাহাড় নদী আর গাছ-গাছালিকে চমকে দিয়ে, হ্যাজাক অথবা টর্চ-এর আলোতে আলো-ছায়ায় হেঁয়ালি সৃষ্টি করে নদীর পাশের সুউচ্চ পাহাড়ি পথে ফিরে যাবে যে যার গ্রামে।

তবে সন্ধের পরে নানারকম দেহধারী ও বিদেহীদের ভয়ে কেউই বড় একটা ঘরের বাইরে যায় না এসব অঞ্চলে। বহু যুগের সংস্কার। তবে আজ দিওয়ালি। আজ সব সংস্কার এবং ভয়েরও বোধহয় ছুটি।

পাটনের গুরুর আসল নাম ভোলানন্দ। ওঁর সঙ্গে কিন্তু ভোলানন্দগিরি মহারাজের কোনও সম্পর্ক নেই। ওঁর, মানে, ভোলানন্দজির কোনও গুরু আদৌ ছিল না কি না তাও জানে না চারণ। হয়তো পাটনও জানে না। শিষ্য তো নেইই! চামচেগিরিতে ওর বিশ্বাস নেই। অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে আসে ওঁর কাছে। আবার চলেও যায়। কেন যে আকৃষ্ট হয়, তা ওঁকে না দেখলে, ওঁর সঙ্গে কথা না বললে, কেউই বুঝবেন না। নইলে পাটনের মতো "রাবণ" বধ হয়ে যায় ওঁর হাতে!

ওঁর ব্যবহার একেবারেই সাধু-সন্নিসীর মতন নয়। সত্যিই মুখখিস্তিও করেন। তবে অত্যন্ত

www.MurchOna.com

উচ্চস্তরের সাধক যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভোলানন্দ কারওকে আসতেও বলেন না, যেতেও বলেন না।

'মাধুকরী' করে খাওয়া কাকে বলে, তা ওই সাধুকে না দেখলে চারণ জানতেও পারত না।

এই তিন-চারদিনেই চারণ তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং নিরভিমান সাধারণ মানুষের মতন ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে। তবে কথা বড় একটা বলেন না। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিন মৌনী থাকেন। যে দুদিন কথাবার্তা বলেন, সেই দুদিন অবশ্য সাধারণ মানুষের মতনই বলেন। জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নর জবাব দেন।

তবে ইনকামট্যাক্সের ঝামেলা মিটবে কি না ? সন্তান হবে কি না ? ভায়ের সঙ্গে মামলাতে হার হবে না জিত ? নির্বাচনে জিতবেন কি না, এই সব প্রার্থী এবং প্রশ্নকারীর ঢোকা বারণ আছে তাঁর এই আগলহীন ছোট্ট আশ্রমে। কেউ উদ্দেশ্য ভাঁড়িয়ে ঢুকে যদি-বা পড়েনও তবেও তাঁর মুখের তোড়ে কুটোর মতন ভেসে যান নিজেদের মান-সম্মান নিয়ে। যার যত পয়সা তার মান তো তত বেশি ! অন্তত তাঁদের নিজেদের কাছে !

মৌনী থাকাটা বোধহয় সকলের পক্ষেই ভাল। আত্মা তাতে শান্ত হয়। চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে। সমুদ্রে দিশেহারা নাবিকের মতন যখন অবস্থা হয়, চারণেরই মতন অনেকই গৃহীর, তা তার স্ত্রী-পুত্র থাক আর নাই-ই থাক, তখন "To correct his own bearings"—সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্যে মৌনতা অবশ্যই ওষুধের মতন কাজ করে। করে যে, তা চারণ দেবপ্রয়াগে আসার পরে এই তিনদিনেই বুঝতে পারছে।

চারণ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে ভোলানন্দ মহারাজের আশ্রমটি দেখা যায় না। আশ্রমের সামনে ঘন রডোডেনড্রনের ঝোপ আছে আর বড় বড় হর্স চেস্ট-নাট গাছের সারি। আরও নানা গাছের জটলা আছে। সিলভার-ওক। কিছু প্রাচীন ওক গাছও আছে। অনেক শীত-বসন্তর সাক্ষী। বার্চ। অর্কিড ঝোলে অনেক গাছে গাছে। কী কী অর্কিড আছে এখানে তার সন্ধান করতে বেরোবে একদিন। চারণ ঠিক করেছে।

আশ্রমটিকে ও এখন যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে দেখা যায় না, কারণ, মানুষের চোখের দৃষ্টি শুধু সোজাই যায়, ট্যানজেন্ট-এ যাবার ক্ষমতা নেই তার। অথচ আশ্রমের সামনের চাতালে বসে পুরো দেবপ্রয়াগকেই ছবির মতন দেখা যায় দিনে এবং রাতেও।

কথা না-বলার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখার কথা মনে পড়ে গেল চারণের। মাদ্রাজের আদিয়ার থেকে সাবিত্রী দেবীকে (কৃষ্ণান) সংগ্রহ করে নিয়ে আসার আগে শ্রীঅরবিন্দর কাছে গেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফিরে এসে, পুত্রবধূ মীরাদেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকব। কারও সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না। কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া পড়ব না।"

এখানে আত্মীয় বলতে সাধক রবীন্দ্রনাথ কাকে বা কাদের বোঝাচ্ছেন তা জানে না চারণ, কারণ রবীন্দ্রনাথ তো মধ্যজীবনে এসে এই সার কথাটি বুঝেছিলেন যে, রক্তসূত্রর আত্মীয়তাটা আসল আত্মীয়তা নয়।

তারপর লিখেছিলেন, "গভীরভাবে, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখব। পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করে আমার মনে হল আমারো কিছুদিন এইরকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমশই কমে আসবে। প্রতিদিন যাতা কাজ করে যাতা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় চাপা পড়ে যায়। নিজেকে দেখতে পাইনে।"

ভোলানন্দ গিরির আশ্রমটির সঙ্গেও এই নিজের ভিতর থেকে বাইরে এসে নিজেকে দেখার মধ্যে যে একধরনের নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি থাকে তার মিল আছে। আশ্রমটি দেবপ্রয়াগে অবস্থিত হয়েও দেবপ্রয়াগে নয়। এই জন্যেই ভাল লেগে গেছে চারণের এতখানি। আর ভোলানন্দবাবাকে তো লেগেছেই।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এরই কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে লিখেছিলেন,

www.MurchOna.com

"দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেছি।"

নিষ্কৃতি "পাওয়ার" কথাই জানত চারণ। তাই রবীন্দ্রনাথের মতন শব্দর নির্ভুলতা সম্বন্ধে শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ কেন নিষ্কৃতি "নেব" বললেন, তা জানা নেই ওর।

তারও পরে লিখেছিলেন, "ছোট ছোট দাবীর শিলাবৃষ্টিতে আমার দেহমনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া আর ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি।"

এই নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতার মধ্যে এসে পড়ে সত্যিই বড় ভাল লাগছে চারণের। ত্রিবেণী ঘাটে হয়তো সৎসঙ্গ আছে, কলকাতাকে সেখানে পৌঁছে ভোলা সহজ। কিন্তু দেবপ্রয়াগের মতন ঘোর লাগানো নির্জনতা সেখানে নেই।

এই নির্জনতার প্রসঙ্গে কত কথাই যে মনে ভিড় করে আসছে। এই নির্জনতার মধ্যে না এলে, নিজের মন নির্জন না হলে তো এসব ভাবনা ভাবতেও পারত না। এইসব কথা, বড় মানুষদের এইসব চিঠির কথা তো সে ডাইরিতে লিখেই রেখেছিল। বার বার পড়তে পড়তে তা মুখস্থও হয়ে গেছিল। কিন্তু এমন জায়গাতে না এলে সেইসব কথা তো মনেই আসত না।

ও ভাবছিল হৃষ্টপুষ্ট গাভীরই মতন এতদিন মনে মনে খেল অনেকই। গলকম্বলের নীচে আর খাদ্যনালীতে এবং পেটেও তো খাবার সব ভরাট হয়েই আছে। কিন্তু জাবর না কাটতে পারলে তো সে খাদ্য মনের পুষ্টিবর্ধন করবে না। আঁতেলদের মতন জ্ঞানের বুকনি ছুটোনো যাবে তাতেই কিন্তু নিজের মনের মধ্যে গভীর প্রশান্তি, যে পরম গন্তব্যর কারণেই মানুষের সমস্ত জ্ঞানার্জন, তা তো আসবে না।

অন্ধ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের খুবই ভক্ত চারণ। সত্যজিৎ রায়ের মাস্টারমশাই ছিলেন তিনি, নন্দলাল বসুরই মতন। এইসব বড় মানুষদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন তখন কোনও কোনও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আদৌ রাজি নয় ও।

সেদিন হৃষীকেশ-এ ভীমগিরি মহারাজের সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়েছিল যে ও সে কথা সত্যি। কিন্তু ভীমগিরি মহারাজ তাকে ভাবতে বলেছিলেন। অনেকই ভেবেছেও চারণ সেদিন থেকে। ভাবাভাবির শেষে ভীমগিরি মহারাজের মতামতকে যে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পেরেছে ও এমনও নয়। 'আবিষ্কার' আর 'উদ্ভাবন' এই দুটি শব্দ তার মনোজগতে এক বিস্ফোরণ অবশ্যই ঘটিয়েছে।

ভীমগিরি মহারাজই কি তাহলে ঠিক ? না, ওই ঠিক ?

এই প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এত সহজে মিলবে না।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে ঈশ্বর এবং নির্জনতা প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন, "যাঁরা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মেন্টাল-ওয়ার্ল্ড-এর গণ্ডির বাইরে প্রায়ই যেতে পারে না। এ বিষয়ে আমি ছবি আঁকতে গিয়ে বুঝেছি।"

এখানে "মেন্টাল-ওয়ার্ল্ড" বলতে বিনোদবিহারী কী বুঝিয়েছিলেন ঠিক বোঝেনি চারণ।

"Extreme mental shock (লাঞ্ছনা, অপমান, কাম ইত্যাদি)-এর প্রভাবে আমাদের মনের যেরকম বৈরাগ্যভাব জন্মে বা তীব্রভাবে আমরা কোনও কোনও বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট হই, তখন একরকমের মুক্তি অনুভব করি। সৃষ্টিক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই অবস্থা থেকেই আমরা একটা অন্ধকার জগতে গিয়ে পৌঁছই, মানসিক নরক।"

"অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। আসলে নির্জনতা ও জনতার মধ্যে বাস করার মধ্যে অভিজ্ঞতার পথে জমিন-আসমান তফাৎ রাখে। আপনি ঠিকই লিখেছিলেন, "নির্জনতা কখনও আমাদের শূন্যহাতে ফেরায় না।"

"লেখাপড়া, ছবি সবই নির্জনতার অবদান। বাইরে নির্জনতা থাকলেও মনের মধ্যে ভিড় জমে

www.MurchOna.com

ওঠে। বাইরেও নির্জন, মনের ভেতরেও নির্জন—একেই বোধহয় বলে শান্তি, বা Peace। একই সঙ্গে ধ্যানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এর পরই ঈশ্বর আছেন না নেই, সৌন্দর্য আছে না নেই এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সর্বশক্তিমান আমাদের ভালমন্দর হর্তাকর্তা ভগবানকে আমি ঠিক দেখিওনি, বুঝিওনি। আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি। ...মুক্তির পথ, উপলব্ধির পথ ভিন্ন। যুক্তির পথে ছবি আঁকতে পারিনি। ছবি আঁকার জন্যই উপলব্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়েছে।"

চারণ ভাবছিল, রবীন্দ্রনাথ হলেও কি এই কথাই বলতেন ? লেখার জন্যই উপলব্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়েছে ?

কী সব গভীর উপলব্ধির চিঠি। আরেকটি চিঠিতে বিনোদবিহারী লিখছেন,

"তলায় পাঁক, মাঝখানে জল, ওপরে পানা, এই হল মোটামুটি আমাদের জীবন। কোনওরকম করে পানা সরাতে পারলে একটু সূর্যের আলো পড়ে। সেই হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পাহাড়, সমুদ্র, তারায় ভরা অন্ধকার রাতের কথা মনে হলে পানা পুকুর থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। মুক্তি হয়তো হবে না, তবু বৃদ্ধবয়সের পরম সম্পদ এই অভিজ্ঞতা : যা আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে যে আরও কিছু আছে।"

"যৌবন হল অ্যাকশন আর বার্ধক্য হল কনটেমপ্লশান। এই সত্যটি জানতে অনেকদিন লাগল।"

গত রাতেই পাটনের গুরু ভোলানন্দ মহারাজ বলছিলেন, এই পুরো পৃথিবীটাই মানুষের মনের সৃষ্টি। জুলিয়ান হাক্সলিকে quote করে বলেছিলেন :

"There is only one substance which possesses not only material properties but also properties for which the word 'mental' is the nearest approach."

আবার PLATO-র কথা উল্লেখ করে ভোলানন্দ বলছিলেন "Mind is the sum total of other vibrations. So, if the mind *is* made still and subtle, the union of protons and electrons in an atom of an element in suitable proportion becomes possible. When it is done, one element is changed into another because a gross element is nothing but the aggregrate of its' subtlest particles."

বাণিজ্য আর আইনের ছাত্র চারণের কাছে ইলেকট্রন প্রোটন, অ্যাটম, ইথার এইসব শব্দগুলো মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছিল। পাটন তাকে পরে বুঝিয়েছিল।

বলেছিল যে, যে-কোনও বস্তুর 'অ্যাটম'ই অনেক 'প্রোটন' আর 'ইলেকট্রন' নিয়ে গঠিত। একটি অ্যাটম-এর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটনের ভাগ হচ্ছে ১-১০৪ আর ১-২৪৫। একটি ইলেকট্রন একটি প্রোটনের চারদিকে প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ হাজার মাইল থেকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে (যা, আলোর গতি) আবর্তিত হচ্ছে। প্রোটন আর ইলেকট্রনের উপাদানের তারতম্যই বিভিন্ন উপাদানের জন্ম দেয়।

পাটন চারণকে বোঝাবার জন্য বলেছিল, মনে করুন, রুপোর মধ্যের অ্যাটমে প্রোটন আর ইলেকট্রনের মধ্যে যদি সোনার অ্যাটমের মধ্যে প্রোটন আর ইলেকট্রনের যে সাযুজ্য তা আনা যায়, তবে রুপোকে সোনা করা কিছুমাত্রই অসুবিধের নয়।

এই ইংরেজি ইলেকট্রনকেই আমাদের সংস্কৃতে বলে "মরুৎ"। "মরুৎ", "ব্যোম", "ক্ষিতি", "অপ" ইত্যাদিই সৃষ্টির মূল উপাদান। রবীন্দ্রনাথের 'ঘোড়া' শীর্ষক একটি ছোট গল্প আছে। পড়েছিলেন কি ?

চারণ বলল, না।

এ কদিনে তার অশিক্ষিত ক্রিমিন্যাল ট্রিলিয়নিয়র মক্কেলের ছেলেকে কাছ থেকে দেখে চারণের ভিরমি খাবার অবস্থা হয়েছে।

মিস্টার ব্রহ্মার এইসব তো Raw meterial। এইসব দিয়েই তো "সৃষ্টি" তাঁর। অপ হচ্ছে জল,

www.MurchOna.com

আগুন হচ্ছে "তেজ", হাওয়া হচ্ছে "মরুৎ", আর গুরুজি যে বললেন ETHER সেই ইথারই হচ্ছে "ব্যোম"।

"ব্যোম শংকরের" ব্যোম বলছ ?

হেসে বলল চারণ।

পাটন উত্তরে বলল, ব্যোমশংকরের ব্যোমকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। শংকর ভগবানই একমাত্র ভগবান যিনি ব্রহ্মার ক্রিয়েশনকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারেন প্রলয়-নাচন নেচে।

চারণ বলল, তাহলে ইলেকট্রন কি ?

ইলেকট্রন হচ্ছে মরুৎ। বুঝলেন না এছাড়া আর একরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে বহুদিন হল। তাকে বলে Positron। Gamma Rays-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। একটি Positron এবং একটি Electron-এর মিলনই গাম্মা রশ্মির জন্ম দেয়। আবার গাম্মা রশ্মিকে বিভক্ত করে তার মধ্যে Positron আর Electron-কেও আলাদা করা যায়। তবে মনে হচ্ছে matter আর Energy মূলত আলাদা কিছু নয়। একের মধ্যে অন্য ওতপ্রোতভাবে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

চারণ বলেছিলে, এবার ক্ষ্যামা দাও। ঈশ্বর বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সঙ্গে নির্জনতার অনুভূতির সঙ্গে যে এতসব গোলমেলে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার জড়িয়ে অছে তা ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না। এর চেয়ে তো রবিঠাকুরের সেই গানই অনেক ভাল ছিল।

কোন গান ?

"ওদের কথায় ধাঁধাঁ লাগে তোমার কথা আমি বুঝি।

তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।"

সে কথা ঠিক। তাই তো আলটিমেট সিনথেসিস। কিন্তু সবাই তো রবিঠাকুর নন। তাছাড়া, অবিশ্বাসীদের ভিড়ও তো কিছু কম নয়। বিজ্ঞানই তো মানুষকে সব সত্যকেই যাচাই করে নিতে শিখিয়েছে। সেই গুণ অথবা দোষ আসলে বিজ্ঞানের নয়, মানুষেরই।

কেন, মানুষের কেন ?

বিজ্ঞান-মনস্ক হয়ে পড়ে মানুষ বিজ্ঞানের উৎস সম্বন্ধেই অনবহিত হয়ে উঠছে। জ্ঞান থেকেই যে বিজ্ঞানের জন্ম। আমাদের দেশের এই আধ-ন্যাংটো সাধু-সন্নিসীদের অনেকেই যে, যে-কমণ্ডুলু থেকে উট খাবার খেয়েছিল, সেই কমণ্ডুলুতেই বিজ্ঞান গুলে খেয়েছেন সে খবর উদ্ধত পশ্চিমীরা আর তাদের অন্ধ অনুকরণ-করা কিছু প্রকৃতার্থে অশিক্ষিত এনআরআই আর দিশি সাহেবরা আর কম্যুনিস্টরা জানতে চান না। না চান, তো না চান। জ্ঞানের সীমা তো চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতার, সীমা কোনওদিনও ছিল না। যাঁরা বিজ্ঞানের জয়গান করতে গিয়ে নিরীশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন তাঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কারণ "It is the dream of science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single element."

জ্ঞানীরা যা ইতিমধ্যেই জানেন, তাই অধুনা বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষেরা প্রমাণ-সাবুদের সঙ্গে জানবার জন্যে ইলাহি কাণ্ড কারখানা করে চলেছেন। গতরাতে ভোলানন্দ মহারাজ বিজ্ঞান এবং ঈশ্বরবোধ এর মধ্যে যে কোনও বিরোধ নেই এই কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন কিছু কথা।

সেইসব কথা স্বামী বিবেকানন্দরই কথা। সখ করে সাধু-সঙ্গ করতে এসে, মনের অশান্তি নির্বাপিত করতে এসে যে এমন সাংঘাতিক আবর্তে নিক্ষিপ্ত হবে তা চারণ একবারও ভাবেনি।

কত কী জানার আছে, বোঝার আছে, পড়াশুনো করার আছে। এই সব দীনহীন সাধুসন্নিসীদের বাইরে থেকে দেখে এঁদের জ্ঞানের সীমা, গভীরতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও করা যায় না। কিন্তু চারণের হাতে যে সময় খুব বেশি নেই। পাটন ছেলেমানুষ, ওর হয়তো আছে। এত দেরি করে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে, এই অলীক জ্ঞানভাণ্ডারের কতটুকুই বা ও করায়ত্ত করতে পারবে ?

নিজের জন্য ভারী কষ্ট হল চারণের। হৃষীকেশ-এ আসার পর থেকেই হচ্ছিল। সেই কষ্টটা বহুগুণ বেড়ে গেছে দেবপ্রয়াগে এসে।

www.MurchOna.com

ভোলানন্দ মহারাজকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে মিশে, (মানে যখন তিনি মৌনী থাকেন না) একবারও মনে হয় না যে, তিনি একজন অসাধারণ মানুষ, এতবড় পণ্ডিত, জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ধারক ও বাহক। পণ্ডিতম্মণ্য মানুষ মাত্ররই উচিত তাঁর কাছে এসে জেনে যাওয়া যে পণ্ডিতম্মণ্যতা আর মূর্খামি সমার্থক।

অন্ধকারের পর ওপারের পথ দিয়ে ট্রাক বাস বা গাড়ি যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। কখনও কখনও আর্মির ট্রাক বা জিপ যায়। বা, কনভয়। অন্ধকারে দুই নদীর সঙ্গমের শব্দের দিকে মুখ করে বসে সেই শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের মধ্যে স্থিতি আনবার চেষ্টা করছিল চারণ। সেখানে বসে ওর মনে পড়ছিল যে, ওর দাদুর শোবার ঘরের খাটের উপরে শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্বামী বিবেকানন্দর দুটি বাণী বাঁধানো ছিল। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা বাণী। ইংরেজিতে কেন ? তা ও বলতে পারবে না। দাদু বাংলা তো অবশ্যই, সংস্কৃতও অত্যন্ত ভাল জানতেন।

লেখা ছিল "He is born to no purpose, who having the privilage of being born a man, is unable to realise God in this life." শ্রীরামকৃষ্ণ।

আর স্বামী বিবেকানন্দর বাণীটি ছিল এইরকম "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within by controlling nature external and internal."

কে জানে ! ওর মধ্যে দাদুর জিন ছিল কি না ! চারণের বাবা ঘোর নাস্তিক ছিলেন। চারণের মনের মধ্যে সবসময়ে কি যেন নেই, কি যেন পাওয়া হল না, জানা হল না, সে যে কোন পরম ধন ? সে সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ও গভীর আকুতি যে কেন জন্মাল, তা কে জানে !

হঠাৎ তার ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে পাটন, পেছন থেকে তাকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠল, এই যে, স্যার। চলুন। আশ্রমে, চন্দ্রবদনী নাম্নী এক সাংঘাতিক সাইকেডিলিক মাল এসেছে। সাটুলি দ্য গ্রেট। যাচ্চলে ! আমার আর এ জন্মে সাধু হওয়া হল না। আমার যখন হলই না তখন আপনার কেসটাও যাতে কেঁচে যায় তা তো দেখতে হবে। গুরু-মোটা আপনাকে ডাকতে বললেন। গান-টান হবে নাকি। দিওয়ালির দিন বলে কতা।

গুরু-মোটা মানে ?

চারণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মানে, ভোলাগিরি। তিনি কি মোটা নন ?

তা মোটা। তবে গুরু কে কি এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত ?

চারণ ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে চারণের বক্তব্যকে ডিসমিস করে দিয়ে হঠাৎই গেয়ে উঠল,

"দেখা হ্যায় পহেলি বার,
সজনকে আঁখোমে পেয়ার,
ঝিংকু চিকুর ! ঝিংকু ঝিংকুর ! ঝিংকু চিকুর !"

ঐ পাথরে-খোদিত গুম্ফাদের সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে প্রায় পুরো দেবপ্রয়াগের এলাকা পেরিয়ে অনেকখানি উতরাই নেমে অলকানন্দার উপরের সরু সাসপেনশন ব্রিজ পেরিয়ে আবার অনেকখানি চড়াই উঠে যখন আশ্রমে পৌঁছল ওরা তখন দেখল প্রায়, জনাদশেক সাধু-অসাধু চেহারার মানুষ জমায়েত হয়েছেন আশ্রমে।

বেলা থাকতে থাকতেই বেরিয়েছিল চারণ আশ্রম থেকে। ভোলানন্দ তখন কন্দরের অভ্যন্তরে ছিলেন। সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে একজন মাত্র নারী। এবং পুরুষদের মধ্যে দুজন শ্বেতাঙ্গ।

সেই নারীর রূপ-বর্ণনা করবে তেমন ক্ষমতা চারণের নেই। তার মুখের রং ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার মতন। কিন্তু লজ্জা পেলেই তা রডোডেনড্রনের মতন লালচে হয়ে যাচ্ছে। ধুনির আগুন যখন তার দীপশিখার মতন মুখে নাচানাচি করছে তখন মনে হচ্ছে একমুঠো আলোর প্রজাপতিকে কে যেন ছেড়ে দিয়েছে তার মুখে। কিছুক্ষণ নাচানাচি করে তারপরই আবার সরে যাচ্ছে তারা। ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা আবার তার শুভ্রতা ফিরে পাচ্ছে।

www.MurchOna.com

রূপসী এ জীবনে অনেকই দেখেছে চারণ। কলকাতার যে-সমাজে তার ঘোরাফেরা ছিল তা পুরনো রাজা-মহারাজা থেকে শিল্পপতি রাজা-মহারাজা সকলেরই খাস দরবার ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রূপে রূপসী হলেই কারওকে রূপসী বলে মানতে রাজি হয়নি সে কোনওদিনই। যতক্ষণ কথা না বলছে এবং শুনছে, ততক্ষণ রূপসী শুধু রূপেই রূপসী। কিন্তু গুণের গরিমা ছাড়া পৃথিবীর সব রূপই যে ব্যর্থ। মুখ খুললেই যে কত সুন্দরী কদর্য হয়ে ওঠে, কত রূপবান পুরুষ মর্কট-শ্রেষ্ঠ, তা যাঁরা না জানেন, তাঁদের বোঝানো যাবে না।

চন্দ্রবদনী!

এই নারীই নিশ্চয়ই চন্দ্রবদনী হবে।

একটি সাদা-রেশমের ফুলহাতা ব্লাউজের সঙ্গে পোড়ামাটি-লাল জমি আর কচি-কলাপাতা রঙা পাড় ও আঁচলের একটি গাদোয়াল শাড়ি পড়েছে। চোখে ও চোখের পাতাতে কাজল। কপালে কালো টিপ। গলাতে পীত পোখরাজের মালা। একটি বড় পোখরাজকে লকেট করা হয়েছে। কানে, পীত পোখরাজের ইয়ার-টপ। হাতেও পীত পোখরাজের বালা। সোনা দিয়ে বাঁধানো। পায়ে সোনার পায়জোর। ঘন কালো কুঞ্চিত চুল। র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো পাখির ডানার মতন, উজ্জ্বল কালো চেকনাই সেই চুলে। কী তেল এবং কী সুগন্ধ সে মেখেছে তা জানা নেই চারণের কিন্তু গুহামুখ থেকেই তার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ কোনও বিদেশি পারফ্যুম নয়। এই দেবভূমিরই কোন ফুল বা আরক মেখেছে, কে জানে। মুখ খুললেই সুন্দর যুঁইফুলের মতন সাদা দুপাটি দাঁত ঝিকমিক করে উঠছে।

চারণ চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল গুহামুখে।

ভিতর থেকে ভোলাগিরি মহারাজ বললেন, এসো এসো চারণবাবু আমরা সকলে তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি।

কানের পাশে ফিসফিস করে পাটন বলল, শাল্লা। মেনকা আর রম্ভাকে এক হামানদিস্তেতে কমলালেবুর মধু আর যত গুষ্টির যষ্টিমধু একসঙ্গে মেরেছে র‍্যা! আমার এখন কি হবে গা?

বলেই, নির্জৌষধি গান গেয়ে উঠল, প্রায় চারণের কানে কানে,

"দেখা হ্যায় পহেলি বার
সজন কি আঁখোমে পেয়ার
ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর। ঝিংকু চিকুর।"

ভোলানন্দজি বললেন, তুই আবার কি গাইতাছস পাটন?

পাটন, দাগী মিথ্যুক আসামীর মতন দুকানে দুহাতের দুশ আঙুল ঠেকিয়ে বলল, কই? কিছু না তো।

ভোলানন্দ বললেন, চন্দ্রবদনী, এরই নাম পাটন। যার সঙ্গে তোকে আলাপ করানো হয়নি অথচ যার কথা তোকে বলেছিলাম। এক নম্বরের বিচ্ছু। কিন্তু ও যেদিন পুরো সাধক হবে সেদিন অনেকই বড় বড় সাধু-সন্তকে লুঙি-ল্যাঙোট আর বাঘছাল গুটিয়ে তুলে উদ্বাস্তু হতে হবে। এখানে ওকে পুঁতে দিলে নর্থ চায়নার হিমালয়ে, যেখানে আমাদের স্বর্গ, সেখানে কোনও বদবু গাছ হয়ে ও জন্মাবে।

সকলেই ভোলানন্দজির কথাতে হেসে উঠলেন।

শুধু অবাক হল চারণ।

এই ভোলানন্দজিকে দেখে কে বলবে যে, ইনিই যখন মৌনী অবস্থাতে ঋজু হয়ে ধ্যানে বসে থাকেন এবং মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হন তখন এঁর মনের ভাব কেমন হয়।

প্রসন্নতার প্রতিমূর্তির মতন ভোলানন্দজি বললেন, নেশা-ভাঙ করে, মহা ট্যাঁটোন, কিন্তু হলে কি হয়, পাটনের আত্মা মুক্ত হবার জন্য পাখা মেলে রয়েছে। ও আমার দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে। সেই যে আছে না? রবিবাবুর গানটা। আঃ তোমরা বল না কেউ?

কেউই যখন কিছু বললেন না তখন বিরক্ত হলেও হাসিমুখে বললেন সেই যে গো!

www.MurchOna.com

"আমি তারে শুধাই যবে কী তোমারে দিব আনি
সে শুধু কয়, আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।
দিই যদি তো কী দাম দেবে
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে।
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে।"

তারপরই সকলকে চমকে দিয়ে বললেন, গা তো পাটন, যে গানটা গাইছিলি এখুনি।

কোন গানটা ?

চমকে উঠে এবং ভয় পেয়ে পাটন বলল।

আরে ওই যে রে ! দেখা হ্যায় পহেলি বার সজনকে আঁখোমে পেয়ার।'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

চন্দ্রবদনীও।

কিন্তু সেই হাসি দেখে চারণের বুক হু হু করে কেঁপে উঠল। নানারকম মিশ্র ভয়ে।

এই চন্দ্রবদনীই সেই চন্দ্রবদনী ! ভীমগিরি আর মাদ্রীর কাছে যার কথা শুনেছিল ?

পাটন মুখ গোঁজ করে বসেছিল। ভোলানন্দ ধমক দিয়ে বললেন, হইল কি রে। ফাইজলামি রাইখ্যা এহনে গানখান শোনা দেহি।

এইরকম সময়ে বোঝা যায় যে, ভোলানন্দ পুব বাংলার মানুষ। বাংলায় যখন কাছের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তখন এই ভাষাতেই কথা বলেন। এই মানুষই যখন আবার বদ্রীবিশাল বা কেদারনাথের বরফের গুহা থেকে নেমে-আসা কোনও সাধু-সন্নিসীর সঙ্গে চোস্ত হিন্দিতে অথবা প্রয়াগ (ইলাহাবাদ) বা কাশী থেকে উঠে আসা কোনও পণ্ডিতের সঙ্গে শুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলেন তখন বোঝারই উপায় থাকে না যে ইনিই তিনি !

সাদা চামড়ার কোনও মানুষের সঙ্গেও এই তিনদিনে কথা বলতে শোনেনি চারণ ভোলানন্দ মহারাজকে। কিন্তু ওঁর মুখে ইংরেজি উচ্চারণ শুনে এবং শব্দচয়নে দেখে সহজেই বুঝতে পেরেছে যে, ইংরেজিও অত্যন্ত ভালই জানেন তিনি। হয়তো অন্য বিদেশী ভাষাও জানতে পারেন। আশ্চর্য নয় কিছু। প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিল চারণ যে, উনি একজন ক্ষণজন্মা মানুষ। ক্ষণজন্মা না হলে পাটনও এমন উৎপাটিত হয়। পাটন মুখে ওকে কিছুই বলেনি বা বলবেও না। কিন্তু চারণের সন্দেহ হয় যে পাটন সম্ভবত ভোলানন্দর দেখা পায় ইউনাইটেড স্টেটস এই। নইলে, সেখানের পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ এমন করে দেশে ফিরে এসে কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তিকে দুর-ছাই করে, পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যে সে সন্নিসী হয়ে যাবে এবং হঠাৎই ভোলানন্দ মহারাজের দর্শন পাবে দেবপ্রয়াগে এসে, এমন বিশ্বাস করাও শক্ত। এবার ভোলানন্দ বাবা বললেন, সময় নষ্ট হইতাছে পাটন। তুই জানস যে আজ এখানে এতজন সাধুসন্ত জমায়েৎ হইছেন নানা বিষয়ে আলোচনার জইন্য। নষ্ট করার মতন সময় নাই আইজ। গা গানটা।

পাটন গুহার ছাদের দিকে মুখ করে হঠাৎই ধরে দিল,

"দেখা হ্যায় পহেলি বার
সজনকি আঁখোমে পেয়ার।"

গানটা শেষ হলে ভোলাগিরি বললেন, আর ঝিংকু চিকুর। ঝিংকু চিকুর। ঝিংকু চিকুরটা। গাইব কেডা ?

পাটন গান থামিয়ে বলল, ওটা তো গানের বডি নয়। ওটা তো মিউজিক।

ভোলানন্দজি বললেন, তা হউক গা। আমাগো হক্কলের বডি যখন ওই মিউজিকই শুনতা চাইতাছে তুই শোনা আমাগো।

পাটন অগত্যা ঝিংকু চিকুর। ঝিংকু চিকুর। ঝিংকু চিকুর। গাইল।

চারণ ভাবছিল, পাটন চারণের কানের মধ্যে একেবারে Earful of Whisper এরই মতন করে গানটা গেয়েছিল। ভোলাগিরির শোনার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ওরা তার থেকে অনেকখানি

www.MurchOna.com

দূরেও ছিল। এই ব্যাপারটাতেই বড় আন-নার্ভড বোধ করে চারণ। দূরে বসে কে কি ভাবছে, কমোডে বসে, (এখানে যদি কমোড থাকত) কে কোন গান গুণগুনাচ্ছে সবই যদি Sensor-র এ ধরা পড়ে, কমপ্যুটার-এ স্টোরড হয়ে যায়, তাহলে বেচারা পাটন কমপ্যুটার-সর্বস্ব স্টেটস ছেড়ে মরতে এখানে এল কেন ?

রিয়্যালি !

বেচারি।

একজন রোগা টিংটিং-এ কিন্তু লম্বা সাধু বসেছিলেন ভোলানন্দজির ঠিক বাঁপাশে। খালি গা। তাঁর মাথা, বুক আর পেটময় কাঁচাপাকা চুল। বললেন, অব বেটিকি গানা শুনা যায়।

জি হাঁ।

ভোলানন্দজি বললেন।

তারপর চন্দ্রবদনীর দিকে ফিরে বললেন, অব গাও বেটি।

কওনসি গানা গাঁউ ?

চন্দ্রবদনী গুরুজির দিকে চেয়ে বললেন।

তোমার গলায় যে গান শুনতে আমি ভালবাসি, ধিয়ানগিরি ভালবাসে, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাও বেটি।

তারপরই অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, হিঁয়াতো বহুতই কিসিমকি গানা হামে শুননে মিলতাই হ্যায়। ক্যা ভাইলোগ ? রভীন্দরনাথভিতো ইক বহুত বড়া সন্তহি থে। উনকি গানা আজ দিওয়ালিকি রাতমে জারা শুন লেনে সে হরজ ক্যা ?

তারপরই বললেন, আজ মামুলি দিওয়ালিভি নেহি না হ্যায়। আজ সিনিবালি দিওয়ালি। দেওয়ালির রাতে 'দীপাবলী' রাগ শোনাবি মা আমাদের ?

'দীপাবলী' ?

এই রাগের কথা তো শুনিনি।

আমরা সকলে কতটুকুই বা জানি ! আমাদের জানার বাহিরে তো কত কিছুই আছে। 'দীপাবলী' আমিও অবশ্য কারও কণ্ঠে শুনিনি, শুনেছি বাঁশিতে। আলি আকবর খাঁ সাহেবের রেকর্ডও আছে এই রাগে।

কেমন রাগটি যদি বলেন একটু।

চন্দ্রবদনী আবদারের গলাতে বলল।

রাতের বেলাতে গাওয়ার রাগ, বুঝতেই পারছিস। দিনে নাম দীপাবলী হত না। কল্যাণ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত রাগ। মা মধ্যম বাদী, মা সমবাদী। হাতি ঔরসার। ক্ষা, শুদ্ধ মা কোমল মা দুইই লাগে কিন্তু এই রাগ পা বর্জিত।

মানে, পদবিহীন ?

পাটন মাঝে একটু ফক্কুরি করল। রাত দশটার পরে গাওয়া হয়।

আরোহণ অবরোহণটা কেমন ?

চন্দ্রবদনী বলল।

আরোহণ

সা রা গা মা ক্ষা মা ধা নি সা।

অবরোহণ

সা না ধা মা মা গা মা গা রে সা। বলেই বললেন, গলায় তোলার চেষ্টা করিস তো মা। আর যদি তুলতে পারিস তো শুনিয়ে যাস আমাকে একদিন !

হর্জ কওন চি ক্যা ?

জরুর। জরুর।

কাহে নেহি ?

www.MurchOna.com

ইত্যাদি ধ্বনি উঠল।

ধিয়ানগিরিকে ভোলানন্দজি যে চেনেন তা বোঝা গেল। তাহলে চন্দ্রবদনীও চেনে। তাহলে এই চন্দ্রবদনীই সেই চন্দ্রবদনী ? দিওয়ালির দিনে দেখা হবে বলে আশা করেছিল চারণ খুবই। দেখা হয়েও গেল। তবে হৃষীকেশ-এ নয়, দেবপ্রয়াগে। একেই বলে, সাধু সন্তদের ভাষায় "সনযোগ"।

কোনওরকম ন্যাকামি বা ভান-ভড়ং না করেই চন্দ্রবদনী একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়েই হংসধ্বনির মতন গানটা ধরে দিল।

কী গলা ! আর কী গান !

কে বলবে যে এ, মেয়ে পর্বতদুহিতা, হিমালয়চারিণী। শান্তিনিকেতন, দক্ষিণী, গীতবিতান, রবিতীর্থ, সৌরভ সব কিছুকে বেটে বড়ি বানালে যা হত না, এই কন্যে সেই অঘটন-ঘটন পটিয়সী বটিকা।

সহজ সোজা গান। কিন্তু এই আশ্চর্য সুন্দর গম্ভীর পরিবেশে সেই গানের বাণী যেন অমরাবতীর বার্তা বহন করে আনল। গানটির বাণী শুনলে প্রেমের গান বলেও অনভিজ্ঞর মনে হতেও পারে কিন্তু এ গান যে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করেই বাঁধা তা চন্দ্রবদনীর গলাতে শুনলে, কারওই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে কোনও অসুবিধে থাকবে না।

"তুমি হঠাৎ হওয়ায় ভেসে আসা ধন—
তাই হঠাৎ পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।
গোপন পথে আপন-মনে বাহির হও যে কোন লগনে
হঠাৎ গন্ধে মাতাও সমীরণ
নিত্য যেথায় আনাগোনা হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।
কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে
পথহারাকে করে সচেতন।"

গান শেষ হলে সকলেই বাক্যহারা। গুহাভ্যন্তরে এবং বাইরের চাতালেও পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। চাতালের মুখে ধুনি জ্বলছিল। শুধু তারই ফুট-ফাট অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। গানের চেয়েও গানের রেশ যে অনেকই বেশি আনন্দ-বেদনাবাহী হয়, তা যাঁরা গান প্রায়ই শোনেন, তাঁরাই জানেন।

অনেকক্ষণ পরে ভোলানন্দজি বললেন, তোর আত্মদর্শন হোক মা। যাই চাস, তুই তাই যেন পাস জীবনে। এই আশীর্বাদ করি।

যা, না যাকে ?

দুঃসাহসী পাটন অতজনের সামনেই বলল, ফুট কেটে।

ভোলানন্দ, মনে হল সামান্য বিরক্ত হলেন। কিন্তু মুখে সেই বিরক্তি প্রকাশ না করে বললেন, "যা" বা "যাই"-এর মধ্যে "যে"ও পড়ে।

বলেই, চারণকে বললেন, তোমার সঙ্গে তো চন্দ্রবদনীর আলাপ নেই। এর নাম চন্দ্রবদনী। আর এ চারণ চ্যাটার্জি।

চারণ সাহস করে বলে ফেলল, আপনার তো আজ হৃষীকেশে থাকার কথা ছিল। ভীমগিরি মহারাজ আর মাদ্রীদের কাছে যাবার কথা ছিল, তাই না ?

চন্দ্রবদনী অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল।

বলল, চেনেন নাকি আপনি হৃষীকেশের ওঁদের ?

তারপরই বলল, হ্যাঁ। কথা তাই ছিল বৈকি। তবে, এখানে এসেই আটকে গেলাম। নামতে পারলাম না। বদ্রীবিশাল যা করবেন তাইই তো হবে।

আপনি নামতে পারলেন না বলেই হয়তো, আমি উঠে এলাম। দিওয়ালির দিনে দেখা হওয়ার কথা ছিল, তাই হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

তারপর চারণ চন্দ্রবদনীকে জিজ্ঞেস করল, হৃষীকেশ থেকে ঠিক কতদূর দেবপ্রয়াগ ?

চন্দ্রবদনী উত্তর দেওয়ার আগেই ভোলানন্দজি চারণকে বললেন, আরে ! বেটি কি করে জানবে ? ও কি অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের রুট-চার্ট বানায় ?

তারপরেই ওঁর পাশে বসা সেই দীর্ঘাঙ্গ, রোগা, সল্ট-অ্যান্ড-পেপার চুল-দাড়ির সাধুকে শুধোলেন কিঁউ শ্যামানন্দজি ? দেবপ্রয়াগ সে হৃষীকেশ কিতনি দূর পড়েগি ?

শ্যামানন্দজি একটু হাসলেন। ঋষিসুলভ হাসি। তারপর বললেন, হৃষীকেশ সে দেবপ্রয়াগ যিতনি দূর পড়তি হ্যায়, দেবপ্রয়াগ সে হৃষীকেশ ইতনাহি দূর পড়না চাহিয়ে ভোলানন্দজি।

সমবেত সাধুদের মধ্যে থেকে কে যেন বললেন, ওয়াহ ! ওয়াহ ! বহুতই আচ্ছা বোলা আপনে।

তারপরই বললেন, বাবা বদ্রীবিশালকি প্যায়ের সে তুমারা শর যিতনা দুর, তুমহারা শর সে বাবা বন্দরীবিশালকি প্যায়েরভি উতনাহি দূর ! ক্যা শ্যামানন্দ ? ঠিক কি নেহি ?

যো বোলা তুম।

বলেই, সল্ট-অ্যান্ড-পেপার শ্যামানন্দজি তাঁর দিকে ছোঁড়া খোঁটাটাকে না ছুঁয়েই অদৃশ্য হাতে উপড়ে নিয়ে প্রশ্নকারীর দিকেই ছুঁড়ে দিলেন।

চন্দ্রবদনী উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে ভোলানন্দজির দুপা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সে যখন প্রণাম করার জন্যে অবনতা হল, তার শারীরিক সৌন্দর্য যেন পূর্ণ মহিমাতে পূর্ণচন্দ্রর মতন বিকশিত হল। খোঁপাতে পোড়ামাটি-রঙা একগুচ্ছ নাম-না-জানা পাহাড়ি ফুল গুঁজেছিল। শ্বেতপদ্মর মতন মুখমণ্ডলে সেই ফুলের আভা লাগল।

আভভি আভভি চল পড়েগি বেটি ? ইতনা জলদি ?

সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন তাকে ভোলানন্দজি।

জি হাঁ চাচাজি। রাওয়ালজিকি ঘরমে যানা আভভি। খনা ভি হুঁয়াই খানা।

বলেই, অন্য সকলকে কোমর ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল। বলল, নমস্তে আপ সব লোঁগোকি। মুঝপর দোয়া রাখিয়েগা।

ভোলানন্দ মহারাজ বললেন, আমরা মাধুকরী বৃত্তি করে খাই, তোকে আমরা কি দেব মা ? শুধু মনের শান্তি ছাড়া আমাদের তোকে দেবার মতন কিছুই তো নেই।

তার চেয়ে, বড় দান আর কি আছে চাচাজি ?

চন্দ্রবদনী চলে যাচ্ছে শুনে চারণের মনটা যতখানি খারাপ হবে ভেবেছিল ততখানি খারাপ হল না দেখে নিজেই অবাক হল। চলে যাচ্ছে মানে কি, দেবপ্রয়াগ ছেড়েই চলে যাচ্ছে ? এখানে কতদিন থাকবে ও তাই বা কে জানে। সে যদি নেমে হৃষীকেশে যায়, তবে চারণও নেমে যাবে কি ? ওঠার চেয়ে নামাটা তো চিরকালই সোজা।

ভোলানন্দজি পাটনকে ডেকে বললেন, এই বাঁদর। চন্দ্রবদনীকে সাবধানে রাওয়ালজিদের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আয়। অন্ধকার রাত। সঙ্গে আলো লইয়া যা।

হুঁঃ।

পাটন বলল,

হুঁ ক্যান ? কী ব্যাপার ? তুই তো দেখতাছি দিনে দিনে আমার ইয়ার হইয়া উঠতাছস। হারামজাদা !

চন্দ্রবদনী, তার সামনেই পাটনের এরকম হেনস্থা দেখে অপ্রতিভ হয়ে উঠল।

কিন্তু পাটন বলল, সঙ্গে চন্দ্রবদনী থাকলে তো অমাবস্যার রাতের পথ এমনিতেই আলো হয়ে যাবে। আপনারই গুরুজি বুদ্ধি-শুদ্ধি দিনে দিনে লোপ পাচ্ছে। কত বলি যে শীর্ষাসন বেশি করবেন না। তা, কথা শোনেন কই ?

সমবেত সাধু-সন্ত মণ্ডলী পাটনের সাহস দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু হেসেও উঠলেন। সবচেয়ে অবাক হল এবং মজা পেল চন্দ্রবদনী নিজে। সে ফিক করে হেসে দিল।

পাটন বলল চারণকে, স্যার আপনি ?

www.MurchOna.com

ভোলানন্দজিই বললেন, পাটনের কথার পিঠে, না ! চারণবাবু এখানেই থাকবেন। নষ্ট করার মতন সময় ওঁর নেই। তোর তো আর কিছুই হবে না। এই সব ডিউটিই কর। ইচ্ছে করলে, রাজনীতিও করতে পারিস। আজ আমরা সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে আলোচনা করব। যা তুই। পালা এখন। তারপর চন্দ্রবদনীর দিকে ফিরে বললেন, আয় মা। আবার আসিস।

এসে কি লাভ ? আপনি তো মৌনীই থাকবেন।

আরে আসিসই না। আমি যখন মৌনী থাকি তখনই তো অন্য অনেকে মুখর হয়। আমরা কাছে নাই বা এলি, এখানে এসে তোর ভক্তর অভাব তো কখনই হবে না। তুই নিজেকে জানিস না। নিজেকে জানা উচিত।

আত্মানং বিদ্ধি।

পাটন বলল।

বাঁদরামি না কহর‍্যা অরে লইয়া যা হনুমান।

তাও একটু প্রোমোশন হল।

পাটন বলল, বিনয়ের সঙ্গে, মুখটি অধোবদন করে।

কিসের প্রমোশান ?

এই ! বাঁদর থেকে হনুমান।

আস্ত মর্কট একখান।

ভোলানন্দজি বললেন।

পাটন বলল, আচ্ছা। বাঙালদের ভাষা কিন্তু রত্নগর্ভা। এক বাঁদরকে নিয়েই কতরকম শব্দ আছে আপনাদের তূণে।

যা, যা, পালা।

ভোলানন্দজি বললেন।

পাটন চলে গেলে আবারও মৃদু হাসির রোল উঠল। কম সন্নিসীই বাংলা বোঝেন। যাঁরা বা একটু বোঝেন, তাঁরাও পূর্ববঙ্গীয় ভাষা একেবারেই বোঝেন না। হাসিটা ওরা হাসলেন আন্দাজেই। বিদেশি দুজন তো বোঝেনই না। হিন্দিও ভাঙা ভাঙা বলেন। তিন-চতুর্থাংশ বোঝেন।

চারণ বুঝল যে, চন্দ্রবদনী এই সন্নিসীদের কারও কাছেই নবাগন্তুক নয়। বিদেশিদের কথা বলতে পারবে না। অন্যরা সকলেই ওঁর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

আপনি যদি পাটনের সঙ্গে যেতে চান তো যেতে পারেন চারণবাবু। ওরা সামান্য পথই গেছে।

না, না।

বলল চারণ।

এই "না" কিন্তু মন থেকেই বলল ও। যদিও নিজের কানেই যেন প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি জোর শোনাল।

এখানে এসে অবধি এবং বিশেষ করে বিভিন্ন মহারাজের সংস্পর্শে আসা অবধি ওর মনোজগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে শুরু যে করেছে তা ও বুঝতে পারছে। এ এক বিশাল আদি-অন্তহীন জ্ঞানের জগৎ। সে জগৎ যে আদৌ ছিল, সে সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। সত্যিই জানে না চারণ তার জীবন তাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে। সন্নিসী মাত্রই যে ধান্দাবাজ নন, স্বার্থান্বেষী নন, এই সব স্বল্পাহারী, অনাহারী গিরিকন্দর-মরুভূমি এবং নদীপ্রান্তে বসবাসকারী মানুষগুলির মধ্যে অনেকেই যে এক একটি চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের সংজ্ঞা, সে বিষয়ে ওর কোনও সন্দেহই নেই। এখন জানছে যে, গৃহীদের সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে অনেকেই ভ্রান্ত ধারণা থাকে। গৃহীদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের বিদ্রূপের চোখে দেখেন যে একথা তাঁরা জানেন বলেই হয়তো যাচাই করতেও দেন না, নিজেদের ঔদাসীন্যর মুখোসও খোলেন না।

পাটন কাল সকালেই বলছিল, বাবারও বাবা আছে স্যার। এহ বাহ্য আগে কহ আর। এ গুরু, আমার যোগ্য হয়তো। কিন্তু এই দেবপ্রয়াগ এক সাংঘাতিক জায়গা। এই বাঙাল 'ভোলা'কেও

www.MurchOna.com

সহজে ঘোল খাওয়াতে পারেন এমন বহুত সাধুসন্ত এই জায়গার আনাচে-কানাচেতে ছড়িয়ে আছেন। সব সন্তই তো আর রক্তচন্দন-রঙা সিল্ক বা টেরিকটের পোশাক পরে বিদেশী পারফ্যুম মেখে মহিলা ও অর্থ বেষ্টিত হয়ে মোক্ষর পথপ্রদর্শক হন না। যার প্রার্থনা যত বড়, তার সাধনাও তত কঠোর। আপনার হয়তো এঁর চেয়েও অনেক বেশি উচ্চমার্গের কোনও গুরু মিলবে। কেরিয়ারিস্টরা যেমন নানাজনকে নানাভাবে ব্যবহার করার পরে মইয়ের মতনই জোড়া পায়ে লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দেন, তেমনই গুরুদেরও 'স্টেপিং-স্টোন' হিসেবে ব্যবহার করে আপনি ত্যাগ করে যেতে পারেন। তবে ওঁরা তাতে একটুও রাগ করবেন না। একের কাছে পাওয়া শেষ হয়েছে তো অন্যের কাছে যান, এঁর কাছে পাওয়া শেষ তো এঁকে ত্যাগ করে ওঁর কাছে চলে যান। আপনাকে ঠেকাচ্ছেটা কে ? সত্যজিৎ রায়ের ছবির রাজকন্যারই মতন গুরুও তো আর কম পড়ে নাই।

মা ভৈঃ।

চারণ বলেছিল, আমাকে স্যার স্যার কোরো না তো। দাদা বলবে।

মাত্বা খারাপ ! আমার জন্মদাতা পিতা যাঁকে "স্যার" বলে অ্যাড্রেস করতেন, রামভক্ত হনুমানের মতন হাত জোড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন যাঁর সামনে, তাঁকে আমি 'দাদা' বলে মহাপাতকের কাজ করতে পারি ! আপনি আবার বাবার 'স্যার', আমারও স্যার। ওয়ানস আ স্যার অলওয়েজ আ স্যার।

শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যে 'স্যার' না 'ষাঁড়' ঠিক বুঝতে পারল না চারণ।

ছেলেটা সত্যিই বাঁদর। শুধু বাঁদরই নয়, বাঁদর 'টু দ্য পাওয়ার এন'।

ভোলানন্দজি কি যে দেখেছেন এর মধ্যে তা তিনিই জানেন।

শ্যামানন্দজি বললেন, হ্যাঁ ! কোথায় যেন ছিলাম আমরা ?

অ্যানি বেসান্ট-এর কথা বলছিলাম আমি সেদিন।

একজন শ্বেতাঙ্গ অবাক হয়ে বললেন, অ্যানি বেসান্ট ?

হ্যাঁ। উনি লিখেছিলেন...

"No particles of matter is in contact with any other particles but each swings in a field of ether."

চারণ বুঝল, সেদিন ভোলানন্দজি যে আলোচনা করেছিলেন তারই সূত্র ধরে ঐ কথা বললেন শ্যামানন্দজি।

শ্যামানন্দজি বললেন, শুধু উনি একা কেন ? বেদান্ত সম্বন্ধে যাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল সেই জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের কথাতে বলতে গেলেও বলতে হয় যে...

"The cosmic presents itself to us objectivly under the form of great natural forces.Gravitation, heat, light, electricity, chemical affinity etc. then as the organising power in vegetables and animals; finally as human self-consciousness and sociabillty."

ছান্দোগ্যোপনিষদও বলছে যে এই ইথারই জন্মদাতা এবং প্রকাশক, সব কিছুরই। এক উপাদানই অন্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে যায় নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ায়। কোনও উপাদানই নষ্ট হয় না, আত্মারই মতন। এই ইথারই জীবিত বা মৃত যা-কিছুকেই আমরা জানি বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিতে, বা জানতাম, তার সব কিছুরই জন্মদাতা।

গীতাতে বলছে :

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক।
ন চেনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

অর্থাৎ, শস্ত্রসমূহ ইহাকে (আত্মাকে) ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল আর্দ্র

www.MurchOna.com

করতে পারে না এবং বায়ুও ইহাকে দগ্ধ করতে পারে না।

একজন বিদেশী জিজ্ঞেস করলেন, আত্মা কি ? সত্যিই কি আত্মার বিনাশ নেই ? হিন্দু ধর্মে যে বলা হয় পরজন্ম আছে, পরলোক আছে। তার প্রমাণ কি ?

শ্যামানন্দজি বললেন, সব কিছুর অস্তিত্বরই প্রমাণ দাবি করার গভীর বদভ্যাস আছে তোমাদের, মানে পশ্চিমীদের। তোমরা বাইবেল আর কোরান বা হাদিসকে অকাট্য প্রমাণ বলে অবলীলায় মেনে নেবে আর হিন্দুধর্মের যে সব মূল শাস্ত্র আছে, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, উপনিষদ, শুধুমাত্র এদেরই "প্রামাণ্য নয়" বলে সহজে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেবে, তা কি করে হয় ? তাছাড়া তুমি আমাদের পুরাণে, শাস্ত্রে, বেদ-বেদান্তে বিশ্বাসই না-করো এবং সেই অবিশ্বাস আমাদেরই সামনে, যারা এই সব শাস্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, এমন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন যাপন করছি, প্রকাশ করছ ? তা করতে অবশ্যই পারো। সব মতই এখানে গ্রাহ্য। কিন্তু বলতে পারো, পৃথিবীর আর কোনও ধর্মাবলম্বীদের সাধু-সন্ত বা পীর বা ফাদার এইরকম কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত নেন ? তোমার কি ধারণা ভারতের হাজার হাজার বছরের এই সাধনা সবই শূন্য কুম্ভে গেছে ? এবং যাবে ?

তাই যদি মনে করব, তাহলে এতদূরে কিসের খোঁজে এলাম। আমিও তো এখানে ফাইভ-স্টার হোটেলে নেই। কায়মনোবাক্যে আপনাদেরই তো অনুগমন করার চেষ্টা করছি অনুক্ষণ।

শ্বেতাঙ্গ যুবকটি বলল।

সেই শ্বেতাঙ্গ যুবকটির নাম স্টিভেন্স, তার বয়স হবে, বেশি হলে তিরিশ।

ভোলানন্দজি তারপর বললেন, তুমি জার্মান কম্পোজার বিঠোভেন-এর কোনও কম্পোজিশান কি শুনেছ ?

স্টিভেন্স হেসে বললেন, বিঠোভেন শোনেননি এমন শিক্ষিত পশ্চিমী হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্মে কেউ কেউ থাকবে কিন্তু আমাদের প্রজন্ম অবধি কেউই নেই অন্তত।

চারণ বলল, শুধু পশ্চিমেই বা কেন, পুবেও হয়তো কেউ নেই।

চারণ ভাবছিল যে, যেমন আমাদের বাঙলার রবীন্দ্রসংগীত। এমন প্রজন্মও পরে হয়তো আসছে বাঙালিদের মধ্যেও 'রবীন্দ্রনাথের গান' যে কি তাই জানবে না। 'জীবনমুখী গান', 'মরণমুখী গান', নীল ব্যানার্জি, লাল সেন, হলুদ ভৌমিকদের গানকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে জেনে তারা আহ্লাদবোধ করবে।

তা বিঠোভেনের কথা কেন ওঠালেন মহারাজ ?

গর্ডন প্রশ্ন করলেন।

বিঠোভেন-এর last quartet-এর movement তিনটি motifs-এর উপরে ভর করা।

কি ? কি motifs? সেগুলি নিশ্চয়ই জার্মান ভাষাতেই।

obviously।

যেমন ?

স্টিভেন্স শুধোল।

Muss es Sein?

Es Muss Sein!

Es muss Sein!

মানে ?

চারণ প্রশ্ন করল এবারে।

চারণের প্রশ্নে স্টিভেন্স-এর মুখে স্মিতহাসি ফুটে উঠল।

স্টিভেন্স বলল, Must it be?

It must be!

It must be!

ভোলানন্দজি বললেন, তুমি জানো কি না জানি না স্টিভেন্স—এই বাক্যবন্ধের অর্থ সম্বন্ধে যাতে

www.MurchOna.com

শ্রোতাদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না থাকে সেই জন্যেই Beethoven introduced the movement with a phrase "DER SCHEWER GEFFASSTE ENTS CHLUSS."

স্টিভেন্স-এর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

এই ফ্রেজ-এর মানে ?

চারণ ভোলানন্দজিকে জিজ্ঞেস করল।

উনি হেসে বললেন, মানে হচ্ছে, "দ্য ডিফিকাল্ট রেজল্যুশান।"

তারপরই স্টিভেন্স-এর দিকে ফিরে বললেন, কি ? ঠিক বলেছি ?

কন্দরের মধ্যে যে স্বল্প কজন মানুষ বসে ছিলেন তাঁরা চুপ করেই রইলেন। সব চেয়ে বেশি অবাক হলেন সেই দুই বিদেশি, গর্ডন আর স্টিভেন্স। দেবপ্রয়াগের অলকানন্দা আর গঙ্গার তীরের এই সুউচ্চ শিবালিক পর্বতমালার গায়ের গুহাভ্যন্তরের বাসিন্দা এই লুঙি-পরা বাঙালি সন্ন্যাসীর জ্ঞানের বহরে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেন। ভারতীয়রা তো ইংরেজরই চাকর ছিল। ইংরেজি ভাষাটা শিক্ষিত ভারতীয়রা ভাল জানতেই পারেন। কিন্তু জার্মান ?

চারণের মনে হচ্ছিল, পাটন তার একটি মস্ত বড় উপকার করেছে। তার এই "মুখখিস্ত্যানন্দ" বাবা অচিরেই চারণের মনে যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন নিজেকে, বিনা চেষ্টাতে, বিনা আড়ম্বরে, সেই আসন টলানো কোনওমতেই হয়তো সম্ভব হবে না। ভাবছিল ও যে, যে-কোনও সম্পর্কেই শ্রদ্ধাই হচ্ছে আসল। সিমেন্টিং ফ্যাক্টর। সে সম্পর্ক প্রেমেরই হোক, দাম্পত্যেরই হোক, আর ভক্তিরই হোক। শ্রদ্ধাই বেঁধে দেয় বিনিসুতোর মালা, দুজনের মধ্যের সম্পর্ককে।

এমন সময় পাটন ফিরে এল।

ভোলানন্দজি বললেন, আস্ত পৌঁছাইছে তো আমার বন্ধুর মাইয়াডা ? না কি পথেই বর্ষার দিনে শিয়ালে যেমনে কইমাছের মাথা চিবাইয়া ক্ষ্যাত-এর আল-এর উপরে ফ্যালাইয়া থোয়, তেমনি কইর‍্যা তারে চিবাইয়া চিৎ-কইর‍্যা ফেইল্যা আইছস ? বদনাম হইব অনে এই বুড়ারই।

আপনাকে কেউ বদনাম দেবেই না। আর আপনি যদি বুড়ো হন তো ছোঁড়া কে ?

ক্যান ? বদনাম হইব না ক্যান ?

আপনি তো এই প্রকারের কইমাছ কখনও খানইনি। তার মাথা আর লেজ। যদি কোনওদিন খেয়ে থাকেনও তবুও কী করে খেতে হয় তা এখন নিশ্চয়ই পুরোপুরি ভুলেই গেছেন। আপনার কোনওই ভয় নেই। বদনাম করলে, কি খুন করলে, লোকে আমাকেই করবে।

চারণ, পাটনের ধৃষ্টতা ও সাহসে হতবাক হয়ে গেল। তাছাড়া, যদি ভোলানন্দজি একা থাকতেন তাও না হয় অন্য কথা ছিল। এতজন মানুষের সামনে।

কিন্তু ভোলানন্দ মহারাজ তো নন, যেন বাঙাল শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্চর্য শিশুসুলভ হাসি হেসে বললেন, হারামজাদা। তরে আমি একদিন মাইর‍্যাই ফ্যালাইমু।

আনডন্টেড রাসকেল, রাসকেল অফ দ্য ফারস্ট ডিগ্রি, পাটন, হেসে বলল, কইমাছই খেতে পারেন না তার আমাকে খাবেন। ফুঃ ! আমাকে হজম করতে আপনার পঞ্চাশবার জন্মে আসতে হবে। আমার বাবা হারামি টু দ্য পাওয়ার ওয়ান মিলিয়ান আর আমি হলাম হারামি টু দ্য পাওয়ার এন। আমাকে খেলে, সারাটা জীবন আপনি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে মরবেন।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল পাটনের এক্তিয়ার-বহির্ভূত তাচ্ছিল্যময় বাগাড়ম্বরে।

কিন্তু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভোলানন্দ মহারাজই সবচেয়ে আগে হাসলেন। আর সে কি হাসি ! রামকৃষ্ণদেবকে চারণ তো চোখে দেখেনি। দেখলে, হয়তো তাঁর হাসিও এমনই দেখাত।

হাসি থামলে উনি বললেন, কোনও সার্কাসই যেমন একজন জোকার ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে তেমনই আমাদের এই দেবপ্রয়াগের ছোট্ট সার্কাসও পাটন না থাকলে অসম্পূর্ণ থাকত।

কথাটা বললেন ইংরেজিতেই, যাতে গর্ডন এবং স্টিভেন্স নামক দুই বিদেশি বুঝতে পারেন।

ভোলানন্দজি এবারে পাটনকে বললেন, ধুনির আগুনটা একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে এসে বোস। বাইরে ঠাণ্ডাটা কি বাড়ল ?

www.MurchOna.com

পাটনের সঙ্গে ভোলানন্দজি অনেক সময়েই বাঙাল ভাষাতে কথা বলেন দেখে চারণ ভেবেছিল পাটনদের আদি বাড়িও বোধ হয় পুব-বাংলায়। ওকে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল আমার ঠাকুর্দা হাওড়া জেলার ডাকাত ছেল। বাবা, প্রথম জীবনে ওয়াগান ব্রেকার। তারপরে ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট। সাতজন্মেও আমরা কেউ যাইনি পুব-বাংলাতে।

শুনে অবাক হয়েছিল চারণ।

ঐ রকমই।

পাটনের হাবভাব কথাবার্তা শুনলে কে বলবে যে ও ন-দশ বছর স্টেটসে ছিল। দেশে হা-ভাতে এবং বিদেশে গিয়ে অ্যাফ্লুয়েন্ট প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই দিশি বাঙালিদের মানুষ-প্রজাতির মধ্যেই গণ্য করেন না। সেখানে যাঁরা বিরাট বাড়ি ও ঢাউস গাড়ি নিয়ে গরিব বাঙালি-পাঁঠার মতনই নিরীহ এবং কূপমণ্ডুক দিশি আত্মীয়-বন্ধুদের "ঈর্ষান্বিত" করেন বলে ভাবেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশেই যদি থাকতেন তাহলে হয়তো মাসে পাঁচ হাজার টাকাও রোজগার করতে পারতেন না। টাকার অঙ্কের পরিমাণের উপরেই মানুষের মনুষ্যত্বর দীপ্তি বাড়ে না বরং অনেকক্ষেত্রেই তা জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশানে হ্রাসই পায়, এই সরল সত্যটি অনেক এনআরআই-ই কনভিনিয়েন্টলি ভুলে যান।

শ্যামানন্দজি বললেন, গর্ডনকেই উদ্দেশ্য করে, এবার আমরা সকলে মিলে একটু ভজন করি? আজ দিওয়ালির রাত। কী বলুন।

আমাদের তো রোজই দিওয়ালি।

ভোলানন্দ মহারাজ বললেন, আজ যে সিনিবালি।

তা বটে।

ভজন শুরু করার আগে যদি গর্ডন আর স্টিভেন্স-এর আর কোনও প্রশ্ন থাকে তো তারা করে নিতে পারে। আজ আমি একটু পরেই ধ্যানে বসব। তোমরা অবশ্য এখানেই থাকতে পারো। আমি বাইরে যাব।

স্টিভেন্স বললেন, একটা প্রশ্ন, গোড়ার প্রশ্ন, আমার মন তোলপাড় করছে বহুদিনই হল কিন্তু কারওকে জিজ্ঞেস করেই স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর পাইনি আজও।

কী প্রশ্ন?

ধর্ম কি?

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

ভোলানন্দ মহারাজ হিন্দিতে বললেন, ভাল দিনে ভাল প্রশ্নই করেছে স্টিভেন্স। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তো এক রাতে কুলোবে না। তারপরেও কত রাত কত দিন যে কেটে যাবে কে বলতে পারে।

শ্যামানন্দজি বললেন,

"যতহোভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম"

গর্ডন বোধহয় একটু সংস্কৃত জানেন। তাঁর বাঁ কানটা দুবার নড়ে উঠল। কিন্তু শ্লোকটি পুরোপুরিই চারণের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। লজ্জাতে দুকানই লাল হয়ে গেল ওর।

মানেটা বুঝিয়ে দাও শ্যামানন্দজি।

ভোলানন্দ বললেন।

হ্যাঁ। তারপর বললেন, ধর্ম যে কি? তা তো এক কথাতে বলা মুশকিল। যে কাজে ইহলোক এবং পরলোকের সুখ নির্বিঘ্ন হয়, ঈশ্বরের সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, যে পথ ও পন্থাতে চললে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং যে সব কাজ করলে, পরলোকের সুখের পথের বাধা আসতে পারে, সেই সব কাজ ও পন্থা পরিত্যাগ করে যা-কিছুই ইহলোক এবং পরলোকের মঙ্গলসাধক, তেমন কর্ম করাই মানুষের ধর্ম। তাই ধর্ম।

ঠিক পরিষ্কার হল না।

www.MurchOna.com

স্টিভেন্স বললেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধৃতা প্রজাঃ।"

এই শ্লোকটির মানে কি ?

এবারে চারণ বলল।

শ্যামানন্দজি বললেন, এর মানে হচ্ছে, যা না হলে সংসার চলতে পারে না বা স্থির থাকতে পারে না এবং যা পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ডর অন্যান্য সকল লোককে ধারণ করে থাকে, তাই ধর্ম। এবং যা-কিছুই এর বিপরীত অথবা এর বিপরীত ফল উৎপন্ন করে, তাই অধর্ম।

বাঃ।

ভোলানন্দজি স্বগতোক্তি করলেন।

তারপরে ভোলানন্দজি বললেন, রবীন্দ্রনাথ সোজা করে বলেছিলেন এক কথায়, "যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম।" A force which binds together.

তারপরই বললেন, কী অবস্থা হল বলুন তো। বিদেশে, বিশেষ করে জার্মানিতে সংস্কৃত চর্চা হচ্ছে এত, আর স্বদেশেই সেই ভাষার কোনও কদর নেই। শুধু সংস্কৃতই নয়, আরবি এবং ফারসিরও সেই একই অবস্থা। আমরা আমাদের ছেলেবেলাতে দেখেছি যে, অনেক শিক্ষিত বাঙালিই বাংলার উপরে ইংরেজি যেমন জানতেন, তেমন সংস্কৃত ও আরবি অথবা ফারসিও জানতেন। দুই থ্রি-পিস-স্যুট পরা সাহেব, মানে, নেহরু আর জিন্না সাহেব, বিভাজিত দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বনে গিয়ে ফারসি, আরবি আর সংস্কৃতর সর্বনাশ করে দিলেন। অথচ দেখো, ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মূল সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিকতা সব কিছুরই গোড়া হচ্ছে ওই সব ভাষাই। উর্দু তো এই সেদিনের ভাষা। খিচুড়ি ভাষা। Commoner-এর ভাষা। অবশ্য খুবই সুললিত ভাষা। কিন্তু মুসলমানেরা নামাজ পড়েন বা মোল্লারা আজান দেন কি উর্দুতে ?

চারণ বলল, সে কথা ঠিক। সংস্কৃতর মতন ভাষাও হয় না। কী ঝংকৃত। কী তার সাহিত্য, কাব্য।

পাটন মাঝে পড়ে বলল, আমার এক বন্ধুর বিয়েতে পার্ট-টাইম, গাঁট-কাটা এক পুরুত "পুরোহিত-দর্পণ" বই দেখে বিয়ের মন্ত্র পড়তে গিয়ে বিয়ের মন্ত্রর বদলে শ্রাদ্ধর মন্ত্র পড়ে দেওয়াতে তার স্ত্রীর সঙ্গে অনুক্ষণ মারামারি-কাটাকাটি লেগেই আছে সেই ফুলশয্যার রাত থেকেই। শিগগির হয়তো ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে। নেহাতই লোকভয়ের ভয়েই এখনও জুড়ে রয়েছে। কী ব্যাপার একবার ভাবুন তো দেখি !

ভোলানন্দজি হেসে ফেললেন।

শ্যামানন্দজিকে বললেন, দেখছ তো ! আমি যা বলে আসছি এতদিন তা ঠিক কি না ! সংস্কৃতভাষা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে টিভি-র "হমে শোচনা হ্যায়" মার্কা হিন্দির পত্তন করে এত বড় একটা মহান দেশকে তার মূল ধার্মিক, সাহিত্যিক, লৌকিক, সাঙ্গীতিক উৎস থেকে জবরদস্তি করে দূরে সরিয়ে এনে দেশটার সর্বনাশ করে দিলেন ওঁরা।

চারণ অবাক হয়ে ভোলানন্দজির দিকে চেয়ে বলল, আপনি যে এতসব বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং নিজেকে উত্তেজিতও করেন তাতে আপনার মনের শান্তি, চিন্তার স্বচ্ছতা বিঘ্নিত ও আলোড়িত হয় না ?

ভোলানন্দজি হাসলেন।

বললেন, মানুষের মন কি আর পানা-পুকুর চারণবাবু ? মন হচ্ছে সমুদ্র। তার কত গভীরতা, তার গভীরে কত পাহাড়, রাজপথ, ফুল, জীবজন্তু বাস করে। সমুদ্রের গভীরে কতরকমের তাপ ও শৈত্য, কতরকমের প্রবাহ, প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরি, হিমবাহ। মানুষের মনে যা আঁটে, তা পৃথিবীতেও আঁটে। শান্তি বা মনোসংযোগ যদি একবার আয়ত্ত করে ফেলা যায় তবে কোনও চিন্তাই আর সেই শান্তি এবং মনোসংযোগকে একটুও বিঘ্নিত করতে পারে না।

তাই তো দেখছি।

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মুগ্ধ চারণ বলল।

পরলোক কি সত্যিই আছে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা গর্ডন নামের বিদেশি জিজ্ঞেস করলেন।

মনে হয়, মানুষটি আমেরিকান।

ভোলানন্দ মহারাজ বললেন, ভূলোক ছাড়াও যখন অন্য অনেক লোক আছে তখন পরলোকও আছে। দেবতাশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডর মধ্যে অনেকই "লোক" আঁটে।

তারপর বললেন, এই তোমরা যাকে বল UNIVERSE আমরা তাকেই বলি "ব্রহ্মাণ্ড"। "অণ্ড" মানে EGG। ব্রহ্মাণ্ডর অবয়ব অনেকটা ডিমের মতন তাই তার নাম ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভূবর্লোক, স্বরলোক, মহার্লোক এবং ব্রহ্মলোকও আছে। পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে আছে সুউচ্চ সব পর্বতমালা, যাদের নাম লোক ও অলোকা। আমাদের শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে মৃত্যুর পরে "ব্রহ্মরন্ধ্র" দিয়ে, দেবতা ইন্দ্র, যাঁর পরলোকে যাওয়ার বাধা আছে তার শরীর আছে বলে, সেই সব বিদেহী আত্মাদের নিরন্তর পরলোকের পথে পাঠান। পৃথিবী আর ব্রহ্মলোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে আছে এক মৃদু এবং প্রায় অনুপস্থিত হাওয়া। প্রাণ হচ্ছে একক সত্তা আর হিরণ্যগর্ভ হচ্ছে বহু প্রাণের সমষ্টি। সম্মিলিত প্রাণ। এই পৃথিবী, এই প্রাণ, এই হিরণ্যগর্ভ সবই ব্রহ্মারই মধ্যে লীন।

শ্যামানন্দজি বললেন, মহাভারতে পাণ্ডবদের স্বর্গবাসের কথা আছে। অনেকেরই মতে, স্বর্গ এই পৃথিবীতেই আছে।

ভোলানন্দজি বললেন, ঋগ্বেদে "ইলাস্বর্গর" কথা আছে। অনেকের ধারণা এই "ইলা" হচ্ছে চীনদেশের উত্তরভাগের "অলতাই" পর্বতমালা। স্বর্গ পৃথিবীতেই আছে। পরলোক আর স্বর্গ এক নয়। ওই অঞ্চলে যেসব মানুষের বাস তাঁদের বলে "দেব", তাঁদের আবাসস্থলকে বলে "দেবভূমি", তাদের ভাষা, সংস্কৃতকে বলে "দেবভাষা"। আমরা যাঁদের ব্রাহ্মণ বলি, তাঁদের নাম ভূদেব।

শ্যামানন্দজি বললেন, ভাল কাজ করলে মানুষের যে স্বর্গবাস হয়, এই ভাবনার মধ্যে তো কোনও দোষ নেই। এই ভাবনা ভুল হলেও দোষ নেই। আমি অন্তত দোষ দেখি না।

গর্ডন বলল, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

"ধর্মবোধ"-এর সঙ্গে অনাদিকাল থেকেই ভারতের মানুষদের কাছে শুভাশুভ বোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে। কেউ ঈশ্বরকে স্বীকার করলেন কি না ("কম্যুনিজম"-এর থিওরির মধ্যে আমি কোনও দোষ দেখি না) বা তথাকথিত ভারতীয় "ইনটেলেকচুয়ালরা" ঈশ্বর বা ধর্ম মানলেন কি না মানলেন, তাতে ভারতের এবং বাংলাদেশের এমন কি পাকিস্তানেরও মূল সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধার্মিক প্রবাহের কিছুমাত্র যায় আসেনি। আসবে না। তবে সর্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত তাঁদেরই নিজের নিজের ধর্মর "গোঁড়া" জনসাধারণের সঠিক পথে চালিত করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে এই, গর্ডন যে, তোমাদের সব পশ্চিমী দেশও এখন ভারতীয় ইনটেলেকচুয়ালদেরই মতন ছদ্ম আঁতেলকচুয়ালস-এ ভরে গেছে।

গুরু, ধর্ম, ঈশ্বর, ঈশ্বরবোধ, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী, পরলোক, এই সব ব্যাপার অত্যন্তই গোলমেলে গর্ডন। আজ থাক। পরে হবে। আজ দিওয়ালির দিনে কথা কম বলে, এসো আমরা কৃষ্ণা উলঙ্গিনীর ভজনা করি।

পাটনের সঙ্গেই গুহার ভিতর থেকে বেরোল চারণ। তারপর চাতাল পেরিয়ে ধুনির পাশ কাটিয়ে বাইরে এসে পড়ল। বাইরে আসতেই বুঝতে পারল ঠাণ্ডার বহর। গুহার ভিতরে অনেকে থাকায় মানুষের শরীরের উত্তাপ তো ছিলই, তার উপরে গুহামুখে ধুনি জ্বলাতে ভিতরটা গরমও হয়ে ছিল বেশ।

পাটন বলল, মাথা ধরেনি আপনার চারণদা ?

বাবা। হঠাৎ চারণদা ?

নাঃ। পরীক্ষাতে পাশ করিয়ে দিলাম আপনাকে। বাবার "স্যার" ছিলেন এখন আমার দাদাতে প্রমোশন দিলাম। এবারে বলুন, মাথা গরম হয়েছে কি না ?

www.MurchOna.com

তা একটু হয়েছে বই কী।

উঃ রিঃ ফাদার। এক সঙ্গে এত জ্ঞান কি সহ্য হয়? গাঁজা খেলেও মাথা এত গরম হয় না। আর ঐ অ্যামেরিকান দুটোও কেমন আদেখলাপনা করছিল লক্ষ করেছেন? ওদের জন্য সিম্পল ইংরেজিতে "মোক্ষ মেড ইজি" বলে একটা বই লিখব আমি। ভাবছি, সিরিয়াসলি। মোক্ষলাভের জন্য কোনও ট্যাবলেট বানানো গেলেও বানানো যেত। ইনস্ট্যান্ট কফিরই মতন ইনস্ট্যান্ট মোক্ষ। আধ-গেলাস জলের সঙ্গে গিলে ফেললেই বাসস। ও ব্যাটাদের কি অত ধৈর্য আছে যে আমাদের সাধু-সন্নিসীদের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে মোক্ষলাভ করবে? যারা নিজেরা হাত দিয়ে দাঁত মাজে না, ছুছু করে না, গাড়ির গিয়ার চেঞ্জ করে না, গ্যারাজের গেট খোলে না, ঘরের দরজাও, যে মহৎ ও ব্যস্ত মানুষদের সময়ের এতই দাম, তারা করবে এত সময় নষ্ট।

তা করছে বলেই তো মনে হল।

চারণ বলল।

ওরা দুজনে করছে। কিন্তু ওরা একসেপশান। একসেপশান প্রুভস দ্য রুল। দশ দশটা বছর ওদের মধ্যে থেকে ওই নিজেদের স্বাস্থ্য আর অর্থ-সর্বস্ব মোটা-মাথা, ঘোর তামসিক জাতটা সম্বন্ধে আমার ঘেন্না জন্মে গেছে। সারা পৃথিবীকে অর্থলোভী, মুনাফাসর্বস্ব-বিজ্ঞাপনসর্বস্ব করে তোলার পেছনে ওদের যা অবদান তা বলার নয়। সমস্ত পৃথিবীকেই নষ্ট করে দেওয়ার মূলে ওরা। ওদের বিচার একদিন করবে সারা পৃথিবীর মানুষে।

ওদের নাম কি?

কাদের?

আরে। ওই যে! ওই অ্যামেরিকানদের।

একটার নাম রনাল্ড গর্ডন। হুস্টনে বাড়ি। আর অন্যটার নাম জিম স্টিভেন্স, সেটার বাড়ি কেচাম-এ।

কোনজন স্টিভেন্স? দুজনের মধ্যে যে বয়সে বড়?

না, দেখতেই বড়। কিন্তু গর্ডনটাই ধাড়ি আর স্টিভেন্সটা ছোট।

তাই? তা কেচাপটা কোথায়?

চারণ শুধোল।

কেচাপ নয়, স্যার, থুরি চারণদা, কেচাম। আপনি কি টোম্যাট্যো কেচাপ ভাবলেন না কি? কেচাম হল গিয়ে আইডাহো স্টেট-এর একটি জায়গা।

আইডাহো! নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।

লাগতেই পারে। আর্নেস্ট হেমিংওয়েতো আইডাহোর কেচাম-এই আত্মহত্যা করেছিলেন।

পাখি শিকারে গিয়ে। না?

না না। ওঁর বাড়িতেই। আমি দেখে এসেছি সেই বাড়ি।

ইনকামট্যাক্সওয়ালারা বহতই তংক করেছিল। আইনস্টাইন আর হেমিংওয়ে দুজনেই ইনকামট্যাক্সওয়ালাদের ভীষণই ভয় পেতেন। আর রঙ্গই বটে! চোর-বদমাস গাঁটকাটা-স্মাগলার সকলকে বগলের তলা দিয়ে পার করে দিয়ে, ধরত ধর গরীব কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-গায়ককে!

তুমি নিজে গেছ হেমিংওয়র সেই বাড়িতে?

গেছি মানে, ঢুকিনি। বাইরে থেকে দেখেছি। স্কুলে পড়ার সময়ে SNOWS OF KILLIMANZARO...দেখেছিলাম। তখন থেকেই আমি ওঁর ভক্ত।

তারপর বলল, ভারী চমৎকার বাড়ি চারণদা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে। বাড়িটা একটা টিলার উপরে। নীচ দিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে একটা রূপোলি নদী বয়ে গেছে। তার নামও SNAKE RIVER.

খুব সুন্দর নদী? নামটাও সুন্দর তো!

হ্যাঁ। খুবই সুন্দর।

www.MurchOna.com

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে ওরা আর অলকানন্দা, মন্দাকিনী, গঙ্গা, ইউওল...কোথায় পাবে বলুন ? আমাদের যে "দেবভূমি" ! "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি ।"

তারপরই বলল, স্বগতোক্তির মতন, আশ্চর্য । সারা পৃথিবীর মানুষে এ কথাটা বুঝল, বুঝলাম না শুধু আমরাই !

শুধু নদী আর পর্বতমালা দিয়ে তো একটা দেশ হয় না পাটন । দেশের মানুষ দিয়েই দেশ হয় । মানুষ হিসেবে যে আমরা বড়ই খারাপ হয়ে গেছি । এত মূল্যহ্রাস তো আর কোনও কিছুরই হয়নি ।

অন্য দেশের মানুষও কি খুব ভাল আছে চারণদা ? অন্য কোনও দেশে ভোলানন্দ বা শ্যামানন্দজিদের মতন বেশি মানুষ পাবেন ? আপনার অনেক পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল যে ওঁদের দেখা পেয়েছেন । আপনি যদি গাড্ডুবাবা বা ভোঁদাইবাবার খোঁজ না করতে আসতেন, মানে, আপনার মনে যদি ভোঁদাইবাবা সম্বন্ধে জেনুইন ইন্টারেস্ট না জন্মাত, তবে আপনাকে আমি এখানে আনতামই না ।

তুমি হৃষীকেশে এসেছিলে কেন ? এবারে ?

চারণ জিগ্যেস করল, পাটনকে ।

আপনাকেই ঢুঁড়তে ।

সত্যি ?

সত্যি ।

কেন ?

বললামই তো ! তাছাড়া স্বামীজিকে আপনার ভোঁদাইবাবা-গাড্ডুবাবা এক্সপিডিশান-এর কথা বলেছিলাম । হেসে গড়াগড়ি গেলেন । তারপর বললেন, লইয়া আয় তারে । দেহি,কোন মালে স্যা তৈরি ।

কথাবার্তার ফাঁকে হঠাৎ মাথার উপরে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চারণ ।

কী হল ? খুব ঠাণ্ডা লাগছে না কি ? এখনই কী ! সবে তো দীপাবলী এল । জানুয়ারির শেষ অবধি শনৈঃ শনৈঃ এগোন তবে তো বুঝবেন ঠাণ্ডা কাকে বলে ! তবে এসব জায়গাতে আপনার মস্তিষ্ক সবসময়ে এমনই সজাগ থাকে, এমনই চিন্তাক্লিষ্ট যে আপনার মস্তিষ্কর আগুনই আপনার শরীরে ওম ধরাবে । শীত-গ্রীষ্মের বোধই চলে যাবে । আগুন পোড়ায় শরীরকে, চিন্তা পোড়ায় মনকে ।

চারণের ভীমগিরি মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল ।

না । সেজন্যে নয় । মানে, শীত লাগছে বলে নয় । তারা দেখছি । হৃষীকেশ-এও আকাশ পরিষ্কারই ছিল । কিন্তু এমন নয় ! সত্যিই বোধহয় এসব দেবভূমিই ।

হৃষীকেশে প্রতিদিন কয়েক হাজার ভটভটিয়া ডিজেলের কালো ধোঁয়া আর কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে যাওয়া-আসা করে হরিদ্বার থেকে । সকাল থেকে রাত নটা দশটা অবধি । সেখানেও পল্যুশান আছে । রামঝুলা-লছমনঝুলা পেরিয়ে আসার পরই শুধু সেসবের হাত থেকে বাঁচোয়া !

মন্ত্রমুগ্ধর মতন চারণ স্বগতোক্তি করল, এত তারা !

বুকের মধ্যে গুনগুন করে উঠল সেই গানটা ।

জয়িতা ভারী ভাল গাইত ।

"আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নিজ্বলে ।
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ।
ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রণ ॥"

হ্যাঁ চারণদা । একেই বলে ব্রহ্মাণ্ড । দ্য উনিভার্স । কে যে একে ধারণ পালন করছেন, কে যে যুগযুগান্ত ধরে এদের আবর্তিত করছেন, লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ফুলের গায়ে, পাখির গায়ে, প্রজাপতির গায়ে, তুলি বুলিয়ে এমন বিচিত্রারঙা করেছেন তাদের প্রত্যেককে, তাদের প্রত্যেকের গলাতে আলাদা

www.MurchOna.com

আলাদা গান দিয়েছেন, ছন্দ দিয়েছেন, ওড়ার ঋতি দিয়েছেন, চলার, এ এক আশ্চর্য কাণ্ডমাণ্ড চারণদা।

তারপর একটু থেমে বলল, ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে বিস্ময়ে।

সাধে কি আর গর্ডন, হুস্টনের NASA থেকে এখানে এসে আছে। এখন NAUSEA-র সঙ্গে NASA-কে নাসা করে উগরে দিয়েছে পুরোপুরি। রকেট উৎক্ষেপণ করে আর ব্রহ্মাণ্ডর মধ্যে সাঁতরে বেড়াবার জন্যে কিছু ছারপোকার মতন স্যাটালাইট ছেড়ে দিয়ে ইমিটেশান জুয়েলারিরই মতন নিজেদের ইমিটেশান-ব্রহ্মা মনে করে গর্বে আর শ্লাঘাতে বেঁচে না থেকে তাইতো ORIGINAL MR ব্রহ্মার খোঁজে চলে এসেছে সে স্বামীজির পায়ে পায়ে।

তারপর বলল, রনাল্ড গর্ডন কত বড়লোক পরিবারের ছেলে জানেন ? ট্রিলিনিয়র বললেও ওর বাবা মিকি গর্ডনকে কিছুই বলা হয় না। আর রনাল্ডই একমাত্র সন্তান ওদের মা-বাবার। তবে বাঙালি মা-বাবা তো নন ! তাদের নিজেদের জীবন আছে বাঁচা-মরার জন্যে। ছেলের দুঃখে কেঁদে কেঁদে রুমাল ভেজাননি তাঁরা। তবে গত ক্রিসমাসের সময় রনাল্ডকে দেখতে এসেছিলেন ওঁরা দুজনে। মানে একমাত্র সন্তানের বকে-যাওয়ার রকম সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করতে। এই আশ্রমেও এসেছিলেন।

কী করলেন ? কান্নাকাটি ?

তা নয় দাদা। উলটে এতই অভিভূত হয়ে গেছিলেন যে, তা বলার নয়। স্বামীজীকে BLANK CHEQUE-ও দিয়েছিলেন সই করে একটা। বলেছিলেন, সাত অঙ্ক আট অঙ্ক যা খুশি অঙ্ক বসিয়ে নিতে।

কী করলেন উনি ?

স্বামীজি ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে কিছু টাকা কালিকমলি বাবার আশ্রমে দিয়ে দিন অথবা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। ওঁরা সত্যিই ভাল কাজ করেন। আমি নিয়ে কী করব ? আমি তো কারও সেবা করি না। আর নিজের টাকার প্রয়োজন, শুধু টাকাই বা কেন, অন্য সব কিছু জাগতিক জিনিসের প্রয়োজনই আমার মিটে গেছে।

রনাল্ডের বাবা বলেছিলেন, আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন স্বামীজি, বড়লোক হওয়ার আশীর্বাদ নয়, বড় মানুষ হওয়ার আশীর্বাদ। টাকার সাধনাতেই তো আমরা বুঁদ হয়ে আছি। সাফল্য আর টাকা SYNONYMUS হয়ে গেছে আমাদের কাছে। আমাদের ছেলে টাকাকে কাগজ মনে করার সাফল্য অর্জন করুক। তাই হবে তার দিগ্বিজয়। আমরা জল খেতে আসা হাতিরই মতন কাদাতে আটকে গেছি। আমাদের না জলে যাওয়া হল, না হল বাঁচা, মানে, বাঁচার মতন বাঁচা।

চারণ জিজ্ঞেস করল, শুধুই কালি কমলি বাবা আর ভারত সেবাশ্রম কেন, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম বললেন না কেন ভোলানন্দজি ?

রামকৃষ্ণ মিশন তো কোটিপতি।

পাটন বলল। তারপর বলল, তেলা মাথাতে তেল ঢালা হবে ভেবেছিলেন হয়তো। তাছাড়া, কথাবার্তাতে বুঝেছি যে, উনি রামকৃষ্ণ মিশনের TOP HEAVY ব্যাপার-স্যাপার বোধহয় বিশেষ পছন্দ করেন না। তাছাড়া, একদিন শ্যামানন্দজির সঙ্গে আলোচনা করতেও শুনেছিলাম স্বামীজিকে যে, অনেকই দিন হল রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দুধর্মের প্রচার আর প্রসারের চেয়ে সাংস্কৃতিক ব্যাপার-স্যাপারের দিকেই নাকি বেশি ঝুঁকেছেন। POMP AND SPLENDOUR-এর দিকে। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতাটা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, যেখানে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুধর্মের নাকি এখন আর বিশেষ যোগই নেই। অথচ হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারেরই জন্য ওই মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একদিন।

সত্যি ?

আমি কী করে জানব ? স্বামীজি এবং শ্যামানন্দজিরই মতামত এসব।

ওঁরা ভ্রান্তও তো হতে পারেন।

www.MurchOna.com

চারণ বলল।

হতেও পারেন। নিজেদের অভ্রান্ত বলে দাবি তো ওঁরা কখনওই করেন না। আমি দুদিনের চিড়িয়া কতটুকুই বা জানি! অত বেশি জ্ঞানগম্যি হলে আমার মাথা চুঁইয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ে যাবে যে। "ছুছুন্দরকা শরপর চামেলিকা তেল"-এর মতন আনওয়ানটেড সিচুয়েশান হবে।

চারণ মুগ্ধ গলাতে বলল, বাঃ দ্যাখো! দ্যাখো। ওই গাছগুলোকে তারার আলোতেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে। না?

হ্যাঁ। ওগুলো তো সিলভার-ওক। দেখাবেই তো! আর পূর্ণিমার রাতে যা দেখায় না!

একটু বসি এখানে পাথরে। একটু আকাশ দেখি পাটন। তোমার আপত্তি আছে? আহা! মনটা জুড়িয়ে গেল যেন।

আপনি তারা চেনেন?

পাটন জিজ্ঞেস করল।

কিছু কিছু চিনি। একটা সময়ে প্ল্যানেটোরিয়াম-এ নিয়মিত যেতাম। আমাদের কলকাতার কলেজের অবসার্ভেটরির টেলিস্কোপও বিখ্যাত ছিল।

কোন কলেজে পড়তেন আপনি?

সেইন্ট জেভিয়ার্স।

তাই? আমিও তো ওই কলেজেরই ছাত্র। তাহলে আমরা দুজনেই জ্যাভেরিয়ানস!

বলেই বলল, আপনি তারাদের ভারতীয় নাম জানেন? ভারতীয়রা যে সময়ে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেছিলেন এবং আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন সে-সম্বন্ধে পশ্চিমীরা কিছুই জানে না। দুশো বছর পরাধীন থাকাতেই ইংরেজদের দেওয়া চশমা পরে সবই ইংরেজিতে পড়েছি, জেনেছি। নিজেদের কোনও কিছু সম্বন্ধেই আমরা সচেতন বা অবহিত ছিলাম না। বিশেষ করে বাঙালিরা। খুবই লজ্জার কথা। আর ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন হওয়ার পরে, বিলিতি পোশাক, বিলিতি পণ্য পুড়িয়ে, তারা নিষ্ক্রান্ত হবার পরে দাঁতে দাঁত চেপে পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

তারপর বলল, একটা কথা কি লক্ষ করেছেন চারণদা? স্বাধীনতা আসার পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের একটা NATIONAL IDENTITY ডেভালাপ করল না, "ভারতীয়" বলে আমরা এখনও পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করি।—আমরা এখনও বাঙালি, বিহারি, অসমিয়া, ওড়িয়া বা পাঞ্জাবি মাড়োয়ারিই রয়ে গেলাম। ভারতীয় হয়ে উঠতে পারলাম না।

তা ঠিক।

চারণ বলল।

ওই স্তব্ধ শীতার্ত অন্ধকারের মধ্যে বসে মাথার উপরের তারা-ভরা আকাশের দিকে এবং নদীপথের সিনিবালি দীপাবলীর রাতের দীপান্বিতা দেবপ্রয়োগের দিকে চেয়ে চারণের মনে এক আশ্চর্য মুগ্ধতা এসেছিল। কথা, কোনওরকম কথাই ভাল লাগছে না ওর। এ মুগ্ধতা, অনুষঙ্গর মুগ্ধতা। স্থান-মাহাত্ম্য।

একটা বড় পাথরের উপরে বসল ওরা পাশাপাশি। শিশিরে বৃষ্টির জলের মতন ভিজে ছিল পাথরটি। শিবালিক পর্বতমালার গা থেকে রাতের গন্ধ উঠছে। হাওয়াতে আন্দোলিত হওয়া পার্বত্য গাছ-গাছালি, আর ঘাসে, সেই গন্ধ। নাম-না-জানা রাত-চরা পাখির আর পাহাড়ি ঝিঁঝির ডাক এবং অনেক নীচের অলকানন্দার শব্দ সেই নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্য ছিদ্রিত করছিল শুধু। কত হাজার বছর ধরে হাওয়া, এই নদী, দুই সুউচ্চ গিরির মধ্যবর্তী খাদ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কে জানে তা!

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ওরা পাশাপাশি। নৈঃশব্দ্যর মতন শব্দময়তা যে আর নেই সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে বুঝল চারণ আবার। ভীমগিরি মহারাজের কথা হঠাৎই মনে পড়ল ওর। পড়তেই, মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হল, এসব বৈকল্য তো গৃহীদেরই মানায়। সন্নিসী হবার যার সাধ আছে, তার তো অন্য সন্নিসীর জন্যও মন খারাপ হওয়ার কথা নয়।

www.MurchOna.com

অনেকক্ষণ পরে চারণ বলল, তুমি তারাদের সংস্কৃত নাম জানো কি পাটন ?

পাটন বলল, সব তারাদের দিশি নাম তো জানি না তবে কিছু কিছুর জানি।

চিনিয়ে দাও তো আমাকে। আমি জানি কিছু ইংরেজি নামই। তাও সামান্যরই।

বলেই, উপরে মুখ করে সোজা হয়ে বসল চারণ।

পাটন ওর পাশে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, এটা কার্তিক মাস তো ?

হ্যাঁ। এ বছরে পুজো তো একেবারে শেষে ছিল আশ্বিনের। তাই না ?

তারপরই পাটন স্বগতোক্তি করল, কী লজ্জার কথা। আমরা আমাদের দিশি ক্যালেন্ডারের খোঁজ পর্যন্ত রাখি না আজকাল। আমার এক পিসতুতো দিদির সাত বছরের ছেলে, লা মার্টিনিয়রে পড়ে, সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, "একলা বৈশাখটা আর দুইরা জ্যৈষ্ঠটা কি ব্যাপার বলো তো গো পাটু মামা।"

শুনুন কথা।

একলা বৈশাখ মানে ?

আরে পয়লা বৈশাখকে ১লা বৈশাখ আর দোসরাকে ২রা লেখে না বাংলায় ?

চারণ হো হো করে হেসে উঠল।

একটু পরে চারণ বলল, তবে এটা মানতেই হবে যে, এসব জায়গাতে সত্যিই ভারতীয়ত্ব এখনও পুরোপুরি বেঁচে। সব ব্যাপারেই। দেখলেও ভাল লাগে। জওহরলাল নেহরু 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' লিখেছিলেন। আমিও ভাবছি একটি বই লিখব। তার নাম দেব "ভেরি বিলেটেড ডিসকভারি অফ মাই মাদার ল্যান্ড।"

পাটন বলল, উত্তরে তাকান, উপরে। দেখুন। ওই যে ধ্রুবতারা। উ্য কান্ট মিস ইট।

তারপরই বলল, জানেন, প্রত্যেকটি তারার দিশি নাম শিখে নিয়েছে জিম।

জিম কে ?

আরে জিম স্টিভেন্স। ওর সাবজেক্টই তো ছিল অ্যাস্ট্রনমি। ইংরিজি নাম তো সব ও জানতই। এখানে আসার পরে হামলে পড়ে সব সংস্কৃত বা ভারতীয় নামগুলি শিখে নিয়েছে। খুব পছন্দ ওর নামগুলো। প্রায়ই বলে, কী সুন্দর সব নাম। কী রোম্যান্টিক। গায়ে কাঁটা দেয়।

আরে বলই না নামগুলো। কেবলই যে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ তুমি।

হ্যাঁ জানি। আই হ্যাভ আ গ্রাসহপার মাইন্ড।

বলেই বলল, ওই দেখুন ধ্রুবতারার নীচে একগুচ্ছ তারা। দেখতে পাচ্ছেন ? আ ক্লাস্টার। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। সাতটা তারা। দেখতে পাচ্ছেন ? ওই হল গিয়ে শিশুমার। তারপরে পুবে দেখুন। দেখছেন ? উত্তর-পুবে অ্যাবাউট টেন-ও-ক্লক এ একটি একলা তারা দেখতে পাচ্ছেন ? তার নাম ব্রহ্মহৃদয়।

কি নাম বললে ?

ব্রহ্মহৃদয়।

বাঃ।

তারপর দেখুন। উত্তর-পশ্চিমে অ্যাবাউট টু-থার্টিতে, অভিজিৎ। ব্রহ্মহৃদয় আর অভিজিৎ-এর পায়ের তলায় পুব থেকে পশ্চিমে টেন-ও-ক্লক থেকে ফোর-ও-ক্লক এর মধ্যে রয়ে গেছে একটি ছায়াপথ।

নাম কি ?

জানতাম কিন্তু, ভুলে গেছি।

তারপরে বলল, এরপরে পুব থেকে পশ্চিমে দেখুন। আগে তাকান উত্তর পুবে, একেবারে দিগন্তের দিকে।

রাতে কি দিগন্ত দেখা যায় নাকি ?

www.MurchOna.com

চারণ বলল ।

কী যে বলেন না চারণ দা ! দিক থাকলেই দিগন্ত থাকবে । তার রাত আর দিন কি ?

তা বলছি না । এই পার্বত্য জায়গাতে কি দিনেও দিগন্ত দেখা যায় ? এ তো আর মরুভূমি বা সমুদ্র নয়, কী প্রেইরি-বা সাভান্নাহ্ ল্যান্ডস !

তা অবশ্য ঠিক । তবে আপনার দিগন্ত দেখার দরকাটাই বা কি ? দেখছেন তো তারাই ! দিগন্তে গিয়ে হোঁচট খাবার কোনও দরকার তো নেই । তারারা তো গরু-ছাগল নয় যে দিগন্তে দাঁড়িয়ে বসে ঘাস খাচ্ছে বা জাবর কাটছে । দিগন্তের দিকেই দেখতে বলেছি আমি আপনাকে, দিগন্তে নয় ।

বলো এবারে ।

চারণ বলল । এত কথা ভাল লাগছিল না ওর ।

দেখুন । একেবারে পুবে আছে কৃত্তিকা, ক্রান্তিবৃত্তর একটু উপরের দিকে । কৃত্তিকার বাঁদিকে, একটু নিচেই বৃষরাশি ।

জ্যোতিষীরা যেসব রাশিটাশির কথা বলেন তা কি এইসব তারাদেরই কথা ?

ইয়েস স্যার । বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ছবি "তাহাদের কথা" দেখতে দৌড়লেন আর 'তারাদের কথা' শোনার সময় পেলেন না ? 'সত্যই সেলুকাস । কী বিচিত্র দ্যাশ এই ভারতবর্ষ' ।

তারপরে বল । আবারও উড়লে তুমি অন্য গ্রহের দিকে । আশ্চর্য ছটফটে মানুষ তুমি । তোমাকে নিয়ে সত্যিই পারা যায় না ।

হাঃ । আমার জন্মদাতা খসসর-চূড়ামণি বাপ পারল না, শিক্ষাদাতা পাল-পাল গুরুরা পারলেন না, আর আপনি যে পারবেন তা ভাবলেন কী করে !

বলো ।

হ্যাঁ । ওই দেখুন বৃষরাশির ডানদিকে, প্রায় প্যারালালে, অশ্বিনী । অশ্বিনীর উপরে মেষরাশি । কি ? পাচ্ছেন দেখতে ?

দাঁড়াও । দাঁড়াও । অত হড়বড় করলে কি হয় !

তবে এই দাঁড়ালাম ।

বলল পাটন, দেখুন অশ্বিনীর প্রায় প্যারালালে, তবে ডানদিকে, মীনরাশি । "MEAN" রাশি নয় কিন্তু । "মীন" মানে সংস্কৃতে মাছ তা জানেন তো ? মহামুশকিলেই পড়লাম এই কালো সাহেবকে নিয়ে । সাদা সাহেবরা ফটাফট শিখে ফেলল, দেশ-কুলের যত কুলাঙ্গার সব আমারই ঘাড়ে এসে পড়ে ! ছিঃ !

একটু চুপ করে থেকে বলল পাটন, মীন রাশির প্রায় পায়ের কাছে রেবতী । রেবতীর ডানদিকে শতভিষা, নিচে কুম্ভরাশি, ডানদিকে শ্রবণা । শতভিষার নিচে এবং পশ্চিমে মকররাশি । তার পশ্চিম-উত্তরে উত্তরআষাঢ়া ।

তারপরই বলল, ও চারণদা দেখুন ! দেখাতে ভুলে গেছিলাম, কুম্ভরাশির পশ্চিমে এবং একটু নীচে মকররাশি । উত্তর আষাঢ়ারার নীচে এবং পুবে বৃশ্চিকরাশি এবং পশ্চিমে মুলা ।

কী সব মুলা, তুলা, বৃশ্চিক, মকর ইত্যাদির নামই শুধু বলছ, তারাদের সেইসব সুন্দর নামগুলো সব কোথায় গেল ?

যায়নি কোথাওই । এক একটি CLUSTER-এর মধ্যে বহুতই তারা আছে ।

যেমন ?

যেমন ক্রতু, মরীচি, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা এবং বশিষ্ঠ । এঁরা হলেন সাত ঋষি । জানেন তো ? এঁদের স্ত্রীদের নাম হল সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতী এবং লজ্জা । রেসপেক্টিভলি ।

লজ্জা কি তারার নাম ?

শুধু তারাই নয় । ঋষিপত্নীও বটেন তিনি ।

তারপর ?

www.MurchOna.com

তারওপর যদি এই "গপ্পেদের"র দেশের একটি গল্প শুনতে চান, তা তাও বলতে পারি।

আমার আর কাজ কি ? এখানে তো অকাজ করতেই আসা। কাজ তো এতদিন অনেকই করলাম। বাকি জীবনটা এবারে অকাজই করব।

ফাস কেলাস।

পাটন বলল।

তারপর বলল, গল্পটা কি ?

আমি গুরুমারা কাজ কখনও করি না। অন্য কারও কৃতিত্ব নিজের বলে চালাই না। চালাইনি কোনওদিনই। এই গল্পটি, ভুলভাল হয়ে যাবে হয়তো এতদিন পরে বলতে বসে। অনেকদিন আগে পড়েছিলাম অরূপরতন ভট্টাচার্য মশায়ের "আকাশ চেনো" বইয়েতে।

কে তিনি ? জ্যোতির্বিদ ?

তা বলতে পারব না। শুনেছি যে অধ্যাপক এবং শান্তিনিকেতনবাসী।

কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন ? জ্যোতির্বিদ্যা ?

তাও জানি না। সম্ভবত নয়। বঙ্গভূমে তো ঋষিরা গোস্ত-বিরিয়ানি খায় আর মোচলমান কসাই একাদশী পালন করে। অরূপরতনবাবু বাংলার বা ইংরেজির অধ্যাপক হওয়াটাই মোস্ট প্রব্যাবল। ক্ষণজন্মাদের রাজ্য তো আমাদের। তবে যে বিষয়েই অধ্যাপনা করুন না কেন, একথা বলতেই হবে যে, সহজ ভাষায় ছোটদের জন্যে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। ছোটরা এবং তাদের মা-বাবারাও সমান উপকৃত হবে ওই বই পড়ে।

পাবলিশার কে ?

দে'জ পাবলিশিং। কলকাতার।

ও। তা গল্পটা বলো এবারে।

শোনেননি ? কোষাকুষি থেকে যজ্ঞে ঘি ছিটোবার সময়ে পুরোহিতরা বলেন ওঁ স্বাহা। ওঁ স্বাহা। তা কি অগ্নিদেবকে তাঁর স্ত্রীর দ্বারা উজ্জীবিত করার জন্য ?

তা জানি না। যত উদ্ভট প্রশ্ন।

চারণ বলল।

শাস্ত্রে আছে, অগ্নিদেব একা, তাঁর পরিবার পরিজন কেউ নেই, তিনি আকাশে আপন মনে ঘুরে বেড়ান। হঠাৎ একদিন আকাশে তিনি সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। ভাবলেন, এঁদের বিয়ে করতে পারলে বেশ হয়। সেই মতন তিনি প্রস্তাব পাঠালেন ঋষিপত্নীদের কাছে।

কিন্তু ঋষিপত্নীরা বড় বড় ঋষির স্ত্রী, তাঁরা রাজি হলেন না অগ্নিদেবের কথায়।

ভয়ানক অপমানিত হয়ে তখন লজ্জায় প্রাণত্যাগের জন্যে গভীর জঙ্গলে বসে অগ্নিদেব কঠিন ধ্যান করতে লাগলেন।

দক্ষের এক কন্যার নাম স্বাহা। তিনি আকাশ থেকে অগ্নিদেবের এই কাণ্ড দেখে দুঃখ পেলেন, তাঁর মনে দয়াও হল। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি ? স্বাহার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। নিজের চেহারা বদলে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধরে অগ্নিদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

স্বাহাকে পেয়ে তো অগ্নিদেব খুবই খুশি। তিনি স্বাহাকে বিয়ে করলেন আর সেই থেকে স্বাহা হয়ে গেলেন অগ্নিদেবের স্ত্রী।

দিন কাটতে লাগল।

সপ্তর্ষির অন্যান্য স্ত্রীদেরও পাবার গোঁ অগ্নিদেবের কিন্তু গেল না। ঋষিদের ঝোঁক যখন চাপে তখন তা মানুষের ঝোঁকের উপর দিয়ে যায়।

স্বাহা কি করেন ! একে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে তিনি অন্যায় করেছেন। তার উপরে অন্যান্য ঋষিপত্নীদের রূপ ধরতে তাঁর আর ইচ্ছে করল না। স্বাহা ঠিক করলেন পাখি হয়ে তিনি বাইরেই উড়ে যাবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হবে। করলেনও তাই। স্বাহা পাখি হয়ে বনের বাইরেই উড়ে গিয়ে এক পাহাড়ের চুড়োয় বাসা বাঁধলেন।

www.MurchOna.com

কিন্তু অগ্নিদেবকে ছেড়ে স্বাহার বেশিদিন থাকা হল না। স্বাহা নেই, অগ্নিদেব অস্থির, দিশেহারা। অগ্নিদেবের সেই অবস্থা দেখে ফিরে এলেন স্বাহা।

আগে স্বাহা শুধু অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপই ধরেছিলেন। এখন তিনি ছয় ঋষিপত্নীর রূপ ধরে অগ্নিদেবকে তুষ্ট করতে লাগলেন। সকলের রূপই ধরলেন। কিন্তু ধরলে কী হয়, বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ তিনি ধরতে পারলেন না। বশিষ্ঠ যেমন মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ছিলেন, অরুন্ধতীও ছিলেন ঠিক সেইরকম মহাবিদুষী ও তাপসী। ফলে, অরুন্ধতীর রূপ ধরতে স্বাহা সাহসই পেলেন না।

দিন কাটতে লাগল। স্বাহা একটি পুত্রের মা হলেন। অদ্ভুত দেখতে ছেলেটি। ছেলেটিকে কিন্তু তিনি অগ্নিদেবের কাছে রাখলেন না। যে পাহাড়ে স্বাহা পাখি হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই পাহাড়েরই একটি গুহাতে ছেলেটি বড় হতে লাগল। তার নাম রাখলেন স্বাহা, স্কন্দ।

এদিকে কেলেঙ্কারি হল। সপ্তর্ষির ছয় ঋষিই শুনতে পেলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরা অগ্নিদেবের দাসী হয়েছেন। খুবই রুষ্ট হলেন ঋষিরা। কী, এত বড় সাহস! আমাদের স্ত্রীরা করবেন দাসীপনা।

তাঁরা স্ত্রীদের খুবই ভর্ৎসনা করলেন আর বললেন, যাও, আমাদের সঙ্গে আর তোমরা থাকতে পারবে না।

বেচারি, অসহায় ঋষিপত্নীরা! তাঁদের আর কোথাওই থাকবার জায়গা নেই।

তাঁরা সকলে স্বাহার ছেলে স্কন্দের কাছে এসে সব বললেন। স্কন্দ বলল, চিন্তার কি আছে! আকাশে ছটি তারা হয়ে একসঙ্গে আপনারা থাকুন। তাঁরা তাই থাকলেন। ঐ দেখুন! 'কৃত্তিকা'য় চোখে দেখা যায় যে ছটি তারকা, ওই ছটি তারকাই ছয় ঋষিরই ছয় স্ত্রী।

আর অরুন্ধতী?

তিনি রইলেন বশিষ্ঠের সঙ্গে "সপ্তর্ষি" তারকামণ্ডলে।

বৃষরাশির ওই যে উজ্জ্বল তারা রোহিণী ওটি শুধু একটি তারা নয়।

কৃত্তিকার তারারা তো ছিলেন ঋষিপত্নী। আর রোহিণী?

রোহিণী ছিলেন চাঁদের পত্নী।

চাঁদের নাকি অনেকই বৌ? শুনেছিলাম।

চারণ বলল।

ঠিকই শুনেছেন। কোনও পুরুষ ভাগ্যবান হলে অন্যের বুক তো ফাটেই।

তারপর পাটন বলল, প্রজাপতি দক্ষ, তাঁর ছিল সাতাশটি কন্যা। দক্ষ, তাঁর সবকটি মেয়েকেই চাঁদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। চাঁদ যেমন রূপবান, চাঁদের পত্নীরাও ছিলেন তেমনই সুন্দরী। কিন্তু রোহিণীর মতন এমন সুন্দরী আর কেউই ছিলেন না। চাঁদ তাই রোহিণীকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। চাঁদের প্রত্যেক স্ত্রীর নামগুলি সত্যিই ভারি সুন্দর।

যেমন?

যেমন, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব আষাঢ়া, উত্তর আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা এবং রেবতী।

বাবাঃ। চাঁদ এতো বউয়ের নাম মনে রাখতেন কী করে।

চাঁদের স্ত্রীরা কিন্তু সকলেই আকাশের নক্ষত্র। এক একটি নক্ষত্রে সাধারণভাবে একের চেয়ে বেশি তারা আছে, রোহিণীতেও তাই। রোহিণী নক্ষত্রে আছে পাঁচটি তারা। প্রতিটি নক্ষত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে প্রাচীন কালের জ্যোতিষীরা বলতেন "যোগতারা"। আর নক্ষত্রের নামে সেটিরও নামকরণ করতেন। তাই যে-তারাটিকে রোহিণী বলা হয়, সেটিও আসলে রোহিণী নক্ষত্র নয়, ওটি হল রোহিণী নক্ষত্রের "যোগতারা"। আর রোহিণী নামেই তার পরিচয়।

তাই?

হ্যাঁ। কৃত্তিকার নাম যোগতারা। নাম ALCYONE, স্টিভেন্স শিখিয়েছে আমাকে। তার নামও

www.MurchOna.com

কৃত্তিকা। আদ্রায় একটিই তারা। ফলে তার যোগতারা আর নক্ষত্রের একই নাম, একই পরিচয়।

পাটন তারপরে বলল, আকাশে চাঁদের স্ত্রীরা চাঁদের কক্ষপথে এমনইভাবে সমান দূরে আছে যে মনে হয় যেন চাঁদ একদিন করে একএক স্ত্রীকে দেখা দিয়ে প্রায় সাতাশ দিনে আকাশকে চক্র দিয়ে আসেন।

বাঃ। কত কি জানবার শোনবার আছে, না ?

চারণ বলল, পাটনের চন্দ্রচর্চা শেষ হলে।

আছেই তো! তবে এবারে ওঠো। চলো। আজ দেবপ্রয়াগের দিওয়ালির রাতে দীপজ্বালানো বাড়ি ঘর দোকান-পাট ঘেরা পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

পাটন বলল, আজ কেন জানি না, খুব পুরী-হালুয়া খেতে ইচ্ছে করছে গরম গরম। সঙ্গে একটু রাবড়িও।

চলো।

বলল, চারণ।

বলেই উঠল সেই শিলাসন ছেড়ে।

আরও একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে করছে।

আপনার করছে না ?

কি ?

আগে বলুন, করছে কি না।

আরে। জিনিসটা কি তা বলবে তো ?

চন্দ্রবদনী।

বলেই, পাটন চুপ করে গেল।

ঝুলোনো ব্রিজের উপর দিয়ে অলকানন্দা পেরিয়ে দেবপ্রয়াগে গিয়ে যখন ওরা ঢুকল তখন দেবপ্রয়াগের চেহারাটাই পালটে গেল। দূর থেকে যে-কোনও জায়গাকেই, বিশেষ করে উঁচু জায়গা থেকে, একরকম মনে হয়, আর সেই জায়গার অভ্যন্তরে পৌঁছলে একেবারেই অন্যরকম। স্থান বা জায়গারই মতন হয়তো মানুষের বেলাতেও এই একই কথা খাটে।

ঘরে ঘরে ঘণ্টা বাজছে, মন্ত্রোচ্চারণ করা হচ্ছে, প্রদীপ জ্বলছে। ধূপ ধুনোর গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। নিজেদের কোনওরকম চেষ্টা ব্যতিরেকেই এই আলোকিত, পবিত্র পার্বত্যগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল যেন ও। এমনই মনে হচ্ছে চারণের।

রাওয়ালদের বাড়িতে যাবেন নাকি ?

কেন ?

বাঃ। চন্দ্রবদনীকে দেখতে। আমার কোনও কেস নেই চারণদা। আমি ওয়াক-ওভার দিচ্ছি।

চারণ হাসল। তারপর বলল, তোমার সঙ্গে কি পরিচয় আছে ?

এখুনি পৌঁছে দিয়ে এলাম তো চন্দ্রবদনীকে। এইটুকুই তো যথেষ্ট পরিচয়।

তারপর বলল, পাটন যেখানে সুঁচ হয়ে ঢোকে, সেখানেই ফাল হয়ে বেরোয়।

এই গুণ তোমার বাবারও ছিল।

সেই শালার কোনও গুণই ছিল না! কার সঙ্গে কার তুলনা!

তারপর বলল, এখন বলুন, যাবেন কি না!

বয়সের এবং অন্য নানা ব্যবধান ভেঙে বলল, থ্যাঙ্ক উ্য। বাট, নো।

বলেই বলল, কিন্তু মেয়েটি কে ? মানে, চন্দ্রবদনী ?

অত সহজেই কি চন্দ্রবদনী কে তা জানা যাবে চারণদা ? এ তো আর অ্যামেরিকান মেয়ে নয়। সে যে ভারতীয়। সে-বেটিদের বুঝতে মোটামুটি একটি ডেট পেলেই যথেষ্ট। দিশি মেয়েরা তো এই অলকানন্দারই মতন গভীর। বোঝা অত সহজ নয়।

আরে বোঝার কথা কে বলছে ? সে কে ? শুধু তাই তো জানতে চাইছি।

www.MurchOna.com

সব আমি জানি না। শনৈঃ শনৈঃ জানা যাবে হয়তো। তবে এটুকু জেনেছি যে, চন্দ্রবদনীর মা বাঙালি। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছেন। সংগীতভবনের ডিগ্রিও ছিল। ওয়াঝালকার সাহেব এবং সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণানের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী ছিলেন না কি।

আর বাবা ?

বাবা হচ্ছেন গাড়োয়ালি। আর্মির ফুল কর্নেল ছিলেন। চন্দ্রবদনীর মায়ের পরিবার দিল্লি প্রবাসী। বাবা রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ।

চন্দ্রবদনীর বয়স যখন আট কী নয়, তখন তার মা এক অ্যামেরিকান বিজনেস টাইকুন-এর সঙ্গে চলে যান স্টেটস-এ।

আবার অ্যামেরিকা !

চারণ বলল, স্বগতোক্তির মতন।

ইয়েস।

চন্দ্রবদনী কি এখন পার্মানেন্টলি রুদ্রপ্রয়াগেই থাকেন ?

না। ও তো পড়াশুনো করেছিল ল্যান্সডাউনের পাবলিক স্কুলে। তারপর দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু উ্যনিভার্সিটিতে। তারও পরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সংগীতভবনের ডিগ্রি নেয়। খুব ভাল বিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল কেশর সিং তার। এয়ারফোর্সের এক টেস্ট পাইলটের সঙ্গে। অজানা অচেনা ছেলেও নয়, দুজনে দুজনকে চিনতও। পছন্দেরই বিয়ে। উইং কম্যান্ডার নরেশ নেগি ছিল তাঁর স্বামীর নাম। কিন্তু প্রথম বিবাহবার্ষিকীর আগের দিন নরেশ নেগি প্লেন ক্র্যাশে মারা যায়। একবছর তিন মাস হয়ে গেছে তাঁর মৃত্যুর। চন্দ্রবদনী এখন দেরাদুনেই থাকে বাবার সঙ্গে। চাকরি অথবা ব্যবসা করবে ঠিক করতে পারছে না। পুজোর সময়ে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছিল ওঁর ঠাকুর্দা ও বড় পিসির কাছে। ক্ষেতি-জমিন আছে। ভারী শান্তি পায় নাকি রুদ্রপ্রয়াগে থাকতে।

তোমাকে এত কথা বলল কে ?

কে আবার ? ভোলানন্দজির কাছেই শুনেছি।

তা, তোমাদের ভোলানন্দজির সঙ্গে চন্দ্রবদনীর বাবার আলাপ হল কী করে।

ঠিক বলতে পারব না। তবে শুনেছি, একজন বাঙালি মেজর-জেনারেল খুব ভক্ত ছিলেন ভোলানন্দজির। চন্দ্রবদনীর বাবার বড় সাহেব। তিনি যখন এই সেক্টরে পোস্টেড ছিলেন তখন প্রায়ই আসতেন ভোলানন্দজির কাছে। সেই সূত্রেই...

এদিকে আর্মির লোকজন থাকেন নাকি ?

আর্মির লোকজন ?

হেসে উঠল পাটন।

বলল, এই যে গঙ্গার বাঁ পাড়ের চওড়া রাস্তা, এই যে সব ব্রিজ, কিসের জন্যে বানানো ? বদ্রীবিশাল-এর মন্দিরের থেকে আরও অনেক অনেক পেছনে আমাদের মাউনটেইন রেজিমেন্টস, এয়ার ফোর্স-এর ইউনিট, আর্টিলারি রেজিমেন্ট সব আছে। চীনেরা কি বরাবর নাকে ঝামা ঘষবে আমাদের ?

তাহলে 'ইলা স্বর্গে' যেতে হলে ইন্ডিয়ান আর্মি, চাইনিজ আর্মি দুপক্ষকেই তুষ্ট করে যেতে হবে বলো ?

তা যা বলেছ।

তারপর যা বলছিলে বলো।

অলকানন্দা কি পুরোটাই এমনই গিরিখাদের মধ্যে দিয়েই বয়ে আসছে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ? অথবা আরও উঁচু থেকে ?

চারণ শুধাল।

না, না। দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছবার আগেই তো অলকানন্দার রূপ খুলেছে। সেখানে নদী অনেক চওড়া। সেখানে নদীর বালির সৌন্দর্য দেখবে, না নুড়ির, না জলের ? শ্রীনগরের কাছাকাছি

www.MurchOna.com

অলকানন্দা যেন আরও সুন্দরী।

শ্রীনগর তো কাশ্মীরে!

হ্যাঁ।

বলল পাটন।

তারপর বলল, ভুলে গেলে চলবে কেন যে, দেশটার নাম ভারতবর্ষ চারণদা। এই দেশের বিভিন্ন এলাকাতে হুবহু একই নামের জায়গা কম করে শ-খানেক করে পাবে। শ্রীনগর মস্ত জায়গা। উপত্যকা তো! সেখানে ভুরু প্লাক-করা, বগল-কামানো, নাভি-দেখানো বিস্তর সাঁটুলি থেকে, ডিশ-অ্যান্টেনা, চাইনিজ রেস্তোরাঁ সবই পাবে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, কাছারি সবই আছে। শ্রীনগর থেকে যেমন রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়া যায়, তেমনই আবার যাওয়া যায় পউরি।

পউরি মানে কি?

পউরি মানে পদচিহ্ন। হরিদ্বারকে "হর কি পউরি"ও বলে। জানেন না?

আমি আর কী জানি বলো। সাহেবরা অবশ্য বলতেন পাউরি। তা, পউরিতে কার পদচিহ্ন?

তা আমি বলতে পারব না।

জিম করবেট-এর লেখাতে পউরির কথা পড়েছি বটে। ডিভিশনাল কমিশনার মিস্টার ইব্বটসন-এর হেডকোয়ার্টার ছিল এখানে। জিম করবেট সাহেবের খুব বন্ধু ছিলেন ইব্বটসন আর তাঁর স্ত্রী জীন ইব্বটসন।

তাই? হবে হয়তো।

পাটন বলল। জিম করবেট-এর বই আমি পড়িনি।

বলেই বলল, এই যে। তিরলোকনাথের দোকান। এমন পুরী-হালুয়া আলুর চোকা আপনি ভূ-ভারতে পাবেন না। আর রাবড়ি যা করে না। কোথায় লাগে চন্দ্রবদনী। যাই বলুন আর তাই বলুন চারণদা, চন্দ্রবদনীকে দেখার পর থেকে আমার স্তন্যপায়ীবাবা হবার ভারী সাধ জেগেছে মনে।

তুমি একটি বর্বর জানোয়ার।

চারণ স্তম্ভিত হয়ে বলল।

জানোয়ারের ছেলে, অন্যরকম হই কি করে। তবে আমার বাবার খাদ্য বলুন, পানীয় বলুন, সবই হচ্ছে কারেন্সি নোট। আমার খাদ্য-পানীয়তে ভ্যারাইটি আছে। তাছাড়া আমি জানি যে, আমি Beast। এবং Beast-দেরই তো চিরদিন Beauty-রা পছন্দ করে এসেছে। থাক পড়ে আমার ভোলানন্দ, থাক পড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা, আমি ওই দেবীটি পেলেই মোক্ষ লাভ করব। অবশ্যই করব।

দুধ পায় কোথা থেকে?

চারণ বলল।

আঁজ্ঞে?

চমকে উঠে বলল পাটন।

ভাল রাবড়ি যে করে, দুধ পায় কোথা থেকে?

কী অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। সত্যি! আপনি না… :

তারপর বলল, সবই জুটে যায়। আপনার মতন কালো কোট-পরা নম্বরী পাপী এসে জুটতে পারলেন এখানে আর দেবভূমিতে গোমাতার দুধ পাওয়া যাবে না!

ঠাট্টার স্বরে বলল পাটন। তারপরে দোকানের মস্ত বড় কাঠের উনুনের সামনের কাঠের বেঞ্চে বসল অন্য আরও অনেকের গা ঘেঁষে।

জয় বদ্রীবিশালজিকি।

পাটন বলল।

জয় বদ্রীবিশালজিকি।

www.MurchOna.com

হালুইকর তিরলোকনাথ বলল।

রোগা টিঙটিঙে চেহারা তিরলোকনাথের। তবে খুব লম্বা। মাথায় সিঁদুরের টিপ, কপালের নীচের ভাগে চন্দন, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদের মতন পাথালি করে লেপা।

চারণের অর্ডার অনুযায়ী গরম গরম পুরী আর হালুয়া দিতে বলল ওদেরকে। অল্পবয়সী যে দুটি ছেলে খিদমদগারী করছিল তাদেরই একজন স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে করে খাবার এগিয়ে দিল।

খিদেও পেয়েছিল। সকালে আশ্রমে দুটি হাতে-গড়া রুটি আর আলুর চোকা খেয়েছিল। পাটন আটা মেখেছিল, চারণ আর জুগনু সেই রুটি সেঁকেছিল আর আলুর চোকা বানিয়েছিল।

এই জুগনুও আশ্রমেই থাকে। বারো-তেরো বছরের ছেলে। শ্যামানন্দজি হরিদ্বার থেকে মরে-যাওয়া ভিখিরি-মায়ের সন্তানকে তুলে এনেছিলেন দুবছর বয়সে। জুগনু Errand Boy-এর কাজ করে কিন্তু কোনও মাইনে নেয় না। দেবেই বা কে? সকলের সঙ্গে সেও প্রাণায়ম করে, সকাল-সন্ধেতে ভজন গায়। তার মুখে সবসময়ে হাসি লেগেই থাকে। কোনওরকম দুঃখ, জামাকাপড়ের, খাওয়া-দাওয়ার, তার যে আদৌ আছে, তা মনে হয় না। এই জমিতে, ভোলানন্দ প্রেমানন্দদের সান্নিধ্যে থাকলে কোনওওরকম দুঃখবোধই সম্ভবত জন্মায় না। আর থেকে থাকলেও, মরে যায়।

পাটনের পাশে, সেই দীপাবলীর রাতের দেবপ্রয়াগের তিরলোকনাথের দোকানে কাঠের আগুনের সামনে বিবর্ণ, কাঁটা-ওঠা বেঞ্চে বসে পুরী-হালুয়া খেতে খেতে চারণ ভাবছিল যে, এখন কলকাতাতে তার বাড়ি দিওয়ালির ডালিতে ডালিতে ভরে গেছে। স্কচ-হুইস্কি, ফ্রেঞ্চ-ওয়াইন, নানারকম শুকনো ফল, মেওয়া, বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের অ্যাশ-ট্রে, ক্যাসারোল, ফ্লাস্ক, আইস-বাকেট আরও কত কী! প্রফুল্ল, বীরেন, আর রাম সিং হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে জবাবদিহি করতে করতে। পুলিশও জেরা করে থাকতে পারে। তবে ওদের মাইনে পত্তর ইত্যাদি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। অফিসে গোপালকে বেয়ারার চেক দিয়ে এসেছে। এক বছর না ফিরলেও কারওই অসুবিধা তো নেইই বরং মজাই হবে।

হু-হু করে হাওয়া আসছে নীচের গিরিখাত থেকে। না কি উত্তরের বরফ ঢাকা সারসার শৃঙ্গগুলি থেকে? কে জানে! এই পরিবেশে, এমন দোকানে চারণ চ্যাটার্জিকে কোনওও মক্কেল, উকিল বা হাকিম হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললে হয়তো হার্ট-অ্যাটাকেই ফওত হয়ে যাবেন। নিছক SHOCK-এই।

ভাবছিল ও, মানুষ ইচ্ছে করলে কত সহজে নিজের অনুষঙ্গ, পরিবেশ এবং প্রতিবেশকে বদলাতে পারে!

পরমুহূর্তেই ভাবল, ও কি করতে এসেছে এখানে? হৃষীকেশে বেশ কদিন কাটিয়ে দিল। এখন এসেছে দেবপ্রয়াগে। পাটনের গাধাবোট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর চন্দ্রবদনী। এক নতুন ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে।

আশ্চর্য! গর্ডন আর স্টিভেন্স কিন্তু সেই যে গর্তে ঢুকেছে আর বেরোবার নামটিও নেই।

চারণ বলল, পাটনকে।

ওরা তো কনডেন্সড-কোর্স করতে এসেছে। আপনার তাড়াটা কিসের? হাতে অনন্ত সময়। সব কিছুই শনৈ শনৈ হবে। তবে এখানে আপনি আর বেশি থাকুন তা আমার ইচ্ছে নয় চারণদা।

কেন?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

কেন?

কেন আবার? চন্দ্রবদনী।

চন্দ্রবদনী তোমার চেয়ে বয়সে বড়ও হতে পারে। বেশি ইয়ার্কি কোরও না। চারণ বলল।

হাঃ। এখন তো নিজের চেয়ে বড় মেয়ে বিয়ে করাটাই VOGUE। গরু-মোষ কুকুর-মেকুরের মধ্যে তো এই সিসটেম সৃষ্টির আদি থেকেই চালু আছে। মানুষই বা পেছিয়ে থাকবে কেন?

www.MurchOna.com

তাই ?

ইয়েস স্যার। আপনি মানে মানে অন্যত্র কাটুন।

তাই যাব ভাবছি।

প্লেটটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল ও।

চায়ে নেহি পিজিয়েগা বাবু ?

জরুর। দো চায়ে। এক মে শক্কর আর মালাই কমতি দেনা।

পাটন বলল।

মালাইমেহিতো চায়েকা পাত্তি উবালতা হ্যায়।

ও হো। ভুল গ্যয়া থা। ঠিক হ্যায়।

কোথায় যাবেন ভাবছেন ?

ঘুরব। একা একা না ঘুরলে এসব হয় না। তুমি আমার সঙ্গ ছাড়ো।

আমি ? হাঃ। আপনিই তো এঁটুলির মতন আমার পেছু পেছু উঠে এলেন এখানে হৃষীকেশ থেকে।

সে তো ভোঁদাইবাবা, থুড়ি, ভোলানন্দ বাবার জন্যে।

এসেছেন যখন তখন দিনকতক থাকুন। চোখ দুটি শুধু চন্দ্রবদনীর দিকে না ধায়। নইলে এখানে থাকলে আমার আপত্তি কি ? সমুদ্র এত স্বল্পসময়ে কি পুরনো হয় চারণদা ? তীর থেকে ঢেউগুলোকে একইরকম লাগে বটে, দূরের সমুদ্রকে মনে হয় সবুজ, নীল, খয়েরি, কালো সমতল মাঠ। কিন্তু আসলে তো তা নয় ! থাকুন। আপশোষ করবেন না। আপনি গভীর মানুষ, আমার চেয়ে পড়াশোনা এবং অধীত-বিদ্যে হজম করার ক্ষমতা বেশি। আপনার মতন, স্টিভেন্স আর গর্ডনের মতন মানুষদেরই তো দরকার ভোলানন্দজির। আমি তো একটা মর্কট। Total Waster in all Spheres of Life! যার বাপই বেঠিক তার সবই বেঠিক।

চারণ চুপ করে রইল।

দেব-দেবী, ধর্ম, শাস্ত্রর কথা ও জানে না বটে কিন্তু নিজের এই বিশাল দেশের প্রাচীনত্ব, কোটি-কোটি মানুষে অবশ্যই কোনও কিছুর টানে যে হাজার হাজার বছর থেকে এই দেবভূমিতে আসে, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল ও। এক ধরনের ভারতীয়ত্বে সম্পৃক্ত হচ্ছিল চারণ খুব ধীরে ধীরে, উগ্র বিড়ির গন্ধে, দিশি, হাতে-বোনা কম্বলের বোঁটকা গন্ধে, এই দুধের মধ্যে সেদ্ধ করা চায়ের পাতার চা-এর মধ্যে, এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে, ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, ধূপধুনোর গন্ধের মধ্যে, গাঁজার ধোঁয়ার মধ্যে। কলকাতাতে ও ইংল্যান্ডে পড়াশুনো করার সময়ে এবং কলকাতা ও বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করার সময়ে এই সাধারণ, গরীব, গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী, জাগতিক কামনা ও লোভহীন, ঐতিহ্যপূর্ণ আসল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। 'দেশমাতৃকা' শব্দটা বঙ্কিমচন্দ্রর লেখাতে পড়েছিল। "দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই" একথা পড়েছিল বিবেকানন্দর লেখাতে। "দেশপ্রেম" কাকে বলে তা নেহরু বা জিন্নার চেয়েও অনেক বড় ভারতপ্রেমী জিম করবেট-এর "My India"-র মুখবন্ধ পড়ে জেনেছিল।

এই ভারতবর্ষকে চারণ জানতেও পারত না হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এই দেবভূমিতে এসে উপস্থিত না হলে। পাটনের পাশে গায়ে গা লাগিয়ে শীতের মধ্যে বসে ওর মন হঠাৎই এক তীব্র দুঃখমিশ্রিত সুখে ছেয়ে গেল।

তিরলোকনাথের দোকানে একটি ছবি ছিল মহাদেবের। যেমন ছবি সর্বত্রই দেখা যায়। মাথাতে সাপ জড়ানো, হাতে ত্রিশূল। মাথার পেছনে একটি "ওঁ" চিহ্ন। এই ওঁ চিহ্নটি প্রায় সব ধর্মস্থানেই দেখেছে চারণ। অনেককে চিঠি লেখবার সময়েও চিঠির উপরে "ওঁ" লিখতে দেখেছে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের খুব ভক্ত চারণ। তাঁর 'পার্থিব' উপন্যাস পড়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিল ও। তার উত্তরে পোস্টকার্ডে ছোট্ট উত্তর দিয়েছিলেন সাহিত্যিক। সেই চিঠির উপরে উনি লিখেছিলেন "রা"। "ওঁ" এরই মতন। "রা" মানেই বা কি, তা কে জানে ?

www.MurchOna.com

পাটনকে শুধোল চারণ, "ওঁ"-এর মানে জানো ?

জানতাম না। ভোলানন্দজির কাছ থেকেই জেনেছি। শ্যামানন্দজি বলেছিলেন যে এই "ওঁ"-কেই দার্শনিক কার্লাইল নাকি বলেছিলেন : "The Everlasting Yeah" —মানে 'হ্যাঁ'। অনন্তকালের হ্যাঁ। একটা মস্ত হ্যাঁ।

ওঁ মানে, হ্যাঁ ?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল চারণ।

ইয়েস। হ্যাঁ। পরে কখনও ভাল করে শুনে নেবেন ভোলানন্দজি বা শ্যামানন্দজির কাছ থেকে। গর্ডন আর স্টিভেন্সও শিখে গেছে ওঁ-এর মানে। ওরাও আপনারই মতন একদিন এই প্রশ্ন করেছিল আমাকে। আমি আর কতটুকু জানি বলুন ? ওদের ইনকুইজিটিভনেস-এর জন্যেই এই প্রশ্নের উত্তর ওদেরই সঙ্গে আমিও পেয়ে গেছিলাম।

তারপর বলল, একটা কথা মনে প্রায়ই হয়। জানেন, চারণদা।

কি ?

শিক্ষা আর ইকুইজিটিভনেস বোধহয় সমার্থক। যে-মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত তার জিজ্ঞাসার কোনও শেষ নেই। আর যার কোনও জিজ্ঞাসাই নেই, সে সর্বার্থেই অশিক্ষিত। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

তা উত্তর পেলে কার কাছ থেকে ?

মোটার কাছ থেকেই।

মোটা মানে ?

আঃ ! কতবার যে বলব আপনাকে ! মোটা মানে ভোলা ইজ ইকুয়াল টু ভোলানন্দজি।

চারণ, পাটনের এই অকারণের বাঁদরামিতে চুপ করে রইল।

সিনিবালি দিওয়ালির হইচই শেষ হয়ে গেছে এই দেবভূমি দেবপ্রয়াগে। আবার সেই শান্ত নির্লিপ্ত জীবন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দুপাশ থেকে কিছু বাস, ট্রাক এবং গাড়ি যাতায়াত করে। আর্মির কনভয়ও যায়-আসে মাঝে মাঝে। কনভয়-এর সামনের গাড়িতে লাল আর পেছনের শেষ গাড়িতে সবুজ পতাকা লাগানো থাকে।

এখন শেষ বিকেল। এই সময়টাতেই এই সব জায়গাতে মন বড্ড বিধুর হয়ে ওঠে। দিনান্তবেলায় নানারকম পাখি ডাকে নীচের নদীর পাশের পর্বত-গাত্র থেকে। তাড় বা তোন গাছের পাতাগুলিও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মাথা উঁচিয়ে থাকে অন্য গাছেদের মাথার উপরে। কতরকম গাছ যে আছে এখানে ! তার সামান্যই চেনে চারণ। এই দিকের পর্বতমালার বেশিটাই রুক্ষ ও ন্যাড়া। জঙ্গল গভীর, পর্বতের পাদদেশে।

চুপ করে বসেছিল চারণ অলকানন্দার এপারে পশ্চিমের পাড় আর আকাশে চেয়ে। জোড়াসনে বা শবাসনে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেও মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। প্রাণায়াম করলে যেমন আসে। এসব একটু একটু করে শিখছে চারণ।

বেশ কদিন হল, এক বেলাই খাচ্ছে আশ্রমের অন্যদেরই মতন। একচড়া। আশ্চর্য। সারাদিনে ওই খাওয়াটুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে হয় এখন। গেরুয়া পরে না অবশ্য। পরলে, 'ভেক ধরেছে' বলে মনে হতে পারত হয়তো নিজেরই কাছে। অন্যের কাছে তো অবশ্যই। এখনও সাদাই পরে। ধুতি। তবে, পরে হয়তো পরবে কখনও গেরুয়া।

www.MurchOna.com

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে।

পাটন বলেছিল, যদি মিলিটারিতে জয়েন করতেন তবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে থাকলে কি আপনার কাজের সুবিধা হত ? না, আপনাকে তা পরতে দেওয়া হত ? রেজিমেন্টাশেন-এর দরকার আছে চারণদা।

চারণ বলল, আর তুমি যে এই পরিবেশে, এই আশ্রমে দিব্যি জিনস পরেই চালিয়ে যাচ্ছ। সে বেলা কি ?

আমি তো সন্নিসীগিরির অ্যাপ্রেনটিসশিপ নিইনি।

তুমি তাহলে কি ? শাখামৃগ ? রিয়্যাল মর্কট ? ভোলানন্দজি ঠিকই বলেন। এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ে দোল খাচ্ছ।

চোখ নাচিয়ে পাটন বলল, খাব খাব। আমার আসল গাছে গিয়ে উঠি আগে। একটু সবুর করুন।

আলো ক্রমশই কমে আসছে। ঠাণ্ডাটাও বাড়ছে। দিনের বেলা একটা জোর হাওয়া সমতল থেকে পাহাড়ে উঠে আসে নদীর পথের বিপরীতে, আর রাত নামলে পাহাড় থেকে কনকনে হাওয়া নদীখাত ধরে বয়ে যায় সমতলের দিকে। হৃষীকেশ বা হরিদ্বারে বছরের এই সময়ে সেই হাওয়ার স্বরূপ খুবই বোঝা যায়।

মাথার বাঁদুরে টুপিটা টেনে দিল চারণ নীচে, কান ঢেকে। প্রহরে প্রহরে শীত বাড়বে এখন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চারণের আবারও হঠাৎই মনে হল কি করছে ও এখানে বসে ? সাধু-সন্তদের অনুকরণ করে কি পাবে ও ? অনুকরণ করে জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কেউই কি কিছু পায় ? কিসের জন্যে এসেছে ও এখানে ? কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য যদি নাই থাকে, তাহলে তা সাধন হবেই বা কী করে।

গতকালই গর্ডন আর স্টিভেন্স-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছিল ও। ওরা বলছিল, উদ্দেশ্যহীনতাই নাকি ওদের এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য। কোনও উদ্দেশ্যর হাত ধরেই ওরা বাঁচতে চায় না। "উদ্দেশ্য" ব্যাপারটার মধ্যেই একধরনের স্বার্থপরায়ণতার গন্ধ জড়ানো থাকে। সব পশ্চিমী দেশেই শিশুকাল থেকেই প্রতিটি মানুষই তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপই এক বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত করে। এবং সেই সব উদ্দেশ্যর মধ্যে প্রধানত হচ্ছে অর্থোপার্জন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অর্থবান, আরও অর্থবান হওয়া। মিলিয়নিয়র থেকে বিলিয়নিয়র, বিলিয়নিয়র থেকে ট্রিলিয়নিয়র। একমাত্র উদ্দেশ্যই এই, জীবনের, To Get Rich. By Hook or By Crook! অর্থই ইউনাইটেড স্টেটস এবং তার প্রভাবে প্রভাবিত সব দেশেই সমস্ত উদ্দেশ্যর শেষ উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যকে ধাওয়া করে করে ওরা ক্লান্ত। সত্যি সত্যিই ক্লান্ত।

গর্ডন বলেছিল, তাইতো তোমাদের দেশে এসেছি অতদূর থেকে। আমরা নিজেরা পুরোপুরি নিরুদ্দেশ হয়ে উদ্দেশ্যহীনতার মজাতেই চিরদিনের মতন মজতে এসেছি। আর তুমি এই মহান, প্রাচীন এক দেশের নাগরিক হয়েও তোমার নিজের দেশের ঐতিহ্যে গৌরব বোধ করো না ? নিজেদের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় সম্বন্ধে তুমি নিজেই অবহিত নও ? ভারী আশ্চর্য তো।

চারণ লজ্জা পেয়েছিল।

স্টিভেন্স বলেছিল, মক্কেলের হয়ে ওকালতি তো অনেকেই করলে জীবনের অর্ধেকের চেয়েও বেশি সময়। এবারে নিজের জন্যে কিছু ওকালতি করো উপরওয়ালার কাছে। এই ওকালতির ফিস মোহরে গণ্য নয়। গণ্য, মনের শান্তি আর অর্থ-বাসনাহীন আনন্দে। যা, আসল সুখ। নইলে আমরা সবই ছেড়েছুড়ে এলাম কী করে। আর চলে এলামই শুধু নয় ! এসে, সর্বক্ষণ এত আনন্দেই বা থাকি কেন ?

বিদেশিদের কাছে এই 'জ্ঞান' নিতে ভাল লাগেনি চারণের। কিন্তু নিয়েছিল। নিতে হয়েছিল। কারণ, এ কথা তো সত্যিই যে ওরা সবই ছেড়ে এসেছে। রাজ্য-পাট, চোখ-ঝলসানো সাচ্ছল্য। চারণের মতন দুনৌকোতে পা তো নেই ওদের ! গর্ডন এসেছে তিনবছর। পাটনেরই মতন। আর

www.MurchOna.com

স্টিভেন্স এসেছে আড়াই বছর।

নির্জনে একা থাকা, একা ভাবা, এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনাতে আদৌ তাড়াহুড়ো না করে পর্বতারোহীদের মতন একের পর এক পায়ের পরে পা ফেলে ভাবনা-চিন্তার পাহাড়চুড়োর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে এক গভীর জাগতিক-লাভ-শূন্য প্রশান্তি যে আছেই, তা এই কদিনেই বেশ বুঝতে পেরেছে চারণ। যে-পর্বতারোহী পর্বত শৃঙ্গে ওঠেন তিনি সমতলে দাঁড়িয়ে একবার শৃঙ্গের দিকে তাকালে কোনওদিন সেখানে আদৌ পৌঁছতে পারতেন না। অসাধ্য-সাধন তাঁর দ্বারা কোনওদিনও হবে না ভেবে হতোদ্যম হয়ে যেতেন। তা তো নয়। যিনি পর্বতারোহী, তিনি শুধুই দেখেন পরের পদক্ষেপটি কোথায় করবেন।

গতকাল সকালে অবাক করেছিল পাটন, চারণকে। চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেবপ্রয়াগের কার বাড়ি থেকে যোগাড় করেছিল তা বলতে পারবে না, কিন্তু ছেঁড়াখোঁড়া প্রায় ভূর্জপত্রের মতন অবস্থা হয়ে যাওয়া একটি বই এনে ওকে দিয়েছিল।

এটা কি বই ?

পাটন হেসে বলেছিল, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের। উপনিষদের উপরে লেখা আছে এতে। আপনার "ওঁ"-এর উত্তরও পাবেন।

এখানে এই বই কোথায় পেলে তুমি ?

সবখানেই সব কিছু পাওয়া যায় চারণদা, যদি তেমন করে চাওয়া যায়।

বলেই বলল, আপনি তেমন করে চাইলেন না বলেই চন্দ্রবদনীকে পেতে পেতেও পেলেন না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, বেড়ালের ভাগ্যেই হয়তো শিকে ছিঁড়বে।

তাই ?

পাটন চারণের ভাবনা ছিঁড়েখুঁড়ে হঠাৎই গেয়ে উঠল

"বড়লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল
এমন মাথা বেন্ধে দেব লাল গেন্দা ফুল।"

পাটনের এই হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠা দেখে খুশি হয়েছিল চারণ। কিন্তু ওর মনে সেই খুশির রং পুরোপুরি লাগার আগেই পাটন আবারও গেয়ে উঠেছিল :

"ও রাঙা বাবুরে শিমুল ফুলে রঙ লেগেচে
সত্যি কথা বলতে কি তুকে আমার মইনে ধইরেচে
তুকে আমার মইনে ধইরেচে।"

এ আবার কি ?

আরে আমার সম্পর্কে চন্দ্রবদনীর মনের কথাটা যদি এইরকম হত তাহলে বুঝতাম কেসটা পেকেছে। কিন্তু এখনও বহুত বাঁও পানি। আমার পেরেমের শিমুল গাছে ফুল ফুটতে এখনও বহুতই দেরি। তোমরা আমার কাঁচা পিরীত পাকতে দেবে কি না তাই বা কে জানে!

চারণ হেসেছিল। তারপর বলেছিল, এই সব গান শিখলে কোথায় ?

আঃ। আপনি যে দেখি কোনও খোঁজই রাখেন না। স্বপ্না চক্রবর্তীর গান। ক্যাসেট শোনেননি ? দারুণ করেন, এইসব গান, মহিলা।

নাঃ।

গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিল চারণ।

জীবনটা বড় ছোট। ভুল পথে ঘোরাঘুরি করেই যে জীবনের অনেকখানিই নষ্ট করে ফেলেছে। বুঝতে পারে। প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারে।

সকালে এত ঠাণ্ডা থাকে যে এখনও সূর্যোদয়ের আগে ওঠা রপ্ত করতে পারেনি ও। ভোলানন্দজির এই ছোট্ট আশ্রমে জেসুইট ব্রাদারদের ডর্মিটরির বা মসজিদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নেই। সকালের 'প্রেয়ারে' বা ফজিরের আজান-এ সকলকেই সামিল হতে হয় না। মঠ বা বড়

www.MurchOna.com

আশ্রমে হয়তো নানা রেজিমেন্টেশান আছে। কিন্তু এখান কারওই রক্তচক্ষু বা খবরদারী নেই। পড়াশুনো, ভাবনাচিন্তা, লেখালেখি যা করার এদের মধ্যে অনেকেই তা করেন গভীর রাত অবধি। ধুনি বা লণ্ঠনের বা প্রদীপের আলোতেই। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ভোরে-ওঠার অভ্যেস হয়ে যাবে হয়তো ওরও। সকলেই যখন ওঠে তখন ওই বা পারবে না কেন ?

ওই ঠাণ্ডাতেও অনেক নীচের নদীতীরে কুয়াশার মধ্যে অগণ্য সুঠাম খালি-গা মানুষের মূর্তি নদীর দুদিকের ঘাটেই দেখতে পায়। কুয়াশারই সঙ্গে তাদের মুখনিঃসৃত গরম বাষ্প মিশে যায়। উষাকালে উপরের দেবপ্রয়াগ এবং সংলগ্ন এলাকার প্রতিটি মন্দিরেই ঘণ্টা বাজে। সূর্যস্তবে গমগম করে খরস্রোতা, প্রভাতগন্ধী নদীতীর। সদ্যস্নাতা, যোগীদের, নারীদের শরীরের গন্ধ ওঠে।

সূর্যপ্রণামের সেই মন্ত্র, খরস্রোতা অতল নদীর স্রোতের শব্দে মিশে গিয়ে, বাহিত হয়ে, দেবভূমি থেকে সমতলের নানা তীর্থক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়ে যায়।

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বন্তারিংসর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং।"

কেউ-বা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন :

"আদিত্যায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহি তন্ন সর্যঃ প্রচোদয়াৎ।"

এই ভারতবর্ষ !! ভারতবর্ষের এই আশ্চর্য, শাশ্বত, উদাত্ত রূপ সম্বন্ধে চারণের আগে কোনও ধারণাই ছিল না।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। শিলাসন ছেড়ে উঠে পড়ল চারণ। নির্জনতার এক আশ্চর্য নিজস্ব আচ্ছন্নতা আছে। প্রকৃতির বুকের কোরক থেকে সেই নির্জনতা যে-কোনও মানুষেরই বুকের মধ্যে উঠে আসে।

এবারে আশ্রমের দিকে ফিরবে, না কি দেবপ্রয়াগ বাজারের দিকেই যাবে ঠিক করতে পারল না। পথ চলতে চলতে ভাবছিল যে, জীর্ণ বইটি দিয়েছিল পাটন, সেইটিই বরং আজ পড়বে ফিরে গিয়ে।

ভোলানন্দজির আশ্রমের আরও কিছুটা উপরে একটি ছোট্ট গুহা আছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানেই থাকেন ভোলানন্দজি, যখন মৌনী থাকেন, একেবারে একা। এখন উনি মৌনী।

কিছু খাবেনও না। জল খাবেন শুধু এবং একটু দুধ। আশ্রমেরই কেউ গিয়ে খাইয়ে আসবেন। পাটনও যায় কখনও কখনও।

শ্যামানন্দজি হৃষীকেশে গেছেন শিবানন্দগিরি মহারাজের আশ্রমে কোনও কাজে। বই-টই-এর জন্যেও হতেও পারে। গর্ডন গেছে মুনিকা-রেতিতে, হৃষীকেশ-এর একটু আগে। ওর দেশ থেকে এক বান্ধবী এসেছে নাকি। তারই সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তাই আজ গুহাতে স্টিভেন্স আর চারণ বলতে গেলে একাই। কে যে কখন কোথায় থাকে, অন্যে জানে না। কোনও হাজিরা খাতা নেই এখানে, কাজের দিন, ছুটির দিন নেই, দেরি করে অফিসে পৌঁছলে লেট মার্ক দেওয়া হয় না। ক্যাজুয়াল-লিভ, সিক-লিভ, বাৎসরিক ছুটি, কিছুই নেই। রোজই ছুটির দিন, রোজই কাজের দিন। অন্যদের কারও সম্বন্ধেই অবশ্য ওর তেমন উৎসাহ নেই। আর ওর প্রতি তো কারও উৎসাহ নেই-ই। তবে সাম্প্রতিক অতীতে চন্দ্রবদনী সম্বন্ধে ওর উৎসাহটা অত্যন্তই তীব্র হয়েছিল। হয়েছিল যে, সে কথা পাটন বুঝতে পেরেছিল এবং পেরেছিল বলেই যখন তখন চন্দ্রবদনীর প্রসঙ্গ ওঠাত ও চারণকে একা পেলেই।

যেই চানে যায় নদীতে, সেই জল বয়ে আনে। কেউ ঘড়াতে, কেউ বা বড় ঘটিতে, কেউ কমণ্ডুলুতে। এক ঘড়া, খাবার জন্যে আনে কেউ, আচমনের জন্যে আনে অন্য কেউ। হাত মুখ পা ধুয়ে, গুহার ভিতরে ঢুকে ওর গুটিয়ে-রাখা কম্বল-শয্যাখানি খুলে, তার উপরে বসে, ঝোলা থেকে সেই বইটি বের করল চারণ। স্টিভেন্স বাঁদিকে কাত হয়ে শুয়ে হেনরি ডেভিড থোরোর Walden পড়ছিল। তার শরীরের ছায়া পড়েছিল গুহার দেওয়ালে। প্রদীপের আলোর বিপরীতে। বাঁকানো কনুইয়ের ছায়াটিকে মনে হচ্ছিল একটি বাঁকানো ধনুক যেন।

চারণকে আসতে দেখেই ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে 'থাম্বস আপ' করল স্টিভেন্স।

www.MurchOna.com

তারপর আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

স্টেটস-এ যখন প্রথমবার যায় চারণ, সেবারে ইস্টকোস্ট-এর বস্টন থেকে হীরকদার সঙ্গে গেছিল "Walden Pool" দেখতে। কী যে রাগ হয়েছিল দেখে! হেনরি ডেভিড থোরোর "Walden" শেষ কৈশোরে পড়ে, মনের মধ্যে যে ছবিটিকে লালিত-পালিত করে রেখেছিল, সেই ছবিটি শুধু নড়ে-চড়েই যায়নি, ছিন্নভিন্নও হয়ে গেছিল। সেই মুহূর্তেই ইউনাইটেড স্টেটস-এর মানুষদের আত্মিক এবং নান্দনিক অবক্ষয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল ওর। সেই ধারণা, পরে দৃঢ়তর হয়েছে নানা ধরনের কিছু এন আর আই-দের দেখে। মনে হয়েছে, কলকাতা চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে, কিছু খাঁচা খোলা থাকলে তাদের মধ্যে কারও কারওকে ভরে দেবে। শিক্ষা, সহবৎ বা সংস্কৃতির খামতি থাকাটা দুঃখজনক হতে পারে কিন্তু দোষের নয়। কিন্তু শূন্যপাত্রর টংটং আওয়াজ অসহ্য। গভীরতা ব্যাপারটা এই এন আর আইদের মধ্যের এক শ্রেণীকে ইমপোর্ট করার জন্যে অনুরোধ করা উচিত। ভারত থেকে ম্যানহোল কভার এবং কনডোম যদি ওঁর ইমপোর্ট করতে পারেন তাহলে গভীরতা নিতেই বা লজ্জা কিসের? তবে এন আর আইদের মধ্যে গর্ব করার মতন মানুষ কি নেই? অবশ্যই আছেন।

কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম।

একটি ভাল বই পড়ার আগে এন আর আই প্রসঙ্গ উঠিয়ে মনকে আবিল করে ফেলাতে খারাপ লাগল চারণের। মুখটাও যেন তেতো হয়ে গেল।

বইটা খুলল, "ঔপনিষদ ব্রহ্ম"। তারপর ডুবে গেল বইয়ের মধ্যে।

বইটি ছোটই। তবু বই পড়া যখন শেষ হল তখন রাত গভীর। কত যে গভীর তা জানে না। স্টিভেন্সও শুয়ে পড়েছে ততক্ষণে কম্বলের নীচে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াল চারণ।

এই পর্বতরাজিতে এক ধরনের ঝিঁ ঝিঁ আছে তারা দিনে ডাকে না। রাতেই ডাকে শুধু। তাদের 'ঝিনিঝিনি' শব্দ 'E' Sharp-এ মিলিয়ে-বাঁধা হাজার তানপুরার নিক্কনের শব্দর মতন বাজছে। যে-শব্দ দুকান ভরে দিয়ে মস্তিষ্ককেও অবশ করে ফেলে। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ। পাটন চিনিয়েছিল তারাদের। কিন্তু এরই মধ্যে ভুলে গেছে ও। বড় ভুলো হয়েছে আজকাল।

অলকানন্দার ওপারে হেমন্তের মধ্য-রাতের ঘুমন্ত দেবপ্রয়াগ। কোনও সাড়াশব্দ নেই, নীচের নদীর শব্দ ছাড়া। কত হাজার বছর ধরে দুপাশের পর্বতরাজিকে সাক্ষী রেখে যে তারা প্রবল গর্জনে বয়ে যাচ্ছে, তা কে জানে! ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গমের কাছ থেকে উচ্চগ্রামে শব্দ উঠছে। আর সেই রাতচরা হাওয়াটা বেগে ধেয়ে যাচ্ছে নদীর জলকে সাদা, দুরন্ত মেষপাল-এর মতন তাড়িয়ে নিয়ে।

ধিয়ানগিরি মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল, ভেড়ার কথা মনে হওয়ায়।

"ভেড়চাল"।

কে জানে কেমন আছেন ওঁরা।

ফিরে এসে, কম্বলের নীচে টানটান হয়ে শুয়ে যে বইটি এখুনি পড়ে শেষ করল, সেই বইটির কথাই ভাবছিল ও। রবীন্দ্রনাথ এতে উপনিষদ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ব্রহ্মকে জানা না হলে এই মানবজন্মই বৃথা।

'ঈশোপনিষদে' লেখা আছে:

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।"

মানে হচ্ছে, ঈশ্বরই এই জগৎকে লালন পালন করছেন, তাঁর দ্বারাই সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে আছে (কেন ভোলো? মনে কর তাঁরে।) তিনি যা দিয়েছেন, যা দেন, যা কিছু দিয়েছে, তাই ভোগ করো। পরের ধন লোভ করো না।

এই যে লোভ, অন্যের যা আছে আমারও তা চাই, যে-কোনও ভাবেই চাই, চুরি করে ডাকাতি

www.MurchOna.com

করে, টি এ বিল ইনফ্লেট করে, গরীব আত্মীয়র বাড়ি জমি বিক্রি করিয়ে দেওয়ার সময়েও আড়ালে দালালি নিয়ে, ঘুষ খেয়ে, স্মাগলিং করে, চুরি করে, জালিয়াতি করে পড়শী বা আত্মীয়র মতন বড়লোক হবার যে সাধনা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে সেই তাপ গ্রিন-হাউস এফেক্টের তাপের চেয়েও বেশি। এই সরল সত্যটি যদি নাই বুঝবে তবে আর গর্ডন এবং স্টিভেন্স সাচ্ছল্যের উচ্চতম সোপানে বসবাস করা সত্ত্বেও সেখান থেকে নেমে এই ভারতীয় দেবভূমিতে গঞ্জিকা-সেবী আধ-ন্যাংটো সন্নিসীদের আখড়াতে কেন দৌড়ে আসবে এত সমুদ্র পেরিয়ে ?

ভাবনা একই।

তরঙ্গ খেলে যায় ইথারের মতন।

সেই Wave-Length-এ যারা একীভূত করতে পারে নিজেদের, তারাই ভাগ্যবান।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তারপরই আসতে হয় "ওঁ"-এর কথাতে। "ওঁ" একটি ধ্বনিমাত্র। এর কোনও বিশেষ মানে নেই। "ওঁ" ব্রহ্মের ধারণাকে কোনও অংশেই সীমাবদ্ধ করে না। সাধনার মাধ্যমে আমরা ব্রহ্মকে যতদূর জেনেছি, যেমন করে পেয়েছি, এই "ওঁ" ধ্বনি তার সবটুকুই ব্যক্ত করে। কিন্তু ব্যক্ত করেও সেখানেই সেই প্রাপ্তির প্রকাশকে সীমিত করে না। সংগীতের স্বর যেমন গানের বাণীর মধ্যে এক অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে, তেমনি "ওঁ" ধ্বনি তার পরিপূর্ণ মাহাত্ম্যে ব্রহ্মধ্যান বা ধারণার মধ্যে এক অনির্বচনীয়তার অবতারণা করে। "বাহ্য প্রতিমা" দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে খর্ব ও আবদ্ধ করে। কিন্তু এই "ওঁ" ধ্বনি মানুষের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করে দেয়। হয়তো সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন 'ওমিতি ব্রহ্ম'। 'ওম' শব্দ তো ব্রহ্মকেই বোঝায়। "ওমিদীতং সর্বং", এসব যা কিছু সমস্তই ওঁ। এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে আমরা 'হ্যাঁ' বা 'হাঁ' দিয়ে যা বোঝাই।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে 'ওঁ' ধ্বনিটি ব্রহ্মকে নির্দেশ করে কিন্তু 'ওঁ' শব্দের অর্থও তো আছে একটি। আছে, কিন্তু সেই মানে এতই উদার ও বিস্তৃত যে, তা মনকে অসীম মুক্তি দান করে। "ওঁ" শব্দ অনুকূলতিবাচক। মানে, এটা কর এই আদেশ করলে আমরা যেমন বলি, হ্যাঁ, "ওঁ"-ও সেইরকমই হ্যাঁ। "ওঁ" স্বীকারোক্তিও।

সংস্কৃত 'শাশ্বত'-র তো ইংরেজি হয় না। Eternal বা অন্য কোনও ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়ে আমরা শাশ্বত বলতে যা বুঝি তাকে কখনই বোঝানো যায় না। কার্লাইল সাহেব everlasting yeah বলে 'ওঁ'কে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে ব্যাখ্যাটা রবীন্দ্রনাথের হয়তো মনঃপূত হয়েছিল, কিন্তু চারণের হয়নি। সব ভাষাতেই এমন এমন বহু শব্দ থাকে তার সমার্থক কোনও শব্দই অন্যভাষাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমরা কে কাকে স্বীকার করি তারই উপরে আমাদের একেকজনের আত্মার মহত্ত্ব। কেউ জগতের মধ্যে একমাত্র বিত্তকেই স্বীকার করি, কেউ বা মানকে, কেউ বা আবার করি, খ্যাতিকে, ফলকে।

আদিম আর্যরা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে "ওঁ" বলে স্বীকার করতেন। তাই সেই সব দেবতার অস্তিত্বই তাঁদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হত। উপনিষদের ঋষিদের মতে, জগতে ও জগতের বাইরে ব্রহ্মই একমাত্র "ওঁ"। তিনিই চিরন্তন "হ্যাঁ। তিনিই 'everlasting yeah'।"

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোনও প্রতিমা ছিল না। কোনও প্রতীক অথবা চিহ্নও ছিল না। শুধু ছিল এই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত অথবা দিগ্বিদিক মন্ত্রিত করা ধ্বনি, "ওঁ"। এই ধ্বনির সাহায্যেই ঋষিরা তাঁদের "উপাসনানিশিত" আত্মাকে জ্যা-মুক্ত একাগ্রগামী তীরের মতন ব্রহ্মের মধ্যে পশিয়ে দিতেন। বিদ্ধ করতেন। নিমগ্ন করে দিতেন। এই ধ্বনির মাধ্যমেই ব্রহ্মবাদী সংসারীরা বিশ্বজগতের যা-কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের অনুক্ষণ এবং আদিগন্ত উপস্থিতি দিয়ে সমাবৃত করে রাখতেন।

"ওমিতি সামানি গায়ন্তি
ওমিতি ব্রহ্ম প্রসৌতি"

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মানে "ওঁ" উচ্চরণেই সমস্ত সামগান গীত হয়। "ওঁ"ই আনন্দধ্বনি।

"ওঁ" ধ্বনি আদেশবাচকও বটে। ঋত্বিক যখন আজ্ঞা প্রদান করেন, যখন দীক্ষা দেন, তখনও "ওঁ" উচ্চারণ করেই তা দেন। সমস্ত জগৎ-সংসারের উপরে, আমাদের সার্বিক ক্রিয়া-কাণ্ডর উপরে মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল এই "ওঁ" ধ্বনিই ধ্বনিত হয়ে আসছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করে গিয়ে যিনি সব সত্যের চরম এবং পরম, যিনি চিরকালীন, যিনি আমাদের মতন প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের ধ্রুবতারা, যিনি সর্ব আনন্দের পরমানন্দ, বোধের ভিতরকার বোধ, আমাদের মানব জীবনের সব ক্রিয়া-কর্মতে যিনি সমস্ত আদেশের পরমাদেশ, তিনিই "ওঁ"।

এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল চারণের। সেই প্রকৃতি-পাগল, অরণ্য ও ঈশ্বর-সাধক, অথচ সাধারণ গৃহী মানুষটির কথা। বিভূতিভূষণ, চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা দেবীকে (যিনি বিভূতিভূষণের আত্মীয়া হতেন) একটি চিঠিতে একসময়ে লিখেছিলেন,

"দেশে ফিরে এসেছি। ঘেঁটুফুল আর নেই। তবে পানকলম শেওলার সুগন্ধি কুচো কুচো সাদা ফুল ফুটেছে নদীজলে। আর শিরিষ ফুল ফুটেছে আমাদের আমবাগানের পেছনে। নক্ষত্রমালা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পুঞ্জে পুঞ্জে নব নবরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই কখনো ঘেঁটুফুলের শুভ্রদলে, কখনো কুঁচকাটার সোনালি ফুলে ঘরের পেছনে এসে ধরা দেন। নিতে পারলেই হল।

'তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

তিনি আছেন, তাই সব কিছু আছে, তাঁর আলোতেই জগৎ আলো।"

চারণ ভাবছিল, বিনোদবিহারী মুখার্জির কথারই অনুরণন তুলে যে, "আমাদের চেয়ে যাঁরা সবদিক দিয়েই বড় তাঁরা সকলেই ঈশ্বরকে জেনেছেন, ঈশ্বর এবং মঙ্গলকে এক করে উপলব্ধি করেছেন।"

চারণ ভাবছিল, একেই বোধহয় বলে, "সনযোগ"। দেবপ্রয়াগের বাজারে হালুইকর তিরলোকনাথের (ত্রিলোকনাথ) দোকানে পুরী হালুয়া খেতে খেতে যদি মহাদেবের ছবির সাপ জড়ানো মাথার উপরে 'ওঁ' চিহ্নটি দেখে পাটনকে প্রশ্ন না করত, তবে কত কীই না জানা থেকে বঞ্চিত হতো।

সেই নক্ষত্র-খচিত রাতে ক্ষীণকটি, লাজুক চাঁদও উঠল। যেন, শেষ রাতে দয়িতর সঙ্গে মিলিত হবে বলে অভিসারে বেরিয়েছে চুপিসারে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ শেষ রাতের দিকেই ওঠে। প্রতি রাতেই সে সন্ধ্যাকালের দিকে একটু একটু করে হেঁটে এগিয়ে আসে। এখন রাত কত কে জানে। চারণের হাতঘড়িটা পুঁটুলির মধ্যেই ভরা আছে। ঘড়ির দাসত্ব আর করে না ও। করবে না। সময়কে, উরুগুয়ের টুপামারো সন্ত্রাসবাদীদের মতন waylaid করে, সাবড়ে দিয়েছে সে। ঘড়ির নিজের মধ্যে, কোনও "নিজস্ব" দোষ নেই। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা আর সময়ের বিভাজন যদি শুধুমাত্র অর্থ, আর জাগতিক সাফল্য এবং আরও অর্থ একত্রিত করার সাধনাতেই নিয়োজিত হয়, তবে সেই নিয়ম বা সেই নিয়মে একনিষ্ঠ হবার প্রয়োজন কি আদৌ আছে?

মনে হয় না আর চারণের। এখন অবশ্যই মনে হয় না।

ভারী ভাল লাগছিল ওর ওই মধ্যরাতে একা দাঁড়িয়ে থাকতে কালের প্রহরীর মতন, নীচের অলকানন্দা আর গঙ্গার শব্দের মধ্যে তারা-ভরা আকাশ আর কিশোরী চাঁদের আলোতে সিঞ্চিত হয়ে, হু-হু করে বয়ে-যাওয়া সুগন্ধি, নির্মল কলুষহীন হিমেল হাওয়ার মধ্যে ওপারের দেবপ্রয়াগের মিটিমিটি প্রদীপের আলো আর নিভু নিভু ধুনির আগুনের দিকে চেয়ে।

এতদিন পরে, এতগুলো বছর ভুল করে, ভুল পথে চলে, ও যেন হঠাৎই শাশ্বত ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছে। হৃষীকেশে এসে ভাল তো করেছিলই কিন্তু মর্কট, শ্রীমান পাটন চন্দ্রর সঙ্গে দেখা না হলে তো এই ভোলানন্দজি বা শ্যামানন্দজিদের সংস্পর্শে আসতে পারত না। পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশালী "উন্নত" দেশের গর্ডন আর স্টিভেন্স-এর চোখ দিয়ে তো নিজের গরিব "অনুন্নত" দেশকে

www.MurchOna.com

দেখতে শিখত না ! ইউনাইটেড স্টেটস আর অন্য পশ্চিমী দেশ এবং তেলের দৌলতে হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে ওঠা মধ্যপ্রাচ্যর কোনও কোনও দেশের দুর্গন্ধ, অশিক্ষিত, গোঁড়া, ধর্মান্ধ, অনুদার কিছু অমানুষদের কাছে "উন্নতি" বলতে যা বোঝায় তা যে আদৌ "মানুষের উন্নতি" নয় এই কথাটা হয়তো সারাজীবনেও বুঝে উঠতে পারত না চারণ, যদি এই সাধু-সঙ্গে এখানে জীবনের বিকেল বেলাতে এসে না পৌঁছত। টাকা, আরও টাকার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যেও তো কম ভারতীয় গিয়ে জোটেনি। আশ্চর্য আমাদের এই চারিত্রিক দেউলেপনা।

সেই নিস্তব্ধ, প্রায় অলৌকিক এবং হয়তো আধিভৌতিক পরিবেশে দিগন্তব্যাপী রোমশ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের মতন, আকাশের কালপুরুষের মতন, লক্ষ বছর ধরে অতন্দ্র প্রহরাতে ঋজু দাঁড়িয়ে-থাকা নিথর শিবালিক পর্বতমালার দিকে চেয়ে হঠাৎই ওর দুচোখ ছলছল করে উঠল। এই দ্রবভাব, কোনওরকম ব্যক্তিগত আনন্দ-বিষাদের বোধশূন্য। কোনওরকম ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্য। ও যে ভারতবাসী, ও যে এই বিরাট, স্বরাট, মহিমাময় এক সুপ্রাচীন দেশের "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের" মানুষদের মধ্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে ওর শিকড়, জেনেছে যে, ও এই শাশ্বত ভারতের এক কীটাণুকীট।

এই বহুধা-বিস্তৃত গভীর দুঃখমিশ্রিত আনন্দেরই কারণে আজ রাতে সে এতখানি দ্রব হল।

ফিরে এসে, ওর প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে চারণও শুয়ে পড়ল। বাইরে গিয়ে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাতেই শীতের প্রকোপ বুঝতে পারল। ভাবছিল, এই হেমন্তেই এই, তো শীতের শেষে কি হবে ?

বাইরে ধুনির আগুনও নিভু নিভু হয়ে এসেছে। আশ্রমে যখন ফেরে চারণ, তখন জুগনুকে দেখেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে গুহার ভিতরে ঢোকার সময়েই লক্ষ করল যে জুগনু ধুনির দিকে পা দিয়ে গুহার দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে, গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে।

পাটন কোথায়, তা পাটনই জানে।

চরৈবেতি ! চরৈবেতি !

বাসটা ঘুরে ঘুরে নামছে নীচে। পাশে পাশে, অলকানন্দা।

পাটন যেমন বলেছিল, সত্যিই সেই রূপের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কতরকম যে গেরুয়া, কমলা, কোরা, সাদা, কালচে-সাদা আর কতরকম যে নীল-সবুজ তা বলার নয়।

পাটন বলল, দেখো চারণদা, এই শ্রীনগর উপত্যকা। সমান। শ্রীনগর পেরিয়ে গিয়ে আবার আমরা উপরে চড়ব। চড়ব, তো চড়বই।

তাই ?

চারণ অন্যমনস্ক স্বগতোক্তি করল।

হঠাৎ যে এমনি করে পাটনের লেজুড় হয়ে দেবপ্রয়াগ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে তা গতকাল রাতেও ভাবেনি একবারও। পাটন ঠিকই বলেছিল। বলেছিল, এখানে কিসের আঠা পেলে তুমি ?

বলেই, বলেছিল, আড়কাঠি দেখেছ কখনও ?

না।

না দেখলে, আঠার মহিমা বুঝবে কি করে ? থিতু, শুধু তারাই হতে পারে, যারা তপস্যাকারী, সত্যিকারের জ্ঞানপিয়াসী। যারা সাধক। তুমি আমি তা নই। আমাদের গোড়ালি জুড়িয়ে এলেই আবার চলা শুরু করে দেওয়া উচিত। থেমে পড়লেই সেই জায়গার স্থবির গাছ পাথর ফুল পোকা বা

www.MurchOna.com

ঘাস হয়ে যাবে।

তারপর বলল, জোনাথন লিভিংস্টোন এর সীগাল বইটা পড়েছ কি চারণদা ?

হুঁ।

চারণ বলল। তার মনে হল, এই প্রশ্ন পাটন যেন এর আগেও তাকে কখনও করেছিল।

পাটনের এই জ্ঞানভাণ্ডারের বহরে ক্রমশই বিস্মিত হতে হতে ছেলেটা সম্বন্ধে চারণের মনে দার্জিলিং-এর সূর্যাস্ত অথবা পুরীর সূর্যোদয়ের ফোটোর মতন ক্লিশে হয়ে-যাওয়া-ধারণা, যা ফ্রেম-বদ্ধ হয়ে গেছিল, তা ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত।

চারণ ভাবছিল, কোনও মানুষ সম্বন্ধেই কোনও পাকা ধারণা কখনওই করতে নেই। সব রংই ধুয়ে যেতে পারে। এক রং-এর আড়াল থেকে কখন যে অন্য রং-এর বেরিয়ে পড়ে, তা কে বলতে পারে।

নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হবে চারণদা, বুঝলে। যার পা আটকে গেছে জীবনের কাদাতে, নুড়িতে, ঘাসে, তার সাহসও ক্রমশই কমে আসতে থাকবে। চারপাশের পরিবেশ আর প্রতিবেশ এর সব বদ্ধতা ছিঁড়েছুঁড়ে উৎসারিত উৎক্ষিপ্ত হতে না পারলে তোমার মানুষ জন্মই বৃথা। বুঝেছ চারণদা। "ছিঁড়ে ফেল, ছেড়ে চলো" এই হওয়া উচিত প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর জীবনের মূল মন্ত্র। কয়েকদিন ধরেই আমি লক্ষ করছিলাম তোমার হাবভাব দেখে যে, তুমি যেন মোটার মোহজালে ধরা পড়ে গেছ। অথচ মোটা কিন্তু ধরতে চায় না কারওকেই। তার অজান্তেই তার ব্যক্তিত্ব অন্যকে অজগরের শীতল চোখের মতন আকর্ষণ করে। অজানিতেই অনেকে আটকে যায়। কিন্তু আমার ভোঁদাই বাবা আর অন্যান্য যাঁদের দেখো ওঁর চারপাশে তাঁরা সবাই সিদ্ধ পুরুষ। জর্ডন আর স্টিভেন্সও সিদ্ধ হবে বলে পণ করেছে। হোক গে তারা। তোমার বা আমার পক্ষে অত সহজে সিদ্ধি আসবে না। আমাদের পক্ষে আধ-সেদ্ধ থাকাই ভাল। হাফ-বয়েলড। হাফ-বয়েলড ডিমই বা খারাপ কিসে।

বলেই বলল, ইসস কতদিন হাফ-বয়েলড ডিম খাই না।

কেন ? একথা কেন বলছ ?

কি কথা ?

আমাদের পক্ষে আধ-সেদ্ধ থাকাই ভাল।

চারণদা, বলছি, কারণ, আমাদের ভোগ সম্পূর্ণ হয়নি বলে। আমরা রজনীশ আশ্রমে গিয়ে ভিড়লেও না হয় একটা কথা ছিল। 'ভোগের মধ্যে দিয়ে ত্যাগ' ব্যাপারটা বেশ মসৃণভাবে এসে যেত। ভোগী যে কখন ত্যাগীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় কোন পন্থাতে, তা উপরওয়ালাই জানেন। কিন্তু অনেকে বলেন সেটা একটা মান্য-পন্থা, নান্য-পন্থা না হলেও। কিন্তু এতরকম অপূর্ণ কামনা বাসনা নিয়ে ভোঁদাইবাবার পদতলে বেশিদিন পড়ে থাকলে কবে কোন স্নানরতা বা সিক্তবসনা যুবতীকে বলাৎকার করে এই পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করে নিজেও প্যাঁদানি খেয়ে অক্কা পেত। এইসব ভেবেই, তোমার ভালর জন্যেই তোমাকে সময়ে সরিয়ে আনলাম। you should not indulge in more greatness than you can possibly contain. বুঝলে না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, পরে, ইচ্ছে হলে, যেও আবার। অথবা কলকাতা বা অন্য জায়গা থেকে ফিরে এসো দেবপ্রয়াগে। কে মানা করেছে। স্কুলে যেমন ভাল ছাত্ররা ডাবল প্রমোশন পায়, তেমন এই ইস্কুলে তুমিও তো ডাবল প্রমোশন পেতেও পারো। ভোগ সম্পূর্ণ না হতেই যদি উপরওয়ালা অন্যতর কোনও যজ্ঞে তোমাকে সামিল হতে বলেন, তবে না হয় তখন তাই হয়ো। কিন্তু সবচেয়ে আগে, নিজেকে জানো। নিজেকে জানাটাই এই পথের সর্বপ্রথম পাঠ। 'আত্মানাং বিদ্ধি'। শুনেছ কি কথাটা ?

শুনেছি, মানে, পড়েছি।

চারণ বলল।

শুনেছ বা পড়েছ বলেই যে মানেও বুঝেছ তার তো কোনও মানে নেই। শুনলে আর পড়লেই যদি পণ্ডিত তৈরি হত তবে তো যত শিক্ষক, অধ্যাপক, উপাচার্য আমরা দেখি আমাদের চারধারে

www.MurchOna.com

সকলেই তাই হতেন। পড়াশোনার উপরেও একটা অন্য জ্ঞানের পরত থাকে। কেউ কেউ সেই পরতের আশীর্বাদ সঙ্গে করে জন্মান অথবা তার যোগ্য করে তোলেন নিজেকে পরবর্তী সময়ে। শুধু তাঁরাই আসল পণ্ডিত। তা নইলে তো টিকি রাখলে আর ডিগ্রির মোট বয়ে কাঁধ ঝুঁকে গেলেই সকলেই পণ্ডিত হয়ে যেতেন।

তারপর বলল, নিজেকে জানা হোক আর নাই হোক, জানার ইচ্ছেটাও যদি নিজের মনের মধ্যে সবসময় জাগরুক রাখতে পারো চারণদা, তাহলেও জানবে যে, মাউন্ট এভারেস্ট-এর চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

অলকানন্দার উপরের কংক্রিটের নয়া সেতু পেরিয়েছিল চারণেরা দেবপ্রয়াগ ছাড়বার পরেই। শ্রীনগরে পৌঁছে এবারে বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলেছে বাস।

ডানদিকে পথ কোথায় গেল ?

জিগ্যেস করল চারণ পাটনকে।

সেই যে বলেছিলাম না। পউরি !

দারুণ জায়গা। না ?

চারণ, অদেখা পউরি প্রসঙ্গে শুধোল।

সব জায়গাই দারুণ চারণদা। কোনও জায়গাই অন্য জায়গা থেকে ভাল নয়। তেমন সব মুহূর্তও দারুণ। সবসময়ে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা মনে রাখবে। "You must live from moment to moment", আমাদের মধ্যে নিরানব্বুই ভাগ মানুষই হয় ভবিষ্যতে বাঁচি নয়, অতীতে। অথচ এই যে এই মুহূর্তটি, ধরো না কেন এই মুহূর্তটিই, মানে This very মুহূর্তটিই, এই যে আমরা চলেছি শ্রীনগর ছাড়িয়ে রুদ্রপ্রয়াগের পথে, পথের দুধারের এই সুন্দর দৃশ্য, এই শান্তি, এই মুহূর্তটিকেও কি আমি অথবা তুমি পরিপূর্ণভাবে নিংড়ে নিতে পারছি বা পারার চেষ্টা করছি ? বলো ? জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, প্রতিটি সপ্তাহ, মাস, বছরকে নিবিড়ভাবে পাওয়াটাই দার্শনিকের পাওয়া। সে দর্শন ত্যাগের আর দান ধ্যানেরই হোক কি চার্বাকের মতানুযায়ী "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"-এরই হোক।

চারণ চুপ করেই রইল। ও ভাবছিল, পাটনটা এই সাধুসন্তদের সঙ্গে থাকতে থাকতে নিজের অজানিতেই বোধহয় সাধু হয়ে গেছে। নইলে, অমন বাবার এমন ছেলে হয় কি করে। তাছাড়া, একটা বহুশ্রুত কথা আছে না উদ্ভিদদের জীবনে ? যাকে, উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষাতে Symbiosis বলা হয়ে থাকে, এক গাছের কোটরে অন্য গাছের বীজ বা ফল পড়ে সেখানেই এক গাছের মধ্যে অন্য গাছের জন্ম হয়। পাটনের জীবনে হয়তো এই Symbiosis-ই কাজ করছে।

বাসটা বেশ উপরে উঠেছে আবার। ঠাণ্ডাটা কনকনে। গলার বোতামগুলো তো আটকেছিল আগেই এবারে মাফলারটাও জড়িয়ে নিল। মাথায় বাঁদুরে টুপি। নিজের চেহারা নিজে দেখতে পারছিল না ভাগ্যিস ! যদি পেত, তবে ও নিজে তো দূরস্থান ওর পাওনাদার অথবা টেঁটিয়া মক্কেলদের কেউও ওকে চিনতে পারত না শত চেষ্টাতেও। একেই বলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ এর প্রভাব।

"ব্যোম শংকর।"

কানের কাছেই এক সহযাত্রী আওয়াজ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাস জুড়ে রব উঠল "ব্যোম শংকর।" "ব্যোম শংকর।"

বাসের পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল "বোলো বাবা বদ্রীবিশালজিকি-ই-ই-ই-ই"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা সমস্বরে বলে উঠল, "জয়।"

কিছু বুঝতে পারার আগেই চারণ স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, হাইকোর্টের একজন বিলেত-ফেরৎ, দুনিয়াদারী-করা ব্যারিস্টার যে, একটু ইচ্ছে ও চেষ্টা করলেই শেরিফ হতে পারত কিংবা নির্বাচনের টিকিট পেতে পারত এ বছরেই, তার এমন অধঃপতন হয়েছে যে, সে আর বলার নয়।

লজ্জাতে, মরমে একেবারে মরে গেল যেন। ছিঃ। কলকাতার আঁতেলরা জানতে পারলে কি ভাববেন !

www.MurchOna.com

পাটন বলল, কেমন বুঝছ গো চারণ দাদা। এ নিছক কেলো নয়, এক্কেরে ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যালামিটি। এ ক্যালিমিটি থেকে উদ্ধার পাবে তেমন ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যাপাকাইটি তোমার নেই। তরীর বৈঠাটিও আমারই হাতে। আমি যে পাটন ! বলেই, গান ধরে দিল,

"কে যাবি পারি তোরা কে ?
আমি লৌকা লিয়ে বসে আচ্চি
লদী কিলারে..."

পাটনের বহুমুখী প্রতিভাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়ে চারণ বলল, ক্যাপাকাইটিটা আবার কি জিনিস ?

মনোজ মিত্রর Coinage।

মানে ?

গেঁয়ো, ইংরেজি-অ-নবিশ লোকে capacity-র উচ্চারণ কি করবে ? ক্যাপাকাইটি নয় ?

হেসে ফেলল চারণ।

বলল, তোমার স্টকে কিছু আছে বটে !

হুঁ। হুঁ। এ তো Tip of the Iceberg.

বলেই বলল, একটা গুলি সেবন করবে না কি ? ঠাণ্ডাতে যেন এখনই এই সকাল নটাতেই নিভে গেলে ! আর আজ তো মোটে তিন তারিখ নভেম্বরের। এরই মধ্যে।

চারণ চমকে উঠল। দুমাসের মতন হয়ে গেছে ওর কলকাতা ছেড়ে আসার। কই ? তেমন কিছুই তো ঘটেনি, জয়িতা তো লোক পাঠায়নি খোঁজ করতে। কোনও মক্কেল, এমনকি চন্দ্র বা সরকার অথবা জালান অথবা নেগি বা খারবান্ধারাও দিল্লির অফিসকে বলেনি তাকে "লিটারালি অ্যারেস্ট" করে নিয়ে আসতে। ও না গেলে তাদের রাজ্যপাট সব নীলামে বিকোবে। ভেবেছিল কি চারণ ?

ভেবেছিল। ও এসব ভেবেছিল। ওসব idiotic wishful thinking। কারও জন্যেই কারও ঠেকে থাকে না। কোনও ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, স্বামী, প্রেমিক। না কারও জন্যেই নয়। "ঠেকে থাকে" এই ভাবনাটাই নিজের নিজের আত্মম্ভরিতা বই আর কিছুই নয়। কারওই যদি তাকে দরকার সত্যিই নাই থাকল তবে সে আবার ফিরতে যাবেই বা কেন ? কিসের জন্যে ?

কি হল ? বললে না যে ! খাবে গুলি ? বলো তো বের করি। ঝোলাতে আছে।

নাঃ।

বলল, চারণ।

বিরক্তিটা গুলির প্রতি, না পাটনের প্রতি, না তার নিজেরই প্রতি তা বুঝতে না পেরে।

এরপরে দুজনেই বেশ অনেকক্ষণ নিজের নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে চুপ করে রইল।

আসলে চুপ করে থাকলেই কোনও মানুষ প্রকৃতই চুপ হয়ে যায় না। মস্তিষ্কের মধ্যে কথার চাবিগুলো অর্গানের চাবিরই মতন ওঠে আর পড়ে, কিন্তু mute হয়ে থাকে। অন্যে শুনতে পায় না। নিজের কান ঠিকই শোনে।

এ পথে অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য জায়গা নেই। ছোট ছোট গ্রাম আছে অলকানন্দার দুপারেই। ভিতরে ভিতরে, বিভিন্ন উচ্চতাতে। আর পায়ে-চলা পাথর-বাঁধানো পথ। যেসব পথের অনেকই বর্ণনা চারণ পড়েছিল জিম করবেট-এর বইয়েতে। নানা গাছ। দেবদারু, তোন, তাড়, ওক, মেপল্, বার্চ, চেস্টনাট, হর্স-চেস্টনাট, আরও কত তৃণ গুল্ম। চারণ আর কটা গাছের নাম জানে। দেখতে দেখতে চলেছে চোখে কিশোরের ঔৎসুক্য নিয়ে।

হঠাৎ পাটন বলল, এদিকে যখন এলেই তখন একটা বই লেখো না তুমি চারণদা।

বই ? আমি ? কী বই ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

www.MurchOna.com

ট্র্যাভেলোগ। আবার কি বই ? এইসব অঞ্চলে দুমাস রইলে, এত রকমের মানুষকে দেখলে কাছ থেকে হৃষীকেশে, দেবপ্রয়াগে। দেখবে আরও রুদ্রপ্রয়াগে। সেখান থেকে আরও কত দিকে যেতে পারো। ইচ্ছে করলেই। আচ্ছা তুমি এতদিন আছো, পুরো গ্রীষ্মটাই বলতে গেলে থাকলে, তোমার নাকের উপর দিয়ে হাওড়ার ঘুসুরীর বেন্দাবন, মালিপাঁচঘড়ার নটে, বালিগঞ্জের নেকি সুতনুকা, নিউ আলিপুরের দাম্ভিক সেন সাহেবরা, সল্টলেক-এর চালিয়াত বোসেরা, ঘোষেরা, চাটুজ্যেরা, ডায়মণ্ডহাবড়ার ছিকান্ত আর সৌদামিনী, সকলেই কেদার-বদ্রীতে গিয়ে পুণ্য সেরে ফেলল আর তুমি "ন যযৌ ন তস্থৌ" হয়ে দেবপ্রয়াগেই পড়ে রইলে কেন বলত ? তোমার কি পুণ্য করতে ইচ্ছে হল না একটুও ? নাকি তোমার পাপ জমেনি তেমন, তাই পুণ্য করে তা কাটাকুটি করতে চাও না ?

ঠিক তা নয়।

চারণ বলল।

তবে কি ? ঠিক-বেঠিক জানি না। ব্যাপারটা কি ?

জানি না, বুঝিয়ে বলতে পারব কি না। সকলেই যা করে তা করতে আমার কোনওদিনই রুচি ছিল না। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নয়। এরা যে প্রবল বেগে গেল দেবদর্শনে যুদ্ধের রথের মতন দ্রুতগামী বাসে করে, ব্যস্ততার ধুলো উড়িয়ে, হাজার হাজার মানুষ, যেমন করে প্রতিবছর মক্কা-মদিনাতে যায় "হাজী" হতে, সেলাইবিহীন বস্ত্র পরে পৃথিবীর সব মুসলমানেরা, জেরুজালেমে যায় ইহুদিরা, মরুভূমির মধ্যের হিংলাজে যায় হিন্দুরা, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সর্দারজিরা—তাদের কারও সঙ্গেই আমার তো কোনওই মিল নেই।

কেন ? মিল নেই কেন ? তুমি কি হেলিকপ্টার থেকে থ্রি-পিস-স্যুট পরা অবস্থাতে এখানে আছড়ে পড়েছ ? তুমি এদেশের কেউ নও ?

সে কথা নয়। আমি হিন্দু মা-বাবার সন্তান কিন্তু আমি নিজে কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্বী নই। তা বলে ধর্মের ভূমিকা, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকারও করি না। কিন্তু যে ধর্ম সম্বন্ধে এখনও পৃথিবীর মানুষ অবহিত নয় আমি তেমনই এক ধর্মে বিশ্বাসী। যে ধর্ম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়েও অন্য কোনও ধর্মেরই সঙ্গে কোনও বিরোধ রাখে না। রাখবে না। এই ধর্ম আমার শিক্ষা, আমার শিক্ষা-বিকীরিত ঔদার্য, আমার আধুনিকতা। যে-আধুনিকতা প্রাচীনত্বর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হয়েও উগ্র অশিক্ষিত সবজান্তা বড়লোকদের বা বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত আধুনিকতা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

বলেই বলল, যাক সেসব কথা। বাসের মধ্যে বসে এত গভীর আলোচনা করতে গেলে চিন্তা নড়ে যাবে, মগজ ঘুলিয়ে উঠবে।

বেশ। তা নয় মানলাম কিন্তু তোমার বই লিখতে বাধা কোথায় ?

কী যে বলো পাটন। এইসব অঞ্চল নিয়ে কত ভাল ভাল বই লেখা হয়েছে তা কি তুমি জান ? কত মানুষ, এবং তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে অনেকই জ্ঞানী, গুণী, অভিজ্ঞ, সারাজীবন এই কুমায়ুঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়ের আনাচ-কানাচ ঘুরে কত সুন্দর সব বই আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বাংলা বই ?

পাটন অবিশ্বাসীর গলাতে বলল।

হ্যাঁ বাংলা বই। কেন তোমার কি ধারণা ভাল বই বলতে যা বোঝায় তার সবই ইংরেজিতেই লেখা হয় ? আমার তো ধারণা ইংরেজিতে প্রকাশিত আশিভাগ বইই উনুনে দিয়ে দেওয়া উচিত। এই হীনম্মন্য মানুষদের দেশে কেউ ইংরেজি বললে বা ইংরেজি জানলেই আমরা তাকে দেবতা জ্ঞান করি। লজ্জাকর।

আঃ। তুমি এই মেজাজ নিয়ে হাইকোর্টে সওয়াল করে জিততে কি করে ভেবে পাই না। সত্যি।

সেই আমি এই আমি নই।

তুমি নও ?

www.MurchOna.com

নাঃ।

তবে সে কে ? তুমি কতজন তুমি ? আচ্ছা হেঁয়ালি করো তো !

সে একজন মুখোশধারী। আমার চেম্বারের দেওয়ালে যে-হ্যাঙ্গারে গাউন টাঙানো থাকে, যেটা গায়ে আলতো করে চাপিয়ে, যে শামলা গায়ে দিয়ে কোর্টে অ্যাপিয়ার করি আমি, তারই পাশে একটি অদৃশ্য হ্যাঙ্গারে ঝোলানো থাকে আমার উকিলের মুখোশ। যে-আমি কথায় কথায় মাথা নিচু করে, হাসি মুখে, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা করে কোনও কোনও হাকিমকে বলি, 'মী লর্ড' আর যার মুখোশের আড়াল থেকে আমার আসল আমি নিরুচ্চারে বলে, "ওরে ছাগল, যা বলি, তা কান খুলে শোন।" সেই আমি আসল আমি নই। সে তো একটা বিক্রি হয়ে-যাওয়া সত্তা। সে-আমি ছাগলকে ছাগল বললে, অশিক্ষিতকে অশিক্ষিত বললে আমার মক্কেলদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আদালত অবমাননা হয়ে যাবে। আদালত কি কখনও অবমাননা করার মতো কাজ করেন ? ছিঃ। মক্কেলদের কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা হিসেবে সম্মানী নেব আর তাদের সর্বনাশ করব তা তো হতে পারে না। তবে যখন ওই পাড়া ছেড়ে বাইরে চলে আসি, চলে আসি আমার চেম্বার ছেড়ে, তখন আমি আসল আমি হয়ে যাই। মুখোশটা সারা রাত, সারা গ্রীষ্মাবকাশ, পুজোবকাশ, চেম্বারের দেওয়ালেই ঝোলে। তাতে ধুলো পড়ে।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আনতে বললাম গোবর আর ঠেলে আনলে গাই। এইসব অঞ্চল নিয়ে লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম বল তো শুনি। আশ্চর্য। আমি একটাও পড়িনি।

পাটন সম্ভবত চরতে বেরুনো চারণকে ফিরিয়ে আনার জন্যে বলল।

প্রথমেই বলতে হয়, 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'।

চারণ বলল।

কার লেখা ?

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। শুধু এই অঞ্চলই নয়, আরও অনেক জায়গা নিয়ে লেখা। কৈলাশ, মানস সরোবরও আছে। নিজের আঁকা ছবি। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখাও আছে। প্রবোধ সান্যাল মশায়ের "মহাপ্রস্থানের পথে"র সিনেমা দেখেই তো সাধারণ বাঙালির টনক নড়ে। ওই ছবিতেই বাঙালি আবিষ্কার করে অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা এবং বসন্ত চৌধুরীকে।

তাই ?

তাই বৎস।

আর কার কার বই আছে ?

শঙ্কু মহারাজের। অনেক বই। সারা জীবনই বলতে গেলে এই অদম্য জীবনীশক্তির মানুষটি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে সাধারণ বাঙালিদের জন্যে এইসব পুণ্যভূমির খবর জোগালেন। এছাড়াও আরও অনেকে আছেন। সকলের নাম বলতে গেলে তুমিই Bored হয়ে যাবে।

তা ঠিক।

তারপর আবার দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে রইল।

হঠাৎই পাটন বলল, চন্দ্রবদনীকে তুমি ধরে রাখতে পারলে না চারণদা ? কাজটা ভাল করলে না কিন্তু। সোনাকে অবহেলা করলে অমন করে !

চারণ হেসে বলল, ফাজিল ! এক নম্বরের !

তারপর বলল, সত্যি। সে গেল কোথায় বলো তো ? আর তো তারপরে দেখলামই না।

তুমি না দেখলে কি হয়, সে তোমাকে দেখেছে ঠিকই।

বাজে কথা। মোটেই নয়। তুমিও ভাল করেই জানো যে, সে তোমাকে দেখেছে। "কথা পড়ে হাটের মাঝে/যার কথা তার বুকে বাজে।" হেঃ হেঃ।

তারপরই বলল, তোমার সঙ্গে দেখা না-হতে পারে, আমার সঙ্গে হয়েছে। সে নীচে গেছিল, হৃষীকেশেও। তোমার সেই সব বাবা ধিয়ানগিরি, বাবা ভীমগিরি আর কৃষ্ণা বহীনদের সঙ্গে দেখা করতে।

www.MurchOna.com

তারপর কোথায় গেছে ?

তা কি করে বলব। মেয়েরা নদীরই মতন। তারা কোথায় বাঁক নিয়ে কোন অচেনা বনের মধ্যে কখন হারিয়ে যায় তা কি আগে থাকতে বলা যায় ? পাখিরাই শুধু খোঁজ রাখতে পারে, রাখে তাদের। তারা যে জলের গন্ধ চেনে। এবং চেনে বলেই, দূরের নদীর গন্ধ পেয়ে কাক-উড়ান এ উড়ে গিয়ে তাদের ঠিক খুঁজে বের করে।

বাবা, এ যে কবিতা একেবারে।

চারণ বলল।

পাটন হেসে বলল, আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশি কবি। এবং ভগ্নদূতও।

ভগ্নদূত মানে ?

ভগ্নদূত, কারণ অন্যের জন্যে ভাল খবর আমি প্রায় কখনওই নিয়ে যেতে পারিনি। যেমন তোমার জন্যেও পারলাম না।

মানে ?

মানে, চন্দ্রবদনী রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে সেই যে নেমে গেছিল দীপাবলীর আগে দেবপ্রয়াগে, যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে তার কোনও খোঁজই নেই।

খোঁজ নেই মানে ?

মানে, নিরুদ্দেশ।

হতেই পারে না।

চারণ জোরের সঙ্গে বলল।

কেন ? হতে পারে না কেন ? প্রতিদিন আমাদের কলকেতার খবরের কাগজগুলোতে পাতা জুড়ে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ এর যে সব খবর বেরোয় সেগুলো কি সব মিথ্যে ?

না, তা নয়।

নয় কেন ? তোমার নিজের পায়ের আঙুলে চাপ পড়েছে বলেই তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আর অন্যদের বেলা সহজেই বিশ্বাস হয়।

বিরক্ত হয়ে চারণ বলল, আঃ পাটন। থামো এবারে। সে আছে না গেছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে তা জানতে আমার বিন্দুমাত্রই ঔৎসুক্য নেই। তুমিই একটি Myth তৈরি করলে অকারণ তাকে নিয়ে, আবার তুমিই তাকে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ-এর পাতার খবর করে দিলে।

তারপর বলল, তুমিই খুন টুন করো নি তো ?

করতেও পারি। করলেও বা জানছে কে ? দেবভূমির এই মস্ত সুবিধে। প্রতিমুহূর্তেই এখানে জন্ম হচ্ছে অগণ্য মানুষের, আক্ষরিকার্থে নয়, ভাবার্থে। তেমন প্রতিনিয়ত মৃত্যুও হচ্ছে। সবরকম মৃত্যু। তাই নিয়ে কেউ উল্লাসও করছে না আবার চোখের জলও ফেলছে না।

সব ব্যাপারেই তোমার এই দার্শনিকতা আমার ভাল লাগে না পাটন। তোমার এই ছদ্ম-দার্শনিকতা।

পাটন হেসে বলল, আমার দার্শনিকতাটা ছদ্ম নয়, যতটুকু পেয়েছি, মোটারই অশেষ দয়াতে। কিন্তু তুমি যে পেলে না কিছুই, তোমার আধার ভাল হওয়া সত্ত্বেও। হয়তো তেমন করে নিতেও চাওনি।

চমকে উঠে চারণ বলল, হয়তো তাই সত্যি ! কিন্তু কেন বলো তো ?

বললাম তো ! পেতে চাওনি তাই। সময় হয়নি। জীবনে প্রতিটি ঘটিতব্য ঘটনারই একটি বিশেষ সময় থাকে। সেই সময় উপস্থিত না হলে কিছুই ঘটবে না। এইসব ঘটনা পেঁপে বা কলা পাকানো নয়, যে, কারবাইডের সাহায্যে তোমার ইচ্ছে মতন পাকাবে। সময়কে তার প্রাপ্য দিতেই হবে।

বলেই বলল, চারণদা, "What will be, will be well, for what is is well, To take interest is well, and not to take interest shall be well".

www.MurchOna.com

চমকে উঠল চারণ। বলল, কার ?

Walt Whitman, আমেরিকার রবীন্দ্রনাথ।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে চারণ বলল, হুঁ। সময়কে সময় না দিয়ে কোনও উপায়ই নেই। না দিলেও সে আদায় করে নেবে।

বলল, স্বগতোক্তিরই মতন।

হুঁ বলল, না "ওঁ" বলল ঠিক বুঝল না।

"ওঁ" শব্দটির মানে ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর থেকে মাঝে মাঝেই ওর এমনই নির্জনে ওঁ বলে উঠতে ইচ্ছা করছে। নিজের মনের নির্জনতা বোধ করলেই মানুষে নির্জন হতে পারে। তা বাসের মধ্যে বা ট্রেনের মধ্যে বা যেখানেই তিনি থাকুন না কেন! পাটনের নিরন্তর বুকনি না থাকলে বাসের মধ্যে বসেই ও হয়তো সেই নির্জনতা বোধ করত। কিন্তু তা কি হতে দেবে পাটন!

প্রথম-দুপুরে যাত্রীদের খাওয়ার সময়ে, সাহেবি লাঞ্চ-আওয়ারে নয়, বাসটা এসে দাঁড়াল রুদ্রপ্রয়াগে। তার আগে অলকানন্দার উপরের মস্ত ব্রিজ পেরিয়ে এসেছিল। এখান থেকে সোজা গেলে কেদারনাথের পথ চলে গেছে আর মন্দাকিনীর উপরের সেতু পেরিয়ে নদীর ওপারের পথ ধরে গেলে বদ্রীবিশাল। এইখানেই মন্দাকিনী আর অলকানন্দার সঙ্গম। সঙ্গমে যেতে হলে বাস যেখানে থামল সেখান থেকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

সত্যি সত্যিই এসে পৌঁছল তাহলে। চারণ ভাবছিল, প্রত্যেক মানুষেরই স্বপ্নে আর কল্পনাতে অনেকই জায়গা থাকে। সেইসব জায়গাতে বোধহয় কোনওদিনও না যাওয়াই ভাল। গেলে, 'ইয়ারো ভিজিটেড'-এর মতো স্বপ্ন ভঙ্গ হয় হয়তো। প্রেমেন্দ্র মিত্রর বিখ্যাত গল্প "তেলেনিপোতা আবিষ্কারে"র মতন।

কিন্তু খুব একটা স্বপ্ন ভঙ্গ হল কি ? নাঃ। যেমন পড়েছিল, যেমন ছবি দেখেছিল তার, তেমনই তো দেখছে। পঞ্চাশ ষাট বছর পরেও তো খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। জিম করবেট-এর "ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ" বইতেও নদীর উপরের সেই ঝুলন্ত লোহার ব্রিজটার ছবি দেখেছিল। যার স্তম্ভের উপরে জিম করবেট দুরাত কাটিয়েছিলেন চিতাটি যদি রাতে নদী পার হয়, তবে তখন তাকে মারবেন এই আশাতে। ওই সব নদীতে এতই বেগ এবং জল এতই হিমশীতল যে বেড়ালের মাসির মতো চামড়া-সচেতন প্রাণী চিতা, নদী সাঁতরে পেরুনোর চেষ্টাই করবে না তাই। অলিখিত কার্ফু ঘোষিত হয়ে গেছিল পুরো এলাকাতে, বছরের পর বছর। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের নীরবতা নেমে আসত তখন গাড়োয়ালের এই সব অঞ্চলে বছরের পর বছর ওই একটি মানুষ-খেকো চিতার ভয়ে।

ওদের নামিয়ে দিয়ে বাসটা চলে গেল নীচে। সেখানে বাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। যাত্রীরা মধ্যাহ্নের খাওয়া সারবেন। যার যা অভিরুচি। রুটি, ফুলকা, সবজি, ডাল, কাড়হি, দই। যে যা ভালবাসেন। গরম চা। বোতলের পানীয়ও। থামস-আপ, ফান্টা, লিমকা, কোক ইত্যাদি।

বাসটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জায়গাটাকে যেন নির্জন বোঝাল। একপাশে, বাঁয়ে, খাড়া নেমে গেছে নীচে নদীপথ। মন্দাকিনী আর অলকানন্দা মিশে যাওয়ার পরে মন্দাকিনীর আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব রইল না। অলকানন্দার নামেই তখন সে পরিচিত। আবার অলকানন্দা যখন দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হল তখন থেকে সেও লীন হয়ে গেল গঙ্গাতেই। হৃষীকেশ-এ পৌঁছে যখন সমতলে ছড়িয়ে গেল ভগীরথের মর্ত্যে-আনীত গঙ্গা, তখন সে শুধু গঙ্গা বলেই পরিচিত হল।

একপাশে নদী আর অন্যপাশে একেবারে খাড়া পাহাড়। ওরা যেখানে নামল তার কাছেই পাহাড়ের গায়ে দুটি হোটেল আছে পরপর। তারওপরে আর্মির ক্যাম্প। ট্রান্সপোর্ট ডিপো। বাজারের দিকে নিশ্চয়ই অনেকই হোটেল, ধর্মশালা আর চট্টি আছে।

এরপর ? এবারে কি ?

গলার বোতামটা ঢিলে করে, মাফলারটা খুলে ফেলে চারণ জিগ্যেস করল তার লোকাল গার্জেন

www.MurchOna.com

পাটনকে।

এখন হাওয়া আছে কিন্তু বাস চলাকালীন যেমন লাগছিল তেমন ঠাণ্ডা তো নেই। রোদ ঝকঝক করছে চারদিকে। নীল আকাশ, সবুজ নদী, গাঢ় সবুজ জঙ্গল। রোদের কুচি উড়ছে হাওয়াতে।

চারণ পা চালিয়ে বলল, এরপর আর একদিন তুমি আমার সাধুসঙ্গ পাবে। জাস্ট একটি দিন।

মানে ?

মানে আর কী। একরাত তোমার সঙ্গে কাটিয়ে তোমার একটা গতি করে দিয়ে আমি চলে যাব।

অবাক হয়ে চারণ বলল, ব্যাপারটা কি ? তোমাকে তো আমি আমার অগতির গতি হতে বলিনি। দেবপ্রয়াগ থেকে বেরোলে আমাকে ট্যাকে করে আর রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছেই Jettison করছ আমায়, তোমার এই হরকৎ এর উদ্দেশ্যটা কি ? আর তুমি যাবেটা কোথায় ?

বদ্রীনাথ। সেখান থেকে আরও উপরে।

সেখানে কি ?

দুধাহারীবাবা আছেন।

তাই ?

হ্যাঁ। সারা শীতকালটাই উনি বরফের মধ্যে বসে সাধনা করেন।

সত্যি ?

না তো কি মিথ্যা ? শুধু উনিই কেন ! কত সাধুসন্ত আছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সমতলের মানুষেরা তো দূরস্থান, আমরাই বা তাঁদের কজনকে চিনি। তাঁদের কজনেরই বা আশ্রম বা সংগঠন আছে ? এমন সন্ন্যাসীও অনেক আছেন যাঁর একজনও চেলা নেই। তাঁরা স্বয়ম্ভু কিনা জানি না। তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য, পানীয়, ভীতি, দয়ামায়া, ভক্তি এসব ব্যাতিরেকেই শীত গ্রীষ্মের বোধরহিত হয়েই একা একা বেঁচে থাকেন যুগের পর যুগ। সময়, Eternal time, জার্মান শেফার্ড ডগদেরই মতো বরফ মেখে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে এসে সেইসব সন্নিসীদের দুপায়ের উপরে মাথা নামিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। আসল দেবভূমি তো ওইসব জায়গাতেই চারণদা ! কেদারবদ্রী, গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স তো তোমার মতো সাধারণ তীর্থযাত্রীদেরই জন্যে। কলকাতাতে ফিরে পাড়ার রকে আর শ্বশুরবাড়িতে হিরোগিরিতেই এইসব অধিকাংশ যাত্রীদেরই তীর্থযাত্রার সার্থকতা। এসবই বাহ্য। আগে চলো আর। আগে কহো আর।

তা তুমি কি পথেই দাঁড়িয়ে জ্ঞান বিতরণ করবে, না খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কিছু করবে ? রাতটা যেখানে কাটাবে বলে মনস্থ করেছ, সেই ডেরাতেই তো আস্তানা গাড়লে হয় দিনে দিনে। এখনই যা হাওয়া ছেড়েছে। রাতে তো মালুম দেবে।

হ্যাঁ, চলো। তাই তো যাচ্ছি। চলছি দেখছ না। দাঁড়িয়ে আছি, থোড়িই।

বলেই, পাটন একটু এগিয়ে গেল আমাকে নিয়ে। একটা বাঁক নিয়েই একটি চারতলা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। চারতলা বটে কিন্তু হোটেলটির আদৌ depth নেই। দিল্লির জনপথে জনপথ হোটেলের এক একটি উয়িং যেমন, সেরকম। লম্বা টানা বারান্দা আর তার সামনে পাশাপাশি ঘরের সারি।

সামনে গাড়ি রাখারও জায়গা আছে।

ম্যানেজার পাটনকে দেখেই দৌড়ে এল। চারণ বুঝল যে, পাটনের যাওয়া আসা আছে এখানে।

পাটন বলল, জয় বদ্রীবিশালজিকি।

অল্পবয়সী ম্যানেজারও বলল, জয় বদ্রীবিশালজিকি।

তারপরই গুরুমুখীতে বলল, "উত্তে ? ইয়া থল্লে ?"

পাটন আঙুল দিয়ে উপরে দেখিয়ে বলল, উত্তে। উত্তে।

ম্যানেজার আমাদের নিয়ে সিঁড়ি চড়তে লাগল। লাগল তো লাগলই। পাটন বলল, ঘর আর ফালি বারান্দাটুকু নিয়ে যতখানি জায়গা, হোটেলের depth-ও ততখানিই। ওইটুকু জায়গাও যে বের করেছে এই খাড়া পাহাড়ে এই যথেষ্ট। তবে আমাদের দেশের সমস্ত পাহাড়ি এলাকাতেই যেমন

www.MurchOna.com

আনপ্ল্যানড, আনরেস্ট্রিক্টেড কনস্ট্রাকশন হয়ে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে, তাতে দেখবে, খেপে খেপে ধ্বস নেমে সব পাহাড়ি শহরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন। টাউন-প্ল্যানিং-ট্যানিং, সুয়্যারেজ, পিলারিং এসবের বালাই নেই গত পঞ্চাশ বছর। এই তো সেদিনই ভূমিকম্প হয়ে গেল না যোশীমঠ থেকে শুরু করে সর্বত্র? তুমি যে হোটেলে ছিলে হৃষীকেশে, সেই হোটেলের লিফটটার অ্যালাইনমেন্ট পর্যন্ত নড়ে গেছে। উঠতে নামতে ঢকঢক শব্দ করে। লক্ষ করেছিলে চারণদা?

হুঁ।

চারণ বলল।

অথচ তুমি সুইটজারল্যান্ডে যাও, দেখবে ছবির মতন সব কিছু। তুমি গেছ নিশ্চয়ই?

গেছি একাধিকবার। কিন্তু আমাদের কুমায়ুঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়ের সঙ্গে সুইটজারল্যান্ডের তুলনা? শিবের সঙ্গে বাঁদরের? কোনও তুলনাই হয় না। ওদের ঘরবাড়ি পথ সবই ভাল হতে পারে কিন্তু এমন দেশ ওরা কোথায় পাবে। শুধু আমাদের দেশের নেতাগুলো যদি মানুষ হত।

পাটন বলল, সবে সিম্পটমস দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতিকে বহু হাজার বছর ধরে ধর্ষণ করছি আমরা। প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করবে তখন...।

চারণ বলল, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

ঠিক তাই।

এই হোটেলের মালিক কিন্তু সাহারানপুরের মানুষ। বুঝলে চারণদা। উত্তরপ্রদেশীয়। ম্যানেজার যদিও পাঞ্জাবি। এদের মস্ত বড় দুগ্ধজাত সামগ্রীর কারখানা আছে সাহারানপুরে। পাউডার মিল্ক, কনডেনসড মিল্ক, ঘি, আচার, রুটি ইত্যাদি নানা কিছু তৈরি হয়। মালিক মার্সিডিস গাড়ি নিয়ে বছরে একবার আসেন শ্বশুর শাশুড়ি এবং স্ত্রীকে নিয়ে। বদ্রীনাথ কেদারনাথ যেতে এখানে পথে থাকতে অসুবিধে হত আগে আগে, তাই এখানে এই হোটেলটিই বানিয়ে রেখেছেন।

বাঃ। আমার একজন এমন জামাই থাকলে বেশ হত।

বে-থা করো। বউই আগে আসুক। তারপরে তো মেয়ে জামাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদির আশা?

যে-ঘরটিতে ওদের নিয়ে ওঠাল ম্যানেজার সেটি ছোট হলেও cosy। অ্যাটাচড বাথও আছে।

আরেকটা ঘর লাগবে, চারণ বলল।

ম্যানেজার বলল, দোনো একসাথমে নেহি রহিয়ে গা? ঠিক হ্যায়। বগলওয়ালা কামরাভি খুল দে রহা হ্যায়।

পাটন বাংলাতে বলল, কেন বাবা! তুমি কি বাবুকে "হোমো" ঠাওরালে নাকি?

হেসে ফেলল চারণ। কিন্তু আশ্বস্তও হল। অন্য কারও সঙ্গেই একঘরে শোওয়ার অভ্যেস ওর ছিল না। রাতের ঘুম এবং বিশ্রাম ব্যাপারটা এতই ব্যক্তিগত এবং নিভৃত যে, তাতে প্রিয়তম বন্ধুকে নিয়েও একঘরে শোওয়া অসম্ভব। বান্ধবী হলে কি করত জানে না অবশ্য। তবে সে সব কল্পনাতেই ছিল। কখনও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখিনি। শোওয়ার সময়ে একা ঘরই ভাল। বেশ কিছুদিন তো দেবপ্রয়াগে ভোলানন্দজির গুহাতে অতজনের সঙ্গে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েই কাটল। তখন কিন্তু কোনও অসুবিধা হয়নি। যেখানে বাহুল্য করা যায় সেখানে কম-সম করার অভ্যেস চারণের নেই। যেখানে বাহুল্যবর্জন অবশ্যকর্তব্য সেখানে বর্জন করতে আপত্তি নেই।

পাটন পাশের ঘরটিও খুলিয়ে দুটি ঘর থেকেই চেয়ার বের করে বারান্দাতে পাতাল। রোদ এসে পড়েছে বারান্দাতে। সামনে সোজা দেখা যাচ্ছে অলকানন্দার ওপরের প্রায় আকাশছোঁয়া পাহাড়। তার মাঝে মাঝে গাছগাছালি, বস্তি। ওইটিই কি রুদ্রপ্রয়াগের মূল বস্তী? কে জানে! গৃহপালিত গাছগাছালির ভিড়ে বাড়ি ঘর তেমন দেখা যাচ্ছে না কিন্তু লোকজন যে যাতায়াত করছে তা উঁচু পাহাড়ের ridge-এর উপরে গাছগাছালির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কি দেখছ?

ওখানে গ্রাম আছে।

www.MurchOna.com

অত উঁচু পাহাড়ের উপরে ?

নিশ্চয়ই ! হাসালে তুমি বঙ্গনন্দন। তিব্বতেও কি ঘর বাড়ি নেই ? আর এ-তো রুদ্রপ্রয়াগ। কেদারনাথ বদ্রীনাথ হলেও না হয় কথা ছিল।

অত উপরে, মানুষে যায় কি করে ! থাকে কি করে !

ওরা যে পাহাড়ি। পাহাড়িরা পাহাড়ে থাকবে না ! ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ তো থাকবেই। তা ছাড়া, মানুষে যখন চাঁদ এবং সমুদ্রর নীচে থাকার তোড়জোড় করছে তখন পর্বতের উপরে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

তবু ভারী কষ্ট ওদের ! অবশ্যই।

কেন ?

বাজার দোকান করতেও যদি বান্দরপুঞ্ছে উঠতে আর সেখান থেকে নামতে হয়, তবে কষ্ট হবে না !

পাটন ঐ গ্রামের বাসিন্দাদের কষ্ট কল্পনা করে সহানুভূতি দেখাল।

আমাদের কাছে যেটা কষ্ট সেটাই হয়তো ওদের কাছে আনন্দ। তাছাড়া চারণদা, শৃঙ্গ বলতেই তোমার শুধু বান্দরপুঞ্ছ-এর কথাই বা মনে হল কেন ? চন্দ্রবদনীও তো শৃঙ্গ। মানুষ চন্দ্রবদনীর মুখটি একবার মনে করলে তো আমি নাঙ্গা হয়েই নাঙ্গাপর্বতে চড়ে যেতে পারি।

তোমার কথা আলাদা। তুমি পবনপুত্র মারুতি।

চারণ হেসে বলল।

ম্যানেজারকে বেল বাজিয়ে ডেকে এনে কষে খাবার অর্ডার করল চারণ। বলল, ঠিক দুটোর সময় এখানেই পাঠাবে। আমরা রোদে বসে খাব।

চারণ বলল, এ কি মামাবাড়ির আবদার নাকি ? তোমার পুরী, কাড়হি, রাজমা-তড়কা, পালক—পনীর, ক্ষীর, হরিমির্চ, পেঁয়াজরসুন গাজর এত সব বয়ে আনতে চারতলাতে তো খচ্চর লাগবে।

পাটন ম্যানেজারের দুচোখে তার দুচোখ রেখে মুখ একটুও না ঘুরিয়ে বলল, তোমার কি ধারণা এ খচ্চর নয় ? না, এর মালিক খচ্চর নয় ?

তারপরই বলল, সত্যি চারণদা ! ভেবে দেখো ! জীবজগতে এত ভাল ভাল জানোয়ার থাকতে এই মানুষ হারামজাদারা সবচেয়ে বেশি emulate করল খচ্চরকেই। মানুষের মধ্যে তুমি যত সংখ্যক ছুপা-খচ্চর পাবে তার একাংশও পাবে না বাঘ বা সিংহ তো দূরস্থান, বাঁদর হনুমানে পর্যন্তও। হিন্দুস্থান ক্রমশ খচ্চরেরই আস্তানা হয়ে উঠছে।

আবারও চারণ হেসে উঠল জোরে চারণের কথাতে যতটা নয়, বলার ভঙ্গিতে।

ম্যানেজার কি করবে, না বুঝতে পেরে, প্রয়োজনে বেল বাজাবেন বলে, নীচে নেমে গেল।

মোটার গুহাতে চামচিকের মতন থেকে থেকে না-খেয়ে না-দেয়ে আমার সাত কেজি ওজন কমে গেছে। তা ছাড়া আমি খুব কেয়ারফুলি হিসেব করে দেখেছি চারণদা যে, মানুষের জ্ঞান অ্যারিথমেটিকাল প্রোগ্রেসানে বাড়লে, মানুষের ওজন জিওমেট্রিকাল প্রোগ্রেসান কমে !

চারণ আবার হেসে উঠল ওর কথায়।

পাটন যে একটি ওরিজিনাল মানুষ, তার যে একটিও প্রোটোটাইপ নেই এই দুনিয়াতে, সে বিষয়ে চারণ অনেক আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। যতই দেখছে ওকে, ততই পাটনের চরিত্রের আনপ্রেডিটেবিলিটিতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে।

চারণ বলল, এবার হাত মুখ ধুয়ে এসো। একটা জিনিসকে প্রসাদ করে দাও। স্বাদও ভুলে গেছি গো দাদা। আমি যদি আরও কিছুদিন এমন সব্বো-বিষয়ে বমবোচযয পালন করি, তো হয় পাগল হয়ে যাব, নয়তো আমার অণ্ডকোষদ্বয় মস্তিষ্ক ভেদ করে ব্রহ্মলোককে বিদ্ধ করবে। অকারণে এতরকম কৃচ্ছ্রসাধনের কোনও মানেই হয় না। ধুসস্‌স্‌।

ছিঃ। তোমার মুখ তো নয়, আস্তাকুঁড় পাটন।

www.MurchOna.com

চারণ বলল।

পাটন বলল, ওঁ।

বলেই, নিজের ঘরে চলে গেল।

চারণও ওর ঘরে গেল হাত মুখ ধুতে।

একটু পরেই পাটন চারণের ঘরের বন্ধ দরজাতে নক করল।

দরজা খুলতেই চারণ দেখল পাটনের হাতে একটি প্যাকেট। চারণের হাতে দিয়ে বলল, সাহেবরা যদিও বলে, "স্কচ আফটার সান ডাউন" কিন্তু এই দেবভূমিতে অন্য নিয়ম। দিল্লি থেকে আনিয়েছি। এখন তো দেশেই হচ্ছে। ব্ল্যাক-ডগ। শালা স্বাদই ভুলে গেছি। লাগাতার ধর্মঘট তাও সহ্য করা যায়, বসা-ধর্মঘট, শোওয়া-ধর্মঘট, দাঁড়ানো-ধর্মঘট ইজি-চেয়ারে আধশোয়া-ধর্মঘট কিন্তু লাগাতার সাধুগিরি অসাধুদের পক্ষে হাইলি-ডেঞ্জারাস এক্সারসাইজ।

তা হোক। এক্সারসাইজ ইন ফিউটিলিটি না হলেই হল।

চারণ বলল।

তার মানে ? তুমি খাবে না বলছ ?

বিশ্বাস করো পাটন, না খেয়ে দারুণ আছি। ছাড়াটা যে কত কঠিন তা তুমি জানো কি না জানি না কিন্তু আমি জানি। আবার ধরাটা খুবই সোজা। কিন্তু...

পাটন বলল, তুমি একটা যা তা। এতটুকু উইল-পাওয়ার নেই তোমার। আর তুমি সাধুসঙ্গ করতে এসেছিলে এখানে ! তুমি বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে বড় হতে পারো কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছে এই অধম পাটন, মনে রেখো সবসময়ে।

কি ?

যার উইল-পাওয়ার নেই তার সাধুসঙ্গ তো দূরস্থান নারীসঙ্গও কপালে নেই। আগে নিজের মালিক হও তারপর দ্যুলোক-ভূলোক জয় করবে। নাও। আর বেশি বাতেল্লা কোরো না, একটা বড় করে ঢেলে দিচ্ছি। নীট খাও। বেড়ে ঠাণ্ডা আছে। খাবার আগে আরও একটা করে মারব। আর বাকিটা রাতে।

চারণ চুপ করে রইল।

পাটন বড় যত্ন করে বানাল, যেমন যত্ন করে ভোলানন্দজিকে গাঁজা বানিয়ে দিত, তারপর আগেকার দিনের জমিদারের খাস বেয়ারারা যেমন বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল ডান হাতের কনুইয়ের গোড়াতে ঠেকিয়ে পরম বিনয়ের সঙ্গে ডান হাতে ধরে গড়গড়ার আলবোলা বা হুইস্কির গেলাস মনিবের দিকে তুলে দিত ঠিক তেমনি করে চারণের দিকে গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, একটু প্রসাদ করে দাও। তোমার এঁটোটা আমি নেব, অন্য গেলাসটা তুমি নাও।

পাটন বলল, বারান্দাতে তো গ্রিল বা রেলিং নেই, সিমেন্ট বাঁধানো পথ থেকে কেউই দেখতে পাবে না। পেলেও ভাববে, তুলসীপাতা আদা, মকরধ্বজের সঙ্গে মধু দিয়ে খলনোড়াতে মেরে খাচ্ছি। কেউ সন্দ করবে না।

একটা ঈগল উড়ছিল ঘুরে ঘুরে নীল আকাশে। অনেক উপরে। তার শ্যেনদৃষ্টিতে কী যে খুঁজছে তা সেই জানে। সাপ, ইঁদুর, কাকার এর বাচ্চা ?

তার ছায়াটাও ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকায়, নদীর বুকে।

পাটন এক চুমুকে আধ পেগ নীট ব্ল্যাক-ডগ গিলে ফেলে বলল, বুঝলে চারণদা। ফর আ চেঞ্জ, আজকে আমরা ভোগী। কাল থেকে ফিন যোগী।

চারণ কিছুই না বলে পাটনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রুদ্রপ্রয়াগের সেই উজ্জ্বল, রৌদ্রস্নাত, crisp দুপুরটিতে উঁচু পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে-যাওয়া অলকানন্দার দিকে চেয়ে মস্তিষ্কে, ব্ল্যাক-ডগ-এর নেশার সঙ্গে আরও অনেক কিছু বয়ে নিয়ে এল—জিম করবেট-এর মানুষখেকো চিতা, হেমিংওয়ে আর ওয়াল্ট হুইটম্যান আর রবার্ট ফ্রস্ট-এর লেখাও।

চারণ বলল, হেমিংওয়ের একটি লেখা আছে "A very well lighted place" পড়েছ ?

www.MurchOna.com

নাঃ। "Men without women" পড়েছি।

তারপর বলল, তুমি বুঝি Hemingway-এর খুব ভক্ত।

চারণ নড করল। বলল শুধু Hemingwayরই নয়, Whitman, Robert Frost, Jim Corbett, Che Guevara, চারু মজুমদার ইত্যাদি সকলেরই। যাঁরাই মাটি ছেনেছেন, অথবা ফোটা-কার্তুজের গন্ধ নিয়েছেন নাকে, তাঁদের সকলেরই ভক্ত আমি।

ভাল।

জিম করবেট মানুষখেকো চিতাটাকে এই সামনের পথের উপরেই মেরেছিলেন একটা ঝুপড়ি আমগাছের নীচে। কেউ কি বলতে পারবে জায়গাটা ঠিক কোথায় ?

কারও বলার দরকার নেই। একটা সাইনবোর্ড আছে। অখাদ্য ছবিও আছে একটা চিতাবাঘের। আর লেখা আছে যে এইখানেই দ্রুতপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাকে পটকে দিয়েছিলেন করবেট।

অখাদ্য বলছ কেন ? চিতা কি খাদ্য ?

না সে জন্যে নয়। কলকাতা হলে চিতার ছবিটা এমন হলুদ-রঙা খাটাশের মতন হত না অন্তত। কলকাতার দোষের শেষ নেই কিন্তু গুণও কিছু আছে। এটাও তো একটা Shrine। অথচ কী অযত্ন। আমার তো মনে হয় জিম করবেট এই অঙ্কন কর্মটা দেখার পরই ভারত ছেড়ে যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন।

চারণ বলল, তবুও বলব যে, জিম করবেট ভাগ্যবান।

কেন ?

চারণ শুধোল।

আমি এখানে আসার কিছুদিন আগে বিখ্যাত কবি শান্ত চট্টোপাধ্যায় কলকাতাতে মারা গেলেন। তাঁর শোকসভাতে বামপন্থী চিত্রী পরাণ পাধী তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলেন। সেই মস্ত ছবিটি সামনে রেখেই শোকসভা হল। কিন্তু কী বলব ! সেই ছবির সঙ্গে শান্তবাবুর উলটোদিকের বাড়ির উত্তমর্ণ গগন দাড়িপার চেহারার মিল ছিল কিন্তু তার নিজের চেহারার বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। তার ছেলেবেলার কৈশোরের বা যৌবনের চেহারারও নয়। তা আমি পরাণ পাধী মশায়কে ভাল করে চিনতাম। ওঁকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পাধীদা, এই ছবিটি শান্তবাবুর কোন বয়সের ছবি ?

পরাণ পাধী আমার দিকে ঘৃণা ভরে একটু তাকিয়ে বললেন, এটা "চিরকালীন শান্তর ছবি।"

কেন ?

চারণ বলল।

ছবিটা দেখে যদি মৃত ব্যক্তি বলে চেনাই না গেল তবে সেই ছবি দিয়ে শোকসভা করা হল কেন ? ফোটো দিয়েও তো করা যেত !

করা হল, কারণ পাধীদা আর আমাদের পাড়ার গেঁড়েদা "কখনওই" ভুল করেন না। করতে পারেনই না। তাঁদের একসপ্লানেশানেরও কোনওদিন ঘাটতি বা সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় বললে বলতে হয় "খামতি" হয় না। দে আর অলওয়েজ রাইট। এতএব রুদ্রপ্রয়াগের চিতার ওই "চিরকালীন" ছবিটিই তোমাকে মেনে নিতে হবে।

হুঁ।

চারণ বলল।

নাও শেষ কর।

পাটন আদেশ করল।

চারণ বড় এক ঢোঁক খেল।

বলল, আমি আস্তে আস্তেই খাই।

তা ভাল। মানে ধীর-স্থির হওয়াটা গুণেরই কথা কিন্তু তা বলে চিরকালীন শান্ত চ্যাটার্জির ছবির মতন ধীর হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বেশি আস্তে করতে গেলে অনেক সময়ে গা গরম করতে করতে বিবিই পাইল্যে যাবে।

www.MurchOna.com

উঃ পাটন !

আমি খুবই মুখ খারাপ করি, না চারণদা ?

পাটন বলল ।

চারণ চুপ করে রইল ।

পাটন বলল, আমি কিন্তু শুধু মুখই খারাপ করি । তোমার মতো খারাপ কাজ কিন্তু আমি কখনওই করতে পারব না ।

কি খারাপ কাজ ?

চারণ ভ্রূ কুঞ্চন করে তাকাল পাটনের দিকে ।

তারপর আবারও বলল, কি খারাপ কাজ ?

পাটন এবারে এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে বড় একটা, প্রায় পাতিয়ালা ঢালল ওর গ্লাসে । তারপর ছিপিটা বন্ধ করে চারণকে বলল, উ্য মে টেক ইওর ওন টাইম । বাট আই লাইক টু গাল্প ডাউন মাইন ।

চারণ বলল, বললে না কি খারাপ কাজ ?

পাটন তার সদ্য-ঢালা হুইস্কিতে একটি বড় চুমুক দিয়ে বলল, কিছু কথা থাকে চারণদা যা বাংলাতে, মানে মাতৃভাষাতে বলতে ভারী লজ্জা করে । বিশেষ করে কথাটা যখন, মাতৃসংক্রান্তই । মানে, নিজের মা সংক্রান্ত ।

কার মা ?

চারণ অবাক হয়ে বলল ।

আমার মা ।

পাটন বলল ।

কি বলছ তুমি, আমি বুঝতে পারছি না পাটন ।

পারবে । বললেই পারবে ।

স্থির, নিষ্কম্প গলাতে বলল পাটন ।

কি ?

চারণের জিভ জড়িয়ে গেল । হুইস্কির জন্যে না পাটনের চোখের দৃষ্টির জন্যে তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না ।

পাটন বলল, উ্য ফাকড মাই মাদার ।

চারণ সর্পদ্রংষ্টর মতন চমকে উঠল ।

পাটন বলল, ডিড নট উ্য ? চারণদা ?

চারণ চুপ করে রইল ।

পাটন বলল, বাখরাবাদে, কটকে আমার মামাবাড়িতে ? অবশ্য আমার মা চেয়েছিলেন । শী ওজ ডাইং ফর ইট । অ্যান আটারলি সেক্সস্টার্ভড লেডি । আমার হারামজাদা অর্থপিশাচ বাবার বয়স তখন বাহান্ন, মায়ের বত্রিশ, আর তোমার, কত হবে তখন ? তুমিই জানো । আমার বারো । আমি পাশের ঘরে তখন জেগেই ছিলাম ।

চারণের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল ।

পাটন গ্লাসটা শেষ করে বলল, ওকি ! তুমি শেষ করো চারণদা । চিয়ার্স ।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, আই থ্যাঙ্ক য়্যু অন বিহাফ অব মাই মাদার । মাই পুওর মাদার । একমাত্র তোমার কাছ থেকেই সেই মানুষটা যতটুকু আনন্দ পাবার তা পেয়েছিল জীবনে । শী ইজ ডেড অ্যান্ড গান । আমি ছাড়া এই কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে তোমাকে তেমন তো কেউই আর নেই । আমি, মানে আই অ্যাম ডিপলি গ্রেটফুল ট্যু উ্য চারণদা ফর হোয়াট উ্য গেভ হার ।

চারণ কিছু বলতে গেল । এ এক অন্য চারণ ।

তুতলে বলল, তোমার বাবা কি জানেন ? মানে জানতেন ?

www.MurchOna.com

না। তবে সন্দেহ করত। জানলে, মানে শিওর হলে, তোমার লাশ কবে পড়ে যেত। তুমি আমার বাবাকে চেনো না চারণদা, আমি চিনি। আই নো দ্যাট বাস্টার্ড।

চারণ-এর খালি-হওয়া গ্লাসে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে পাটন বলল, নাও, খাও।

চারণ বলল, মুখ নিচু করে, তোমার বাবা না জানতে পারেন, তুমি তো জানো পাটন। তুমি কি আমাকে শাস্তি দেবার জন্যেই এখানে নিয়ে এসেছ ?

তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, শাস্তি দেওয়ার জন্যে এতদূরে আনলে কেন ? দেবপ্রয়াগেই তো উপর থেকে নদীতে ঠেলে ফেলে দিতে পারতে।

হয়তো পারতাম। কিন্তু আমি তো শাস্তি দিতে আনিনি তোমাকে। পুরস্কার দিতেই এনেছি। ব্ল্যাক-ডগ এর বোতল তাহলে নিয়ে আসব কেন এখানে ?

পুরস্কার ?

স্তম্ভিত হয়ে বলল চারণ।

প্রিসাইসলি !

তারপরেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল পাটন ।

চারণের মনে হল ও এক উন্মাদের খপ্পরে পড়েছে। বড় ভয় করতে লাগল চারণের। অনেক এবং সব পুরনো কথাই মনে পড়ে যেতে লাগল একে একে।

চারণ পাটনের মুখের দিকে চেয়ে তাকে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

ওকি আজই খুন করবে চারণকে ?

পাটন, আবার হাসল। বলল, হুইস্কিটা কিন্তু ভাল। কি বল ? দাম করেছে অবশ্য একটু বেশিই। বারোশ পঞ্চাশ। বুট-লেগারের কাছ থেকে নিলে সাড়ে সাতশোতেই পাওয়া যেত। বাট জেনুইন স্টাফ। হাউ ক্যান আই বী আ মাইজার হোয়েন আই অ্যাম গিভিং আ ট্রিট টু দ্য গ্রেট ওয়ান হু ফাকড মাই মাদার ? এটুকু বলেই, আবার হাসল পাটন।

চারণের বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগল। ভীষণই কষ্ট। মুখটা নামিয়ে নিল ও।

পাটন বলল, তোমাকে জল মিশিয়ে দেব কি চারণদা ? না, নীটই খাও। উ্য নীড ইট নাউ। জীবনও এমন করেই খাবে। "Drink it to the lees" তলানি পর্যন্ত খাবে। Ulysses-এর মতন। জীবনে অথবা হুইস্কিতে জল মেশায় Half-wits রা।

তারপর বলল, দ্যাখো, দুজন প্রাপ্তবয়স্কর মধ্যে কোনও ঘটনা একদিন ঘটেছিল। একবার নয়, একাধিকবার। কয়েক বছর ধরে। তাতে মাইনর পাটনের কিছু বলার অধিকার অথবা প্রয়োজনও ছিল না। ইট মাইট হ্যাভ বীন এন এপিসোড অফ স্প্যারোজ। অর ফর দ্যাট ম্যাটার, অফ লায়নস। আই ক্যুড নট কেয়ার লেস। আমি আমার মাকে খুব ভালবাসতাম চারণদা। পরে, কলকাতাতে তুমি এলে, তুমি আমাদের বাড়ি, একবার এলে, তুমি মায়ের সঙ্গে শুলে, মা কতদিন যে কী আনন্দে থাকত, তা তুমি জানো না। দেখেই আমার ভাল লাগত খুব। বিশ্বাস কর তুমি। আই রিয়্যালি অ্যাম গ্রেটফুল ট্যু উ্য। সারাজীবনই কৃতজ্ঞ থাকব।

চারণ স্তম্ভিত হয়ে পাটনের মুখে চেয়েছিল।

পাটন বলল, কি হল ? এতদিনেও আমাকে চিনতে পারলে না চারণদা। আমি, আমি। আমি পাটন। আমি অন্য কেউই যে নই। আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জানতেই তো এসেছি এখানে চারণদা। আমি নিজেকে এখনও পুরোপুরি জানিনি। তবে মনে হচ্ছে, জানছি আস্তে আস্তে। তুমি জানবে না নিজেকে ? নিজের ভিতরের নিজেকে ?

চারণ পাটনের দিকে স্তব্ধ, মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল। লজ্জা করছিল খুব। অপরাধবোধে ভরে যাচ্ছিল, কিন্তু পাটন তাকে...

চারণের মাথার মধ্যে Walt Whitman কথা বলছিলেন।

"He puts things in their attitudes,

He puts to-day out of himself with plasticity and love.

www.MurchOna.com

He places his own times, reminiscenses, parents, brothers and sisters, associations, employment, politics, so that the rest never share them afterward, nor assume to command them."

ভাবছিল, আশ্চর্য ছেলে এই চারণ ! জিনস পরা, গাঁজা-গুলি-খাওয়া, মদ-খাওয়া "বকা-ছোকরা" হলেও ওই অনেক 'সন্ত'-এর চেয়ে বড় সন্ত। অনেক তপস্যালব্ধ ফলই ও হয়তো সঙ্গে করেই জন্মেছে, ঈশ্বরের দান হিসেবে। অনেক গায়ক-হতে-চাওয়া মানুষ যেমন দশজন শিক্ষক রেখেও, হারমনিয়ম ভেঙে ফেলেও গলাতে সুর লাগাতে পারেন না, টপ্পার দানা গজাতে পারেন না আবার অনেক আনপড়ও যখন স্বরগম বলেন তখন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শ্রোতার, স্বরবিদ্ধ হয়ে যান তৎক্ষণাৎ, এও বোধ হয় তেমনই কোনও দৈবী ঘটনা ! পাটন জন্ম-সাধক। সাধক হওয়ার জন্যে ওকে কোনও সাধনাই হয়তো করতে হত না। ভোলানন্দজি তাঁকে নিশ্চয়ই সম্যক বুঝেছেন। নইলে এই "বাঁদরকে" এত প্রশ্রয় দেন কেন ? ওঁর মতন মানুষ !

চারণ চুপ করে সামনের ছড়িয়ে-যাওয়া নীল সবুজ-জলের অলকানন্দা আর আকাশ-ছোঁওয়া শিবালিক পর্বতমালার কাছিম-পেঠা পাহাড়টির দিকে চেয়েছিল। পাটনও চুপ করেই ছিল।

বুকের মধ্যে যখন অনেক কথা টগবগ করে, উথলে-ওঠা ভাতের ফ্যান-এর মতন, তখন বোধ হয় মুখ, কারও মুখই, কোনও কথাই বলতে চায় না।

ঈগলটা উড়ছে, উড়ছে, উড়ছেই তার নিঃশব্দ ঘূর্ণায়মান ছায়াটিকে একবার নদীর জল আরেকবার পাহাড়ের রোমশ সবুজ গায়ে বুলিয়ে, বুলিয়ে, বুলিয়ে উড়ছে।

একটু পরে পাটন বলল, আরেকটা খাবে ?

চারণ নিরুত্তর রইল।

খাও, খাও। আধ বোতল রাখব রাতের জন্যে। কাল আমাকে খুব ভোরে উঠতে হবে তো। বদ্রীনাথের প্রথম বাস-এই আমি চলে যাব।

আর আমি ?

তুমি এখানে থাকবে।

মানে ? তাহলে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন ?

আমি থোড়াই এনেছি চারণদা। কে কাকে কোথায় আনে, কেই বা পাঠায় ? সবই Predestined।

অন্যসময় হলে চারণ বলত পাটনকে, সব ব্যাপারে তোমার এই ছদ্ম-দার্শনিকতা ভাল লাগে না। কিন্তু আজ আর সে কথা বলতে পারল না। পারল না, কারণ এই মুহূর্তে চারণের মতন এতখানি আর কেউই জানে না যে, পাটন ছদ্ম-দার্শনিক নয়।

পাটনই বলল, তুমি ভাগ্যবান মানুষ। বড় মাপের মানুষ। তুমি কোন দুঃখে যাবে কারও কাছে ? মহম্মদের কাছে পর্বতই হেঁটে আসবে।

ঠাট্টা করছ পাটন ?

ঠাট্টা ? তোমাকে ?

তারপর বলল, তুমি আমাকে একটুও বুঝতে পারোনি চারণদা। তুমিই আমার আইডল ছিলে প্রথম কৈশোর থেকে। তোমাকে আমি সত্যি অ্যাডমায়ার করি, করেছি চিরদিন। এবং বিশ্বাস করো, আজও করি। সকলের চোখ সমান নয়। আর কে যে কার মধ্যে কি দেখে তা শুধু সেই জানে। যেমন ভোলানন্দজি আমার মধ্যে দেখেছেন। নইলে হৃষীকেশ থেকে তোমাকে টেনে প্রথমে দেবপ্রয়াগে এবং পরে এখানে আনলাম কেন ? বলো ? আবার যেমন আমার মা তোমার মধ্যে দেখেছিলেন ! কে যে কার মধ্যে কী দেখে তা অন্যের পক্ষে বোঝা কি সম্ভব ?

চারণ চুপ করে চেয়ে রইল পাটনের চোখে।

তারপর বলল, তোমাকে আমারও কিছু বলার ছিল পাটন।

বলবে। তাড়া কি ? বিতর্কমূলক বিষয়ের চিঠি যেমন লেখার পরে দুতিনদিন ড্রয়ারে ফেলে

www.MurchOna.com

রাখতে হয়, বিতর্কমূলক কথাও জিভের গোড়াতে ধরে রাখতে হয়। জ্যা-মুক্ত তীর আর মুখ-মুক্ত কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর তো ফিরে আসে না। তাড়া কি চারণদা ? আমি ক্রিসমাস-এর আগেই ফিরে আসব।

হিন্দুদের ধর্মস্থান এই দেবভূমিতে বসে "ক্রিসমাস" শব্দটা কানে লাগল খট করে। অথচ কলকাতাতে কেউ ক্রিসমাস বললে একটুও বেমানান লাগত না।

ক্রিসমাসের আগে আমি নিজে কোথায় থাকব তার ঠিক কি ? তুমি খুঁজে পাবে কি করে ?

সব ঠিক আছে। মন যদি চায় তবে দেখা হবেই।

কী যে হেঁয়ালি কর সবসময়ে বুঝি না।

জীবনটাই তো হেঁয়ালি চারণদা। হেঁয়ালিটাই জীবন।

পাটন চেয়ার ছেড়ে উঠে কলিংবেল টিপল। একজন বেয়ারা প্রায় উড়ে এল বলতে গেলে চারতলাতে। বলল, বলিয়ে বাবু।

পাটন বলল, খানা বন গ্যয়া হোগা তো থোড়া বাদমে লেতে আনা। ঔর শুনো, ইয়ে সাবকা রোটি বহুতই হালকা ঔর কড়ক্ হোগা।

রোটি খাইয়েগা আপলোগোনে দোপেরহমে ?

চাউল ভি খায়েঙ্গে। রোটি স্রেফ দো-দোহি করকে লানা। ম্যানেজার সাবকি বাতানা যো বরাদি সব চিজে বেশক্ পেশ করনা। উরতকি ডালকি তড়কা বনা তো ? নেহি কোঈ দুসরি ডালকি ?

বলেই বলল, দহি হোগা ?

হানজি। হোগা জি !

তো দহিভি লেতে আনা।

চারণ বলল, হুইস্কির পরে দই ! আমার অম্বল হবে। আমি খাবো না।

সত্যি। এই বাঙালি জাতটাকে বাঘে বা কুমীরে বা আলস্যেও খেতে পারল না কিন্তু স্রেফ অম্বলেই খেল। সকালে উঠে একটা সিঙ্গাড়া আর দুটি জিলিপি খেয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলো, ব্যাস। সারাদিন আর খাবার খরচ নেই। অম্বলেই পেট ভর্তি হয়ে থাকবে। দেখো না, ভেক-ধরা সন্নিসীগুলো কেমন মুঠো-মুঠো জেলুসেল এম পি এস খায় ? আমি হলে কপি-রাইটারকে বলতাম, "আপ সাচমুচ সন্ত বননে চাহতা তো জেলুসেল এম পি এস ইস্তেমাল কিজিয়ে ! দুনিয়াকি সবসে পুণ দাঁবাইয়া।"

চারণ হাসল। কিন্তু কথা বলল না কোনও।

আজ পাটনেরই দিন, তারই ইনিংস। স্ট্রেইট ব্যাটে ব্লক করবে, না কাট করবে, না গ্ল্যান্স করবে না হুক করবে এ সমস্ত ওরই ডিসিশান। ওর একার। চারণ প্যাভিলিয়নে প্যাড পরে বসে আছে, বসে থাকবে, আর হাততালি দেবে।

পাটন বলল, দুপুরের আগে দই অমৃত। পরে বিষ। তবে থাক। নাই বা খেলে তুমি যদি ইচ্ছে না করে।

তারপর বেয়ারার দিকে ফিরে বলল, একহি লানা দহি।

জি হাঁ।

বেয়ারা চলে গেলে পাটন বলল, আমাদের অবস্থা যেন উপোসী ছারপোকার মতন। না খেয়ে খেয়ে যখন পেটের সাইজ ছোট হয়ে গেছে তখন হঠাৎ করে এরকম গাণ্ডে-পিণ্ডে "Cat-jumping rice" খাওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

CAT JUMPING RICE মানে কী ?

চারণ শুধোল।

মানে, থালাতে এই পরিমাণ ভাত থাকবে, পাহাড় প্রমাণ, যে বেড়ালও লাফ দিয়ে ডিঙ্গোতে পারবে না। তাকেই বলে Cat Jumping Rice।

চারণ হেসে ফেলল পাটনের কথা শুনে। হাসতে যে পারল, স্বাভাবিক মানুষের মতন, সেটা

www.MurchOna.com

উপলব্ধি করে খুশি হল খুব। অবচেতনে ভেবেছিল, ওর চোয়াল বুঝি চিরদিনেরই মতো বন্ধ করে দেবে পাটনের ওই কথা। হাসি তো দূরস্থান, কথা যে বলতে পারবে তাই সাহস করে ভাবতে পারেনি।

পাটন বলল, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি কিন্তু ঘুম লাগাব চারণদা। তুমি ইচ্ছে করলে জিম করবেট যেখানে চিতাটি মেরেছিলেন সে জায়গাটি এবং সেই দুর্দান্ত Art Workটি দেখে আসতে পারো। নইলে, হেঁটে নীচেও নেমে যেতে পারো অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখতে। সেই লোহার ঝুলোনো সেতু, যার কথা Man Eating Leopard of Rudraprayag-এ আছে, তুমি বলে ছিলে, তাও দেখে আসতে পারো। তবে দেবপ্রয়াগের মতন নয় এই সঙ্গম। দেখে মন ভরবে না।

বলেই বলল, সঙ্গম মানেই সুদৃশ্য। দেখাশুনোর তুমি আমার চেয়ে ভাল বুঝবে।

বলেই, এক কলি গেয়ে উঠল,

"তেরে মনকা গঙ্গা/আর মেরে মনকা যমুনা কা
বোল রাধে বোল/সঙ্গম হোগা কি নেহি/সঙ্গম হোগা কি নেহি ?"

উত্তর দিকটা, যে দিকে হবে বলে অনুমান করেছিল হাওয়াটা সম্ভবত সেদিক দিয়ে আসছিল না। যেদিকে গৌরীর ছাই মাখা, ত্রিশূল হাতে, বাঘছাল পরা সিদ্ধি-সেবন করা ভুঁড়িয়াল স্বামীর বাস সেই দিকটা চারণ রাতে যেদিকে মাথা দিয়ে শুনেছিল তার ঠিক কোন দিকে সে বিষয়ে চারণের কোনওই আন্দাজ ছিল না। তবে দিক তো মাত্র চারটি নয়। দশ দিক। শহরবাসী চারণেরা চারদিক ছাড়া অন্য কোনও দিকের খোঁজই রাখে না। মাথাটা তার যেদিকেই থাকুক না কেন, মনে হচ্ছিল দেওয়াল ফুটো করে বরফের কুঁচি থেকে উঠে আসা হাওয়া যেন মস্তিষ্কের অলিগলিতে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

গতরাতে বারান্দাতে বসে হুইস্কি খাবে বলেছিল পাটন। বারান্দাতে বসা আদৌ গেলে তো! ঘরের মধ্যেই বসে খেয়ে তারপর জমিয়ে খিচুড়ি খেয়েছিল বহুদিন পর। হোটেলের বাবুর্চি মুগ আর মসুর ডাল মিশিয়ে ঘি ঢেলে ভারী স্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিল। সঙ্গে আলুকা ভাত্তা, সেঁকা পাঁপর, কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ ভাজা। কলকাতার বাগবাজারের মতো পেঁয়াজি এরা বানাতে জানবে কোত্থেকে।

পাটন বলেছিল, এরা পেঁয়াজি মারতেও জানে না, পেঁয়াজি বানাতেও জানে না।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই পাটন বলেছিল, আমি খুব ভোরে উঠে চলে যাব। তুমি যতক্ষণ খুশি শুয়ে থেকো লেপের নীচে। তারপর ঘুম ভাঙলে বেল বাজালেই বেয়ারা চা নিয়ে আসবে।

বিল-এর কি হবে ? এরা কি কার্ড অ্যাকসেপ্ট করবে ? সিটিব্যাঙ্ক এবং গ্রিন্ডলেজ দুই কার্ডই আছে।

করবে। করবে। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ" বলে গেছিলেন চার্বাক। এইসব কার্ড-এর মাধ্যমে পুরো দেশের মানুষকে দেউলে বানিয়ে দেবে ওরা। আমার মা বলতেন, পকেটে পয়সা থাকলে খাবি, নইলে না খেয়ে থাকবি তাও ভাল। কখনও ধার করবি না কারও কাছে এক পয়সাও। আমার মা এই শিক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু স্বামী দেবতা শুধু ধার করা নয়, তোমার আমার মতন কত অগণ্য মানুষের কষ্টার্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স দেওয়ার পর যে টাকা থাকে তা ব্যাঙ্কের থেকে ধার নিয়ে মেরে দিল। চারদিকে যত বড়লোক দেখো না দিল্লি, বম্বে, বাঙ্গালোরে, জানবে তার একটা বড় অংশই ব্যাঙ্ক-মারা টাকাতে বড়লোক।

তারপর বলল, আমার মামা বাড়ির কাছেই, মানে বাখরাবাদেই (ও। তুমি তো গেছই। ভুলেই গেছিলাম) একজন বড়লোক ছিলেন সীতাকান্ত পারিদা। তিনি ব্যাঙের ঠ্যাং এক্সপোর্ট করেই বড়লোক হয়েছিলেন। আমরা ছেলেমানুষরা তাঁকে দুর থেকে দেখে বলতাম ব্যাঙ-মারা বড়লোক। তখন কি আর জানতাম যে ব্যাঙ-মারা বড়লোকেরা ব্যাঙ্ক-মারা বড়লোকদের চেয়ে কত ইনোসেন্ট!

সকালে ঘুম যখন ভাঙল চারণের তখন বন্ধ দরজার তলা দিয়ে একটু আলোর আভাস আসছিল, রাতে সেই ফাঁক দিয়েই হুড়মুড়িয়ে হাওয়া ঢুকছিল। দু-একটা বাস ও গাড়ির আওয়াজ আসছে

www.MurchOna.com

নীচের পথ দিয়ে। এদিকটা এমনিতে নির্জন। কটা বাজল কে জানে। জানার ইচ্ছেও নেই। ঘড়িটা স্যুটকেসের পেছনে বহুদিনই হল নির্বাসিত করেছে। আর সেই ঢাউস স্যুটকেসও তো পড়ে আছে হৃষীকেশেই। সময়ের কোনও দামই যার কাছে নেই সে সময় দিয়ে করবেই বা কি ?

লেপের তলা থেকে উঠতে উঠতে ভাবল, চারমাস পরে এত আরামে আবার গোবর হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। যা কিছু অর্জিত হয়েছিল এই ক-মাসে সবই গেল বোধহয়। এই পাটন ছেলেটির গূঢ় উদ্দেশ্যটা যে কি, তা কে বলবে ? কেনই বা নিয়ে এল এখানে আর কেনই বা তাকে ফেলে নিরুদ্দেশ হল।

বেলটা টিপে দিয়ে দরজার ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে বাথরুমে গেল। এক পট চা না খেলে মনে হচ্ছে বাইরে বেরোতে পারবে না, অথচ গতকাল সকালেও ভোলানাথজির গুহাতে ধুনির পাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ঘুম থেকে উঠে সূর্যস্তবের সঙ্গে বন্দিত নন্দিত স্পন্দিত নদী-পার থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে তারপরে পেতলের লোটাতে দুধের মধ্যে চায়ের পাতা আর চিনি ফেলে দিয়ে সকলের জন্যে চা করেছে। কোনওদিন পাটন, কোনওদিন স্টিভেন্স, কোনওদিন চারণ।

ভাবছিল যে, সুঅভ্যাস বা কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ছাড়াটা যত সোজা, ধরাটা তার চেয়ে অনেকই কঠিন। সত্যিই অনেকই কঠিন। যে পথ বেয়ে চলছিল গত চার মাস সেইপথে আবার ফিরে যেতে অনেকই কষ্ট হবে। পাটন কি এই ভাবেই শাস্তি দিল তাকে ?

দরজা খুলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বেয়ারা বলল, বারান্দামে আকর বৈঠিয়ে না বাবু। ধুপ ছা গ্যায়া হ্যায়। বৈঠ-কে গরম গরম চায়ে পীজিয়ে।

তাঁর বাঁদুরে টুপি, মাফলার এবং অন্যান্য শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়ে সে বারান্দায় এসে বসল যখন তখন তেপায়ার উপরে ট্রে, তার উপরে টি-কোজি মোড়া কেটলি এবং গরম জলে-ধোওয়া পেয়ালা পিরিচ এবং গরম-করা প্লেটে হাফ অ্যান্ড হাফ বিস্কিট সাজিয়ে দিল বেয়ারা।

চারণ দেখল, কেটলির পাশে একটি পুরু খাম। উপরে তার নাম লেখা। অপরিচিত হাতের লেখাতে।

এটা কি ?

চারণ শুধোল।

খত হ্যায় বাবু।

কি দিয়েছে ?

আপকি দোস্ত। উনোনেতো একদ্দম সুব্বেহি সুব্বে চল দিয়া বদ্রীবিশালজিকি তরফ। ইয়ে খত আপকি লিয়ে ছোড়কর গ্যায়ে। সুব্বেকি চায়েকি সাথই দেনে কি লিয়ে বোলকে গ্যয়া।

চারণ অনেকক্ষণ পাটনের হাতের লেখার দিকে চেয়ে রইল। চেনে না। দেখেনি তো কোনওদিন আগে। হাতের লেখা চেনে না, পাটনকেই কি চেনে ?

সকালের প্রথম কাপে চুমুক দিয়ে চিঠিটা একবার তুলে আবারও রেখে দিল। ভাবল, চা শেষ করে নিজের শরীরে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার করে তারপরই খুলবে এ চিঠি। কে জানে ! কি আছে এই চিঠিতে।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, চারণ ডেকে শুধোল, বিল-উল বানাকে রাখনা। নাহানেকো বাদ নাস্তা করকে ম্যায় দেবপ্রয়াগ চল দুঙ্গা।

বিল কওনচি কি বাবু ? উ বাবু ম্যানেজার সাবকো সব কহকে গ্যয়া। আপ আজ দিনভর হিয়াঁ আরাম কিজিয়েগা। কাল হৃষীকেশ সে আপকি লিয়ে গাড়ি আয়েগি।

হৃষীকেশ সে ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

জি হাঁ।

কাঁহা যানেকো লিয়ে ?

মুঝে ক্যা মালুম বাবু। সায়েদ উও খাতমে সব লিখকর গ্যায়া হোগা উনোনে। চায়ে লেনেকো

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

বাদ ইতমিনানসে পড়িয়ে উও খত। জলদি কওন চি কি ? সুরজত আব্‌ভি আব্‌ভি নিকলা। দিন বিলকুল নওজওয়ান হ্যায়।

বলেই, সেও ঘরে দাঁড়িয়ে দার্শনিকেরই মতন বলল, দিন ঔর রাতমে কিতনি ফরাক হোতা হ্যায়, নেহি বাবু ? কাল রাতমে, আপলোগ যব খিচুড়ি খা রহেতে তব ওহি পিপ্পলকে পেড়কে নীচে সে এক বাঘ চলা গ্যয়া নদীকে তরফ।

বাঘ ?

জি বাবু। বড়া বাঘ। চিতা-উতা নেহি।

আয়া কাঁহাসে ?

হোটেল কি পিচ্ছুসে উত্বারকে আয়া থা। আরে বাপ রে বাপ। কিতনা ডাবল বাঘ থা ?

তুম দিখা ক্যায়সে ?

গেটকে সামনা দো দো বড়কা বাত্তি না হ্যায় হুজৌর। রাত ভর জ্বলতা রহতা হ্যায়। হামলোগোঁভি সামকি বাদ কবভি বেগ্গর হ্যাজাক-ইয়া লানটান রাতমে নিকালতা নেহি না হ্যায়।

তারপর বলল, রাত মে কিতনা ডর, কিতনা কিসিমকি ডর। ঔর দেখিয়ে সুরজ নিকাল গিয়া। চারোতরফ কিতনা উজলা। কোই চিজ কি ডর নেহি, না বাহার কি, না অন্দর কি।

চায়ের কাপ হাতে ধরে চারণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পাটনের মা তুলি ঠিক এই কথাই বলেছিল তাকে বাঘমুণ্ডার বাংলোতে। একই কথা। কিন্তু, অন্যভাবে। অন্য পরিবেশে। অন্য প্রতিবেশে।

চিঠিটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে চারণ কাপটা ট্রেতে নামিয়ে রাখল। আরও চা ঢালবে। তবে, তার আগে সামনের কাছিমপেঠা পাহাড়টার দিকে তাকাল। সূর্য পাহাড়ের ওপারে আছে। পাহাড় টপকে ওপারে তার আলো পৌঁছতে বেলা দশটা এগারোটা হয়ে যাবে।

ঈগলটা তখনও উড়ছে। কালকের মতন।

ওটা কি ঈগল, না, শকুন ?

পরপর দু কাপ চা খাওয়ার পর চিঠিটা তুলে নিল হাতে। বেশ ভারী চিঠি।

ওঁ,

রুদ্রপ্রয়াগ

চারণদা,

তোমাকে কাল বলেছিলাম যে কিছু শব্দ থাকে যা বাংলায় উচ্চারণ না করে ইংরেজিতে করলে যে তা করে এবং যে শোনে দুজনের পক্ষেই সহনীয় হয়।

সেই বাক্যটিকেই একটু বিস্তার করে বলব যে, অনেক বাক্য থাকে, যা মুখে বলা যায় না কিন্তু লিখে বললে বলা সহজ হয়। অনেক সময়ে, অনেক কথা মুখে বলাই যায় না, অথচ লিখে বলা যায়।

গতকাল আমি যে শব্দটি উচ্চারণ করে তোমাকে স্তম্ভিত করেছিলাম তার SHOCK তুমি হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারোনি এখনও। কিন্তু তোমার SHOCKED হবার মতন কিছু তো আমি বলিনি।

তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড় অবশ্যই। কিন্তু এমন বড়ও নও যে তোমার আমার মধ্যে Communication অসম্ভব।

আমার জন্মদাতা বাবার সঙ্গে অগণ্য কারণে আমার পক্ষে কোনওরকম Communicationই সম্ভব নয়। তাই জীবনের কোনও ব্যাপারেই তার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই। রাখিনি। রাখবও না।

তুমি তোমার বর্তমান বয়সে পৌঁছে যা জেনেছ, আমার পক্ষে আমার বর্তমান বয়সে দাঁড়িয়ে তা পুরোপুরি বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। কারো পক্ষেই সম্ভব নয় তা। সম্ভব নয় যে, সেটা আমি বুঝি। জীবনের অধিকাংশ বোঝাবুঝিতেই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পৌঁছতে হয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে তোমাকে গতকাল যেমন গভীর দুঃখ দিয়েছি আজ তেমন গভীর আনন্দও দেব। তবে আনন্দের সঙ্গে আদেশও থাকবে আমার। হ্যাঁ। আদেশই বলছি। কারণ, আমার

www.MurchOna.com

ভূমিকা এখন ঋত্বিকের। এরপর যা বলছি, তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং যা বলছি তা অবশ্যই কোরো।

চোখের সামনে যে সব ঘটনা ঘটে, তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন, তার কোনও অভিঘাত যদি আমার উপরে না পড়ে, তবে বলতে হবে আমার সব শিক্ষাই বিফলে গেছে। সমতলভূমি যেমন আমার স্বদেশ, উত্তরাখণ্ডও তেমনই স্বদেশ। ভারতীয় পাহাড়িদের সমতলভূমির উপরে যতটুকু অধিকার, সমতলভূমির বাসিন্দাদেরও পাহাড় পর্বতাঞ্চলের উপরে ততটুকুই অধিকার। উত্তরাখণ্ডে বসে ঈশ্বর-চর্চা করছে বলেই যে কেউ উত্তরাখণ্ডের মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের হতাশার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না, তা আমি মনে করি না। তাছাড়া গ্রেট ব্রিটেইন-এর আইরিশরা যদি এত যুগ ধরে আয়ারল্যান্ডকে পৃথক রাজ্য বলে দাবি করে আসতে পারে, তবে কুমায়ুনি-গাড়োয়ালিদের দাবিকেই বা অস্বীকার করা হবে কেন? I.R.A.-র আন্দোলন যখন নাটক, নাচ আর গানের মাধ্যমেই শুধু তাদের দাবি পেশ করত সারা পৃথিবীর কাছে, তখন তো ইংল্যান্ডে কেউই তাদের পাত্তা দেয়নি। তাদের সিরিয়াসলি নেয়নি। যখন থেকে বোমা ছোঁড়া শুরু হয়েছে, নিরপরাধ মানুষদের মারা হয়েছে, শুধুমাত্র তখন থেকেই সেই দাবি একটি স্বীকৃতি পেয়েছে। তার আগে কি কেউ তাদের কথাতে কান দিয়েছিল? দার্জিলিং-এও যখন সুভাষ ঘিসিং আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তাঁকে নিয়ে সবাই হাসি-ঠাট্টা করেছে। কেউ কেউ বলতেন, যেমন, 'দ্য টেলিগ্রাফ' কাগজের সম্পাদক এম. জে. আকবর যে, "প্রেমের গল্প লেখা এক গুর্খা সাহিত্যিক পৃথক দার্জিলিং রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন।" যেন, প্রেমের গল্প লেখাটা পৃথিবীর জঘন্যতম পাপেরই একটি।

না, কেউই শোনেনি। অহিংসার পথ ছেড়ে যখন হিংসার পথে নামলেন আন্দোলনকারীরা তখনই প্রথমে তাঁদের কথাও প্রণিধানযোগ্য বলে গণ্য হতে শুরু হয়েছিল।

হিংসার পথই একমাত্র পথ চারণদা। পৃথিবীর কোথাওই কোনও কিছুই অর্জিত হয়নি অহিংসার দ্বারা আজ অবধি। হয়নি, কারণ মানুষের মতন জানোয়ার বিধাতা আর দ্বিতীয় সৃষ্টি করেননি! তারা শক্তের ভক্ত নরমের যম।

তোমাকে আমি লিখে দিতে পারি (যদিও সেই লেখা মিলিয়ে নেবার জন্যে সেদিন তুমি বেঁচে নাও থাকতে পারো) যে, নেলসন ম্যান্ডেলার আনা দক্ষিণ আফ্রিকার (গান্ধীজির আনা ভারতীয় স্বাধীনতারই মতন) স্বাধীনতার অবস্থা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ঠিক ভারতীয় স্বরাজেরই মতন হবে। অবশ্যই হবে।

একটা প্রকৃত স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে শুধু আবেগ থাকলেই চলে না। মেরুদণ্ড লাগে, সততা লাগে, স্থির লক্ষ্যের দরকার হয়। এবং যে-জনগণের সাহায্যে নেতারা গদিতে আসীন হন সেই জনগণের জন্যে প্রকৃত দরদ লাগে। কুম্ভীরাশ্রু ফেলা দরদ নয়। চরিত্রবান বলতে একাধিক পুরুষ বা নারী সঙ্গ না-করা মানুষী বা মানুষকে বোঝায় না। "চরিত্র" শব্দটির মানে কজন বোঝে বল? আমার বিচারে তুমি একজন পয়লা নম্বরী চরিত্রবান মানুষ। যদিও তুমি আমার মায়ের সঙ্গে সহবাস করেছ।

আচ্ছা এবারে এই শীতের জায়গায় সাতসকালে তোমাকে এমন out of the context দীর্ঘ বক্তৃতা করার কৈফিয়ত হিসেবে বলি যে, তাড়াতাড়ি চান করে টেরি বাগিয়ে তোমার সবচেয়ে Smart ঝিং-চ্যাক পোশাকটি পরে গায়ে সুগন্ধ মেখে "সম্ভ্রান্ত" তুমি তৈরি হয়ে নাও। ব্রেকফাস্টও করে নাও। ঠিক দশটায় চন্দ্রবদনী এসে তোমাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যাবে।

তুমি গতকাল বারান্দাতে বসে সামনের উঁচু কাছিম-পেঠা পাহাড়ের পিঠের উপরের যে গ্রাম দেখে যুগপৎ মোহিত এবং ভীত হয়েছিলে ওইটিই চন্দ্রবদনীদের গ্রাম। এক দিন এক রাত তুমি ওদের আতিথেয়তা স্বীকার করে নিও। তোমার খারাপ লাগবে না। চন্দ্রবদনীরও খারাপ লাগবে না যে, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

বুঝতেই পারো। তার সঙ্গে অনেক আগে থাকতে এই ষড়যন্ত্রটি না করে রাখলে তো তোমাকে গাড়োয়াল হিমালয়ের রুদ্রপ্রয়াগের এক গ্রামে থাকার সুযোগটি করে দেওয়া যেত না। ওদের বাড়ি

www.MurchOna.com

থাকলেই তুমি আমার উত্তরাখণ্ড-এর প্রীতির কারণ বুঝতে পারবে। চন্দ্রবদনীও তোমারই মতন সম্ভ্রান্ত বলেই তোমাকেই তার পছন্দ, এই চালচুলোহীন আমাকে নয়। ভাগ্যিস নয়! পছন্দ হলে, তাকে নিয়ে সমস্যাতে পড়তাম।

আবারও চন্দ্রবদনীর প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে কটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তাকে তো তোমাকেই দান করে গেলাম। চন্দ্রবদনীর যে অমাকে পছন্দ হল না, তার কারণ সংসারের নিরানব্বইভাগ মানুষেরই মতন Apparent-কেই ও real বলে ভেবে নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর (তখন অবশ্য চৌধুরাণী হননি!) একটি চিঠির কথা মনে এল। প্রমথ চৌধুরী, যাঁর ছদ্মনাম ছিল বীরবল অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। বাংলাও তো লিখতেন অতি চমৎকার। কাগজ সম্পাদনাও করেছেন, যে কাগজে রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষও লিখেছিলেন। তুমি হয়তো এসব জানোই।

যাই হোক, সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "True to oneself" হবার প্রধান বিপদ হচ্ছে অপর লোকে ভুল বোঝে। বহুরূপী মনে করে। একটিমাত্র "Pose" অবলম্বন করে সেইটেই আর পাঁচজনের চোখের সমুখে দিনরাত ধরে রাখতে পারলেই মানুষের চরিত্রটা সহজ সরল ঠেকে। অন্তত আমার মতো লোকের পক্ষে তাই।

আমাদের সরল নাম লাভ করতে হলে অসরল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজকাল দিন পড়েছে এমনি যে, আমাদের লোকে অযথারূপে মন্দ লোক মনে করলেও সহ্য হয় কিন্তু Hypocrite বলে মনে করলে কিছুতেই সহ্য হয় না। তবে আমাদের সকল চাঞ্চল্য, সকল চপলতার মধ্যেও একটি সুনির্দিষ্ট জিনিস অবশ্যই আছে সেটা ধরতে পারলেই আমাদের পুরোরকম ধরতে পারা যায়।"

আমারও মনে হয় চারণদা যে, চন্দ্রবদনী আমার মধ্যে 'সুনির্দিষ্ট জিনিস', মানে আমার "আসল আমি", সক্রেতিস যাকে বলেছিলেন "Me! Me! The real me" তাকে ধরতে পারেনি। পারেনি যে, সেটা ওর যেমন দুর্ভাগ্য, হয়তো আমারও। আবার অন্যভাবে বললে বলতে পারি, ভালই হয়েছে। "আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি।"

কী বলো তুমি?

আসলে আন্দোলনকারী ছেলেদের কয়েকজন নেতা যে শিগগিরি পুলিশের হাতে কাল খুন হবে সে কথা ভেবেই মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের সরকারের দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা আর নীচ স্বার্থপরতা এদের এই আন্দোলনকে এমন এক অগ্নিগর্ভ situation-এ ঠেলে দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার জানেও না যে, পরে কেন্দ্রকেই হাত কামড়াতে হবে।

মায়নামারের নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশপ্রেমী Aung Saan Suu Kyi কিছুদিন আগেই খুব একটা দামি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, "It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it. And fear of the scourage of power corrupts those who are subject to it."

এবারে শেষ করি।

আমায় এখন বেরোতেই হবে। আজ এখানেই শেষ করি। চন্দ্রবদনী এলেই তার কাছে সব জানতে পারবে।

খুশি তো? চারণদা, তুমি খুশি তো?

তুমি আমার মাকে এত খুশি করেছিলে! তোমাকে একটু খুশি করা কি আমার কর্তব্য নয়? আমার মা ছাড়া জন্মাবধি আমি আর কোনও নারীকেই ভালবাসিনি। কারও ভালবাসাও পাইনি এই স্বার্থমগ্ন দুনিয়াতে। এসব ব্যাপার তোমাকে যতখানি মানায় আমাকে ততখানি কখনওই নয়। তোমার প্রতিযোগী হতে চাইনি এই জন্যে যে, চন্দ্রবদনী জয় করা গাড়োয়াল হিমালয়ের সেই শৃঙ্গ জয় করার চেয়ে কিছু সহজ কাজ নয়। আর when defeat is unavoidable why not take it

www.MurchOna.com

philosophically?" তাছাড়া ভাবলাম যে, বাঁদরের গলায় কি মুক্তোর মালা আদৌ মানাত ?

সব শুভেচ্ছা রইল ।

—ইতি—পাটন

পুনশ্চ

চন্দ্রবদনীর সহোদরও (একমাত্র) এই আন্দোলনে জড়িয়ে আছে। ঠিক কতখানি যে জড়িয়েছে তা চন্দ্রবদনী জানেন না। আমিও সঠিক জানি না। তবে তুমি এ প্রসঙ্গে কোনও কথা নিজ থেকে উঠিও না। উনি আদৌ কিছু নাও জানতে পারেন !

চিঠিটা হাতে নিয়ে চারণ অনেকক্ষণ বসে থাকল। তারপর বেল বাজাল। বেয়ারা এলে বলল, ঠিক সাড়ে আটটাতে নাস্তা দিতে। যাতে ও চানটান করে তৈরি হয়ে নিতে পারে।

বড়ই অস্বস্তিতে ফেলে গেল পাটন ওকে।

ইচ্ছে করলে চারণ যে দশটা বাজার আগেই উপরের অথবা নীচের দিকে রওয়ানা হতে এখনও পারে না এমন নয়। কিন্তু হৃষীকেশে চন্দ্রবদনীর নাম শোনার পর থেকেই যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিল সেই অদেখা মানুষটির প্রতি সেই আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে গেছে দেবপ্রয়াগে তাকে দেখার পর এবং তার গান শোনার পর। তার নৈকট্য যে কী বয়ে আনবে তা জানে না চারণ। পৃথিবীর প্রতিটি নারীই কোনও মনস্ক পুরুষের কাছে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। most unpredictable! তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছে যে, তার প্রি-ম্যাচিওর বানপ্রস্থ এবার শেষ হতে চলেছে।

জয়িতাকে চারণ ভালবেসেছিল, কিন্তু সেই অনুভূতি যে, ঠিক যাকে প্রেম বলে, তা নয়, তা ও চন্দ্রবদনীকে প্রথমবার দেখা মাত্রই বুঝতে পেরেছিল। ও যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল। সর্পদংষ্ট। চন্দ্রবদনীর ব্যক্তিত্ব তাকে বিবশ করেছিল। ঠিক ওই ধরনের অনুভূতি এর আগে অন্য কোনও নারীকে দেখেই হয়নি ওর। বড়ই কষ্ট পেয়েছে ও পাচ্ছে সেইক্ষণ থেকে, অথচ কারওকেই বলতে পারেনি।

তুলির সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল অবশ্যই। মানে, চারণের মায়ের সঙ্গে। কিন্তু সেই সম্পর্কে তুলির দিক দিয়ে মন যতখানি নিমগ্ন ছিল চারণের দিক দিয়ে শরীর থাকলেও, মন ততখানি ছিল না। চারণের জীবনে তুলিই প্রথম এবং আজ অবধি শেষ নারী যার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল।

জয়িতা তার শরীরের লোভ দেখিয়ে ওর কাছ থেকে অনেক কিছুই বাগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু বদলে দেয়নি কিছুই। না শরীর, না মন। জয়িতার মানসিকতা যেমন ছিল, তেমন বোধহয় দেহোপজীবিনীদেরই হয়। শেষোক্তদের না জেনেই এ কথা মনে হয়েছে ওর। জানলে, তুলনা করতে পারত সঠিক ভাবে। উঁচুমহলের ইংরেজি-ফুটোনো জয়িতাদের মতন মেয়েদের চেয়ে সাধারণ, গরিব প্রস্টিট্যুটেরাও সম্ভবত ভাল। তাদের মধ্যেও ভান-ভণ্ডামি থাকলেও লেনদেন সম্বন্ধে কোনও ভণ্ডামি থাকে না হয়তো। মনে হয়।

বেয়ারা এলে, তাকে ব্রেকফাস্টের কথা বলে বাথরুমে গিয়ে, গিজারটার সুইচ টিপে দিল। ঠিক করল, ভাল করে চান করবে আজ বহুদিন পরে।

চান করে প্রাতরাশ সেরেও ঘড়িতে দেখল যে, চন্দ্রবদনীর আসতে এখনও দেড় ঘন্টা দেরি আছে। এই মধ্যান্তরের ভার তখন থেকেই তাকে ভারী করে তুলল। কী করবে তা ঠিক করে উঠতে পারল না। তারপর সিদ্ধান্ত নিল পাটনকে একটা চিঠিই লেখে। চন্দ্রবদনীর সঙ্গে সে কোন চক্রান্ত করে রেখেছে তা সেই জানে। তাই চন্দ্রবদনীর আসার পরে চিঠি লেখার সময় পাবে কি না তা অজানা।

বেল বাজিয়ে কাগজ চাইল। একটি বলপেন সঙ্গে তখনও ছিল সভ্যতার শেষ যোগসূত্র হিসেবে

যে ছেলেটি ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল সেই প্যাড নিয়ে এল। কিন্তু তখুনি চিঠি লেখা আর হল না। মানুষ, চারণকে চিরদিনই পুঁথির চেয়ে অনেকই বেশি আকৃষ্ট করেছে। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশে যেমন করে ও সেই স্থানের নাড়ি বোঝে, তেমন দশটি বই পড়েও কখনওই বোঝা সম্ভব নয় বলেই ও হেসেছে।

www.MurchOna.com

তোমার নাম কি ভাই ?

অমিতাভ ।

বচ্চন নয় তো ?

হেসে সে বলল, উনিশ-কুড়ি বছরের এক গাড়োয়ালি ছেলে, ভারি মিষ্টি হাসি ।

বলল, তা নয়, তবে আমার মা অমিতাভ বচ্চনের খুব ভক্ত তাই নাম দিয়েছিল অমিতাভ । অমিতাভ বচ্চন কোড়োরো কোড়োরো পতি আর আমি রুদ্রপ্রয়াগের এই হোটেলের খিদমদগার ।

তোমার দেশ কোথায় ? এখানেই ?

না । উত্তরকাশীতে ।

ও । ভূমিকম্পে তোমাদের বাড়ির ক্ষতি হয়েছিল ?

হয়নি ! সেই জন্যেই তো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এই নোকরিতে ঢুকেছি । বাড়িটা নতুন করে করতে হবে । সব ফেটেফুটে গেছে । শীতে ভারী কষ্ট । আর শীত তো এসেই গেছে । এবারে আমাকেও ফিরে যেতে হবে । ট্যুরিস্ট সিজনও শেষ হয়ে গেল ।

ট্যুরিস্ট সিজন-এ বকশিস তো ভালই পাও ।

বকশিসই তো সার । মাইনে যা, তা লোককে বলতে লজ্জা করে ।

তাই ?

হ্যাঁ । অধিকাংশ হোটেলেই তাই । আমাদের আসল রোজগার তো বকশিসই ।

তোমাদের মতো অল্পবয়সীদের সকলের নামই কি এমন আধুনিক ?

আধুনিক মানে ?

মানে, এই অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীবকুমার, রাকেশ···

অমিতাভ হেসে ফেলে বলল, প্রায় তাই । উত্তরের বরফি হাওয়া থেকে বাঁচা সহজ কিন্তু যুগের হাওয়া সব উড়িয়ে নিয়ে যায় ।

সব মানে ?

মানে, এই যাকে আপনারা ইংরেজিতে বলেন, ট্র্যাডিশন ।

বাঃ । তুমি তো ইংরেজি জানো বেশ ।

আমি পড়তাম তো শ্রীনগরের কলেজে ।

তাই ?

কি পড়তে ?

ইংরেজি নিয়ে পড়তাম । ইচ্ছে ছিল দিল্লিতে গিয়ে ইংরেজিতে এম এ করব । কিন্তু পাস করেই বা কি হবে । চাকরি কই ?

চাকরিই যে করতে হবে তার মানে কি ?

ক্যাপিটাল ছাড়া তো ব্যবসা হয় না ।

ভুল কথা । ইচ্ছে থাকলেই হয় । ব্যবসা মানেই যদি ভাব প্রথম দিন থেকেই এয়ারকন্ডিশানড অফিস, সুন্দরী সেক্রেটারি, পাঁচ লক্ষ টাকা ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল, সেটা ভুল । আমি অনেক কোটিপতিকে জানি যারা সৎপথে অতি ছোট্ট ব্যবসা থেকে অমন হয়েছেন । কি কাকে বেচা যায় আর কোথা থেকে কত কম দামে সেই জিনিস যোগাড় করা যায়, এইটা যদি একবার বুঝে ফেলতে পার তবেই ব্যবসাদার হয়ে উঠবে । তুমি যাই দেবে, খদ্দের তাই মাথায় করে কিনে নিয়ে যাবে ।

মাথায় করে মানে ?

মানে, আদর করে । বাংলাতে আমরা যাকে বলি, শিরোধার্য করে ।

খদ্দের এসে চাইবে আম আর তুমি তাকে দেবে তেঁতুল । খদ্দের কি জানবে তার আসলে কোন জিনিসটি দরকার ! বিক্রেতা হয়ে তুমি যদি খদ্দেরের স্বার্থ তার নিজের চেয়েও ভাল বুঝতে পারো, সে তুমি মোমফুলিই বেচো আর নারাঙ্গি, তুমিও একদিন কোড়োরোপতি হবেই হবে ।

দেখা যাক । ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ-ই জানে !

www.MurchOna.com

বলল, অমিতাভ।

তোমার বাবার নাম কি ? মানে, তোমাদের বাবা মায়েদের সময়ে ওঁদের কী রকম নাম রাখতেন তোমাদের নানা-দাদারা ?

অমিতাভ হাসল।

বলল, আপ তো অজীব অজীব কোশ্চেন পুছ রহা হ্যায় সাব।

জি। ম্যায় এক অজীব আদমিভি হুঁ। ইস লিয়ে।

বাবা-মায়েদের নাম হত এইরকম, বাবাদের ধরুন জবারু, গেন্দা, ছিপাড়া এইরকম আর কী !

মায়েদের ?

কুশলা, মুর্তি, এই···

গাড়োয়ালে কি অনেক জাত ?

অনেক না হলেও, আছে কিছু।

কী রকম ? নাম বল না কয়েকটা ?

এই ধরুন, নেগি, পাঁওয়ার। পাঁওয়ার তেহরিতে বেশি পাবেন।

মানে ? তেহরি গাড়োয়াল তো ?

জি হাঁ।

চারণের মনে পড়ে গেল, কুঞ্জাপুরী থেকে দেখেছিল ঘোরানো পার্বত্য পথে বাস চলেছে তেহরি গাড়োয়ালের দিকে।

ভাবছিল পাটন, সত্যি। আমাদের দেশটা কত বড়। কত বিচিত্র। ইউরোপে তিন-চারটি দেশ পেরিয়ে যাওয়া যায় সকালে বেরিয়ে বিকেলে। আমাদের দেশে একটি জেলা একদিনে পেরুনো যায় না। বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, হল্যান্ড, কতটুকুটুকু সব দেশ। জার্মানিই বা কতটুকু ? অথচ সে সব দেশ মানুষদের দেশ বলে তাদের কী দাপট ! জনসংখ্যা দিয়ে দেশের মহত্ত্ব বা বিরাটত্ব নিরূপিত হয় না, মানুষের উপাদান দিয়ে হয়, জাতের গুণ দিয়ে হয়। আমাদের দেশ নিয়ে কীই না করতে পারতাম আমরা। অথচ পঞ্চাশটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। পাটন ঠিকই বলে। একটা হেস্তনেস্ত করার সময় এসেছে। করলে ঐ পাটনেরাই করবে একদিন।

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে চারণ অমিতাভকে জিগ্যেস করল, আর কি জাত বললে না ?

শর্মা আছে। তারা পণ্ডিত। ভরদ্বাজ।

আর ?

শেমোয়াল আছে। রাওয়াল, মানে, পুরোহিত। বদ্রীনাথের রাওয়ালদের বাড়ি দেবপ্রয়াগে। চন্দ্রবদনীজি তাঁদের রিস্তাদার।

তুমি চন্দ্রবদনীকে চেনো না কি ?

চিনব না ? তাঁর বাবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে···

তোমার তখন জন্ম হয়েছিল ?

অমিতাভ হেসে ফেলল। বলল, শুনেছি তো সব। আমাদের গাড়োয়াল রেজিমেন্ট বাহাদুর। তবে চন্দ্রবদনীজির বাবা অন্য রেজিমেন্টে ছিলেন। আপনি জানেন না, রমেশ সিপ্পি চন্দ্রবদনীজিকে তাঁর ছবির নায়িকা করতে চেয়েছিলেন।

তারপর ?

বহিনজি করলে তো। উনি কি দুগগি-তিগগি না কি ?

ওয়াহ্ ! ওয়াহ্ !

চারণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তোমাদের এই গাড়োয়ালে কি কি ফসল ফলাও তোমরা অমিতাভ ?

অনেকইরকম।

যেমন ?

www.MurchOna.com

যেমন মক্কী ? 'মক্কীকা রোটি আর শুর্ষকা শাগ'-এর কথা পাঞ্জাবি ধাবাওয়ালাদের দৌলতে ঢেরই শুনেছেন ! নিশ্চয়ই। সেই মক্কী। মানে মকাই।

তা শুনেছি।

মক্কী ছাড়া গেঁহু হয়। জও হয়।

জ টা কি জিনিস ?

একরকমের ধান। পুজোতে লাগে। চাল হয় দু-রকম। সাট্টি এবং ঝঙ্গোরা। কোদুকা হয়।

সেটা কি জিনিস ?

গেঁহুরই মতন। আটা হয় তা থেকে।

আর।

শর্ষে, পালং, মুলি, ঘেণ্ডা মুলি, খাম আলু।

আর ফলের মধ্যে ?

নারাঙ্গি, ছোট ছোট হয়, সান্তরা বড়। আর মাল্টাও হয় আরও বড়। তাছাড়া, যোশিমারী আলু হয়। নিম্বু হয় দুরকমের ছোট ও বড়। চাকোতরাও হয়।

চাকোতরাটা কি জিনিস ?

বাঙালিরা বলে বাতাবী নেবু।

হাসল চারণ, অমিতাভর মুখে শ্যামবাজারি "নেবু" শুনে।

তোমাদের এই পাহাড় জঙ্গলে নানারকম জানোয়ার, পাখি আছে, পড়েছি, জিম করবেট সাহেবের বইয়ে। তবু তুমি যদি নিজমুখে বল তো মিলিয়ে নিই।

নীচে হাতি আছে। দেখেছেন তো রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে। অন্যান্য জায়গাতেও আছে। বড় বাঘ, চিতা, ভালু, বিরাট বিরাট হিমালয়ান ভালু, বুকে সাদা 'V' চিহ্ন থাকে তাদের। ভালু এমনিতে নিরামিশাষী কিন্তু হিমালয়ান ভালুকেরা আমিষও খায়। কাকার আছে। ঘুরাল। হনুমান। পাখির মধ্যে ঈগল, নানারকম। দাঁড়কাক কুচকুচে কালো। কবুতর, মুরগী, ময়ূর, চুকোর, খালিজ ফেজেন্টেস, বুলবুলি আরও কত পাখি। অত কি আমি জানি !

বাঃ। তবু তো অনেকই জানো। আমাদের দেশে বহুত মানুষ আছেন, ভারী ভারী ডিগ্রিওয়ালা মানুষ, যাঁদের ডিগ্রি পাকানো থাকে আলমারির ড্রয়ারে, তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করো এটা কি গাছ ? তো ওঁরা বলবেন গাছ। এটা কি পাখি ? পাখি। এটা কি নদী ? নদী। এটা কি ফুল ? ফুল। এমনকি তুমি যদি তাঁর বউকে দেখিয়ে বল ইনি কে ? মানে, এঁর নাম কি ? উনি বলবেন, বউ।

অমিতাভ খিলখিল করে হেসে উঠল। ভারী মজা পেয়েছে ও চারণের কথা শুনে।

বলল, আপ বহুতই মনমৌজি আদমি হেঁ সাহাব। মনমৌজি কথাটার মানে অমিতাভ ঠিক জানে না। তবে তাতে চারণের প্রশস্তির রকম বোঝানোর সুবিধাতে কোনও হেরফের হল না।

অমিতাভ বলল, অব ম্যায় চলে সাহাব। ম্যায় হিঁয়া রহনেসে আপ খাত নেহি লিখ পায়েঙ্গে।

অমিতাভ সত্যিই চলে গেল।

পাটনকে চিঠিটি লিখতে বসলে এখন এত অল্প সময়ে শেষ করা যাবে না। কারণ, সে যে সব কথা বলে গেল সেই সব সম্বন্ধে চারণ সম্পূর্ণ একমত নয়।

একমত কেন হওয়া সম্ভব হল না পুরোপুরি ওর পক্ষে, তা বুঝিয়ে বলতে গেলে সময় এবং মনোযোগেরও দরকার। কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রবদনীর এসে পড়ার কথা। তা যদি আসে, তবে চিঠিটি মিছিমিছি আরম্ভ করে আধাখেঁচড়া করে রেখে দিতে হবে।

চিঠির ব্যাপারে চারণ চিরদিনই অত্যন্ত মনোযোগী। চিঠি যখন লেখে কারওকেই, তখন মনে করে যে, যাকে লিখছে তিনি বা সে যেন তার সামনেই বসে আছেন। তাঁর বা তার সেই মুহূর্তের বেশভূষা, মানসিকতা, সেই সময়ের আবহাওয়া, চিঠির প্রাপকের পরিবেশ, প্রতিবেশ সব কিছু সম্বন্ধেই একটা ধারণা অথবা উর্দুতে যাকে বলে 'আন্দাজ' তাই করে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। চিঠির প্রাপকের মুখে-চোখে চারণের চিঠির প্রতিটা লাইন কীরকম অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে তাও যেন

www.MurchOna.com

চারণ কল্পনা করতে পারে। গান তো গায়কের একলার নয়! গান যতখানি গায়কের, ঠিক ততখানি শ্রোতারও। একটুও কম বা বেশি নয়। চিঠি যে লেখে, আর চিঠি যে পায়, তাদের বেলাও এই একই কথা প্রযোজ্য।

চারণের মনে পড়ে গেল পাটনের মা তুলির চিঠির কথা। তুলি বয়সে চারণের সমবয়সী অথবা ছোটও হতে পারে। হয়তো ছোটই ছিল। মেয়েদের বয়স তো জিগ্যেস করা যায় না। আগে অন্তত যেত না। যখন মেয়েরা যথেষ্ট মেয়েলি ছিল এবং সেই মেয়েলিপনাতে পুরুষেরা আকৃষ্ট হত এবং মেয়েরা তাদের মেয়েলিপনার কারণে নিজেরাও বিব্রত হত না। মেয়েরা মেয়েলি হবে অথবা পুরুষ পুরুষেরই মতন। তাই তো উচিত। তাই এতে দুপক্ষের কোনও পক্ষেরই বিব্রত হবার কি কারণ একালে কী সেকালে তা চারণ কোনওদিনও বুঝে উঠতে পারেনি। মেয়েদের মধ্যে পুরুষ পৌরুষ প্রত্যাশা করে না শুধু তাই নয়, পছন্দও করে না, যেমন মেয়েরা করে না পুরুষের মধ্যে মেয়েলিপনা। এই সত্য সম্বন্ধে চারণের কোনওই সন্দেহ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

ছোট্ট এবং সুন্দর চিঠি লিখত তুলি।

মেয়েরা সাধারণত চিঠি লেখার ব্যাপারে খুবই সাবধানী হয়। বিশেষ করে এদেশের মেয়েরা। 'শতং বদঃ না লিখঃ" এই লিখন তারা সর্বদাই মেনে চলে। পুরুষ মাত্রই, যদি সে ধূর্ত, ধাউড় বা ভণ্ড না হয়, স্বভাবতই অসাবধানী, অগোছালো তার অবিভ্যক্তি এবং মনোভাবে। অবশ্য ব্যতিক্রমী পুরুষও থাকেন।

তুলির প্রথম চিঠিটির কথা মনে আছে চারণের। আতর-মাখানো ফিকে-হলুদ-রঙা সিল্ক-এর একটি স্কার্ফ-এর মধ্যে তুলির চিঠিগুলো জড়িয়ে রেখে দিয়েছে সে তার ড্রয়ারে। পাটনের অমানুষ বাবা, যিনি হয়তো কোনওদিনও তার মন বা শরীরকে কোনও আয়নার সামনেই দাঁড়িয়ে কখনওই দেখেননি, এই চিঠিগুলোর কথা জানলে চারণকে গুণ্ডা দিয়ে খুন করাতেও হয়তো বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

চারণের এই দোষ। উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীরই মতন ছড়িয়ে যাওয়া। যদি একে দোষ বলা যায়।

এই সব ভাবতে ভাবতে চান সেরে নিল চারণ।

চারণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে অমিতাভ দৌড়ে এল চারতলাতে। বলল, চন্দ্রবদনীজি আ পঁউছি হ্যায়। উনকি হিঁয়াই লায়েগা স্যার কী আপ উতরকে আইয়েগা নীচে?

চারণ বলল, না না। আমিই যাচ্ছি।

বলেই, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে নীচে তাকাল ঝুঁকে। কারওকেই দেখা গেল না। চারণ ভাবল, নিশ্চয়ই পোর্টিকোর নীচে আছে সে, অথবা বসার ঘরে বসেছে গিয়ে।

অমিতাভকে ব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে যেতে বলবে কি বলবে না, বুঝতে পারল না। রাতটাও কি চন্দ্রবদনীদের বাড়িতেই কাটাতে হবে? না শুধু "Day spend" করারই নেমন্তন্ন? পাটনের চক্রান্তর চক্করের প্রকারটি যে ঠিক কী রকম তাতো চারণের জানা নেই।

নীচে নেমে, বসার ঘরে উঁকি মেরে দেখল চারণ যে, সেখানেও সে নেই। বাইরে বেরিয়ে পোর্টিকোর নীচে গিয়ে দেখল, নাঃ। সেখানেও নয়।

এদিকে ওদিকে চেয়ে অবশেষে দেখতে পেল যে, একটি তরুণ হর্স-চেস্টনাট গাছের নীচে চন্দ্রবদনী দাঁড়িয়ে বাগানের শোভা দেখছে। ডান পাশ থেকে তাকে দেখল চারণ। একটি ফলসা-রঙা তাঞ্চোই সিল্ক-এর শাড়ি। তার গাঢ় বেগুনি পাড়। সাদা-রঙা ব্লাউজ। তার গলাতে ফলসা-রঙা লেসের কুঁচির কাজ করা। মুক্তোর মালা গলাতে। মুক্তোর ছোট দুটি দুল, কানের সঙ্গে লেপটে আছে। বাঁ হাতটি খালি। ডান হাতে সাদা ব্যান্ডের সাদা ডায়ালের হাত ঘড়ি। সকালের রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। চান করে এসেছে। চুলে তেল দিয়েছে। চামেলির গন্ধ বেরুচ্ছে। হয়তো চামেলির তেলই দিয়েছে। ঘন কালো ভিজে চুল এর মধ্যে তার সাদা সিঁথিটা, সে যে কতখানি ফর্সা তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। মুখে অন্য কোনও প্রসাধন নেই। সুস্নাত শরীর থেকে সুগন্ধ

www.MurchOna.com

উড়ছে। মেয়েরা শরীরের নানা অদৃশ্য স্থানে নানা সুগন্ধি মাখে। সে সবের কথা চারণের জানার কথা নয়। কিন্তু চন্দ্রবদনীর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল যে, বাহ্যিক কোনও সুগন্ধির বা প্রসাধনের কোনও প্রয়োজন হয় না চন্দ্রবদনীর। তার শরীরই সুগন্ধি। মুখেও প্রখর ব্যক্তিত্ব আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও প্রসাধন নেই।

চন্দ্রবদনী হাত জোড় করে বলল, নমস্কার।

নমস্কার।

চারণ বলল।

কেমন লাগছে আমাদের রুদ্রপ্রয়াগ ?

এসে অবধি যে-টঙে চড়িয়েছিল পাটনচন্দ্র তা থেকে তো আর নামিইনি। জায়গাটির ভালত্ব বা মন্দত্ব সম্বন্ধে কিছু যে বলব, তার উপায় কি ? এমনকি করবেট সাহেব রুদ্রপ্রয়াগের কুখ্যাত মানুষখেকো চিতাটা কোথায় মেরেছিলেন সে জায়গাটা পর্যন্ত দেখা হল না।

দেখিয়ে দেব পরে। করবেট সাহেব আমার ঠাকুর্দাকে চিনতেন। আমাদের বাড়িতেও এসেছেন কয়েকবার। যদিও উনি বয়সে আমার ঠাকুরদার চেয়ে অনেকই বড় ছিলেন।

তাই ? তবে তো আপনাদের বাড়ি আমার কাছে এই কারণেই এক তীর্থ।

কেন ? আপনি ভক্তি করেন বুঝি ওঁকে খুব ?

করব না। শিকারী বলেই নয়, মানুষ হিসেবে ভক্তি করি, দেশপ্রেমী হিসেবে ভক্তি করি, সাহিত্যিক হিসেবে ভক্তি করি।

সাহিত্যিক হিসেবে ?

নিশ্চয়ই। আপনি পড়েননি ওঁর লেখা ?

না তো।

ঈসস। এই জন্যেই বলে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

তারপর চারণ বলল, এখুনি কি যেতে হবে ?

যেমন আপনার খুশি।

স্যুটকেসটা কি নামিয়ে আনাবে ওপর থেকে ?

তা আনালেই ভাল। কারণ আমাদের বাড়িতে এমন কোনও পুরুষ নেই যাঁর জামাকাপড় আপনার গায়ে হতে পারে। আর যদি চেঞ্জ না করে চলে তবে...

রাতে কি আপনাদের ওখানেই থাকতে হবে ? না এখানে এসে শোব ?

সে কী ! পাটন বলেনি আপনাকে ?

কি ?

যে, আজ আপনি আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। কাল ভোরে আমরা চলে যাব পউরিতে। পউরিতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আপনি ফিরে যাবেন দেবপ্রয়াগে।

তাই ?

তাই মানে ? আপনি জানতেন না ? নাকি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ?

না। তা নয়। মানে আমাকে কিছুই বলেনি তো পাটন।

বলেনি ? আশ্চর্য তো !

সে যাই হোক। ও যা ঠিক করেছে তাই হবে। প্রথমবারেই বুড়ি-ছোঁয়ার মতন বদ্রীনাথ কেদারনাথ দেখে ফেললে এ জীবনে আর এই গাড়োয়ালে আসাই হবে না। আমারও মন বলছিল যে, দেবপ্রয়াগেই ফিরে যাই।

চন্দ্রবদনী বলল, অবশ্য দেবপ্রয়াগে যেতে আপনাকে পউরি থেকে নেমে আসতে হবে আবার শ্রীনগরে।

তা তো হবেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে চারণ বলল, একটা কথা ভাবছিলাম।

www.MurchOna.com

কি ?

আপনার মতো শিক্ষিতা, স্থানীয় নারীরও কি এসকর্ট এর দরকার ? এতটুকু পথ যেতে ?

সামান্য অপ্রতিভ হল চন্দ্রবদনী ।

একটু ভেবে বলল, আমার ? একদমই না ! বরং আপনাকেই আমি এসকর্ট করে নিয়ে যেতে পারি যেখানে যাবেন ।

তাই তো !

চারণ বলল, আমি তো তাই ভেবেছিলাম । আমি...

কিন্তু পাটন আশঙ্কা করছে আগামীকাল কোনও গোলমাল হতে পারে ।

চন্দ্রবদনী বলল ।

কোথায় ?

উত্তরাখণ্ড-এর সব জায়গাতেই ।

কেন ?

তা বলেনি । কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না যে, পাটনের সঙ্গে আমার ভাই চুকোর-এর অনেকদিনের বন্ধুত্ব । সেও থাকত স্টেটস-এ । ও এখানে ফিরে আসে উত্তরাখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার স্বপ্ন নিয়ে । আমাদের পরিবারের অনেকেই হয় আর্মিতে নয় এয়ারফোর্সে । সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই । আমরা, বলতে পারেন, "ফৌজি" পরিবার । তাই কেতাবী পড়াশুনো তার ভাল লাগেনি । তাকেও, বোধহয় Family Bug-এ কামড়েছিল । সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একদিন এখানে ফিরে এল । ফিরে আসার মাস ছয়েক পরে পাটনের সঙ্গে এই রুদ্রপ্রয়াগ বাজারেই তার দেখা, একেবারেই অকস্মাৎ । তারপর পুনর্মিলন । চুকোর এখন রুদ্রপ্রয়াগে নেই । কোথায় আছে, সে খবরও জানি না । তবে আছে এই আদিগন্ত পর্বতমালার কোথাও না কোথাও । কিন্তু চুকোর যেখানেই থাকুক তার সঙ্গে পাটনের একটা গোপন যোগসূত্র যে আছে তা বুঝতে পারি । তবে ওইটুকুই । বুঝতেই পারি । বুঝতে পারার চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারি না ।

তারপর বলল, ইফ উ্য ফিল দ্যাট আই অ্যাম অ্যান আনওয়ান্টেড কোম্পানি তাহলে আমি একাই যাব ।

কী যে বলেন ! এ তো আমার সৌভাগ্য । আপনাকে দেবপ্রয়াগে দেখার পর থেকে...জানি না কী বলব । সামনা-সামনি আমি কথা গুছিয়ে বলতে পারি না । ভাল তো বলতে পারিই না । তাই কিছু না বলাই ভাল ।

তাহলে কী ভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন ?

তাও জানি না । বোধহয় চিঠিতে একটু একটু পারি । তবে বলার মতন কথা না জমে উঠলে বা বলার মতন কেউ না থাকলে ।

চন্দ্রবদনী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ ।

তারপর বলল, চলুন । আমরা চলতে চলতে কথা বলি । অনেক উপরে উঠতে হবে কিন্তু । বেশ অনেকটা পথ । এতখানি উঁচুতে অন্যত্র উঠলে অনেকই পুণ্যার্জনও করতে পারতেন, কিন্তু এখানে পুণ্যর সম্ভাবনা কম । তবে এটুকু বলতে পারি যে, পাপও নেই ।

আমার স্যুটকেস কি হবে ?

আপনি এখুনি তো আর চেঞ্জ করছেন না । আমার সঙ্গে দুজনে এসেছে বাড়ি থেকে । তারা বাজার করছে এখন । বাজার করা সেরে তারা স্যুটকেস বয়ে নিয়ে যাবে । কাল সকাল সাতটাতে গাড়ি এসে আমাদের তুলে নেবে । আজই সন্ধের আগে এসে যাবে রুদ্রপ্রয়াগে । সে গাড়িতেই আমরা যাব কাল ।

কোথা থেকে আসবে গাড়ি ?

হৃষীকেশ থেকে । আপনারই তো ঠিক করা গাড়ি ।

চারণ একটু থতমত খেয়ে বলল, ও, হ্যাঁ, তাই তো । ভুলেই গেছিলাম ।

www.MurchOna.com

বলেই বুঝতে পারল, পাটন এখানেও এক তিড়ি মেরেছে। Pulled a fast one on him।

চন্দ্রবদনী বলল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি পড়েছেন কি ?

চারণ একটু অবাক হল। প্রথমত স্থানটি রুদ্রপ্রয়াগ। দ্বিতীয়ত প্রশ্নকর্ত্রী চন্দ্রবদনী। তৃতীয়ত এই গাড়োয়াল হিমালয়ে বসে একেবারে পদ্মা নদীতে নেমে যাওয়াটা, শারীরিকভাবে না হলেও, মানসিকভাবে একটু কঠিন বলে মনে হল।

মানিকবাবু তো মুক্তিকেই বাস্তবায়িত করেছেন হোসেন মিঞার মধ্যে। করেন নি কি ? হোসেন মিঞার মতো এমন একটি চরিত্র বিশ্বসাহিত্যেই দুর্লভ।

হুঁ। সুদূরের পিয়াসী।

চারণ বলল।

চন্দ্রবদনীর মুখ চোখ, ভোরের প্রথম সূর্যের আলো চন্দ্রবদনী গিরিশৃঙ্গর উপরে পড়লে যেমন তা ঝিকমিকিয়ে ওঠে, তেমনই যেন ঝিকমিকিয়ে উঠল। বলল, ঈসস। আপনি জর্জ দাদুর কথা মনে করিয়ে দিলেন।

কে জর্জ দাদু ?

জর্জ বিশ্বাস।

তাই ?

হ্যাঁ। আমি তখনও পাঠভবনেও ভর্তি হইনি। মা গেছিলেন পৌষ উৎসবে, শান্তিনিকেতনে। বাবারও তখন ছুটি ছিল। বাবাও গেছিলেন। জর্জ দাদু খালি গলাতে সকালবেলা গানটি গেয়েছিলেন মেলাতে।

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি।"

"সুদূর বিপুল সুদূর !" এই শব্দকটি যে আট বছরের একটি মেয়ের বুকে কী সুরই বাজিয়ে দিয়েছিল, তাকে কোন চিরযাত্রীর অদৃশ্য বেশে সাজিয়ে দিয়েছিল তা কী বলব। আমার মধ্যে ঐ তিনটি শব্দের অনুরণন আজও থামেনি। আর জর্জ দাদু কীভাবে যে গাইতেন। কীভাবে শব্দ কটি উচ্চারণ করেছিলেন তা ভাষাতে বোঝানো যায় না। "ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও বাঁশরি—মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি"।

চারণ চুপ করে ছিল।

চন্দ্রবদনী বলল, সেই ছেলেবেলা থেকে আমার মনে "সদুর বিপুল সুদূর"-এর একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করবেন না হয়তো বললে, আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম ভালবেসে তিনি এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট ছিলেন। ওঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ হয়েছিল আমার, আমি ওকে জিগ্যেস করেছিলাম যে আপনারা তো মুহূর্তর মধ্যে কত দূরে চলে যান, হাওয়ার বেগ, শব্দের বেগ এসব আপনাদের কাছে তুচ্ছ কিন্তু "সুদূর বিপুল সুদূরের" মানে আমাকে বোঝাতে পারেন ?

উত্তরে উনি কী বলেছিলেন ?

বলেছিলেন, মানে, উনি তো বাংলা বুঝতেন না। ইংরেজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। তবুও উনি খুব উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছিলেন Oh! Its great. The very idea is great. Yes! To go beyond and beyond and beyond is our job. We churn around the blue space. The eternal space or you may as well say, we are churned by eternal space. "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি/মোর ডানা নেই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি" ওটি ইংরেজিতে তর্জমা করে শোনাতেই তিনি সত্যিসত্যি একেবারে thrilled। বললেন, বাঁশরির মানে তো বুঝলাম, পাশরিটা কি ব্যাপার ?

চারণ বলল, আমিও কিন্তু জানি না।

চন্দ্রবদনী পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, ঠাট্টা করছেন।

চারণ বলল, সত্যিই জানি না। গানটা কতবার শুনেছি অথচ এই পাশরি শব্দটির মানে জানার

www.MurchOna.com

ইচ্ছে হয়নি কখনও এমন করে। বাঁশরির সঙ্গে পাশরি মিলে গেছে, কানে মধুর ঠেকেছে, এই অবধি।

চন্দ্রবদনী বলল, পাশরি মানে, ভুলে যাওয়া। পাসরন থেকে পাসরি। সেখান থেকে বানান ভেদে বা আর্ষ-প্রয়োগে পাশরি।

বাঃ!

চারণ বলল, আপনি কত জানেন!

হাসাবেন না, প্লিজ। চড়াইতে ওঠার সময় হাসলে আমার পেটে ব্যথা হয়।

অবাক কাণ্ড।

চারণ বলল।

তারপর বলল, আসলে পদ্মনদীর মাঝির হোসেন মিঞার সাধনাইতো ছিল সেই অজানাকে জানার। যেখানে eternal surging water churns him, churns the space around him or to say it in the other way round, he churns the water and the space.

চারণ চুপ করে রইল। চন্দ্রবদনীর নাম তাকে মজিয়েছিল হৃষীকেশ-এ। তার গান মজিয়েছিল দেবপ্রয়াগে। আর তার ব্যক্তিত্ব, তার মেধার ঔজ্জ্বল্য মুগ্ধ করল রুদ্রপ্রয়াগে।

ও ভাবছিল, সত্যিই এই দেবভূমিতে এসে যেন দেবী দর্শনই হল।

চন্দ্রবদনী বলল, আপনি Kunt Humsun-এর "Growth of the Soil" উপন্যাসটি পড়েছেন?

হুঁ।

পদ্মানদীর মাঝির সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে না? হোসেন মিঞার চরিত্রের সঙ্গে...

এমন সময়ে বাজারের দিক থেকে, দুজন হাট্টা-কাট্টা গাড়োয়ালি, হোটেলের অমিতাভর মতন নয়, এসে, গাড়োয়ালিতে চন্দ্রবদনীর সঙ্গে কী সব কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলে হোটেলের দিকে চলে গেল। একজনের কাঁধে একটি বড় থলে।

চন্দ্রবদনী বলল, চলুন এবারে বড় রাস্তা ছেড়ে আমাদের পাথরে বাঁধানো পাকদণ্ডী ধরে উঠতে হবে। কষ্ট হবে যদিও আপনার। তবে—

তবে কি?

দুপাশের দৃশ্যে মন ভরে যাবে, চোখ প্রফুল্ল হবে।

বাঃ।

এবারে আমরা পিচ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ঝুলন্ত-পুল পেরোব পায়ে হেঁটে। চলুন।

এই পথই গেছে বদ্রীনারায়ণ?

হ্যাঁ।

অলকানন্দা যে পথে এসেছে উপর থেকে সে দিকেই গেছে বদ্রীনাথের পথ। আর মন্দাকিনীর পাশ দিয়ে গেছে কেদারনাথের পথ। সামনেই কিছুটা গেলে দুই নদীর সঙ্গম। সেখানে এক বিরাট পাথর আছে। তার নাম নারদ শিলা। নারদ মুনি নাকি সেখানে বসে বীণা বাজাতেন।

আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

চারণ বলল।

করতে ক্ষতি কি? যিশুখ্রিস্ট বেথেলহম-এর কোন খামারবাড়িতে জন্মেছিলেন, মহম্মদ হাতেমতাই-এর উপরে কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, বকর-ঈদ-এর ইতিহাস কি? তা যদি বিশ্বাস করি, লেনিন বা স্টালিনের দাড়িতে কটি চুল ছিল তাও যদি গুনে রাখতে পারি, তাহলে হিন্দুদের দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনীই বা কেন অবিশ্বাস করতে যাব?

তারপরে চন্দ্রবদনী বলল, এবারে তো মোটে একটি রাতই থাকবেন এখানে। কাল ভোরেই তো চলে যাব আমরা। তাই এবারে হবে না। কিন্তু পরের বার এলে আপনাকে কোটিশ্বর শিবের গুহাতে নিয়ে যাব।

সেটা কোথায়? তাছাড়া আমি তো কোনও মন্দির টন্দিরের ভিতরে যাই না। কোনও দেব-দেবী

www.MurchOna.com

মানি না আমি। তবে ঈশ্বর নামক কোনও অদৃশ্য কিন্তু অনুভূত শক্তি যে আছে তা মানি। হয়তো আমি মূর্খ বলেই। অবশ্যই মানি।

গোয়াতে গিয়ে আপনি পর্তুগিজদের গির্জা দেখেননি? ইহুদিদের সিনাগগ? প্যারিসে গিয়ে নৎরদাম গির্জা? লানডানের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি? তাহলে হিন্দুদের মন্দির এবং দেবদেবীদের উপরেই আপনার এই বিশেষ বিদ্বেষের বা তাচ্ছিল্যের কারণ কি? আর বিদ্বেষ এবং তাচ্ছিল্যই যদি থাকবে তাহলে দেবপ্রয়াগেই বা এতদিন কি করছিলেন? হৃষীকেশে? আপনি একটি প্যারাডক্স।

হাসি-হাসি মুখে যদিও বলল চন্দ্রবদনী কথাগুলি, কিন্তু চারণ বুঝতে পারল যে কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ অবশ্যই জড়িত ছিল।

চারণ হেসে ব্যাপারটাকে লঘু করে বলল, বিদ্বেষ বলব না, বলা উচিত উদাসীনতা। এ বিষয়ে পরে কখনও বিশদ আলোচনা করা যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা দিয়েই আপনাকে আমার বক্তব্য বোঝাতে পারব আশা করি। তবে এখন কোটিশ্বর শিব-এর মন্দিরের কথাই বলুন শুনি।

রুদ্রপ্রয়াগ শহর ছাড়িয়ে, যদি একে শহর আদৌ বলা চলে, চোপড়া বলে একটা জায়গার পথ ধরে মিনিট পনেরোও হাঁটতে হবে না। তারপর অলকানন্দার পাড় ধরে অনেকখানি নীচে নামতে হবে নদীর দিকে।

তারপর?

কোনও জনমানব নেই। শুধুই জলের শব্দ। পাখির ডাক। জলের উপরে রোদ পড়ে ভিবজোর এর খেলা। সেখানেই সেই অনেক পুরনো শিবমন্দির। পাহাড়ের গায়ের গুহার মধ্যে অগণ্য শিবলিঙ্গ। কেউ তৈরি করেনি। মানে, কোনও মানুষে। প্রকৃতিই নিজে হাতে গড়েছেন। প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গর রং আলাদা আলাদা। অলকানন্দার জল সমস্তক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে ভিজিয়ে দিচ্ছে সেই শিবলিঙ্গগুলিকে। সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপ শিখার আলোতেই দর্শন করতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষদের কাছে এই মন্দির অত্যন্তই পবিত্র। সবসময়েই খালি পায়েই ঢুকতে হয় সেখানে।

চারণ চুপ করে শুনল চন্দ্রবদনীর কথা।

কথা বলতে বলতে ওরা পাথরে-বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বেশ অনেকটা উপরে চলে এসেছে। পেছন ফিরে এবং বাঁদিকে চেয়ে দেখলে অলকানন্দার রূপ যেন ক্রমশই আরও খুলছে বলে মনে হয়। দূরত্ব সবসময়েই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং হয়তো রহস্যময়তাও ধার দেয়, মানুষ এবং প্রকৃতিকেও।

ভাবছিল, চারণ।

চারণ বলল, রুদ্রপ্রয়াগবাসীরা কোটিশ্বরের গুহার অগণ্য শিবলিঙ্গদের পুজো করেন এমন ভক্তিভরে দেবতাজ্ঞানে, আর যে মানুষ-দেবতাটি রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাবাঘটিকে মেরে, তাঁদের বাঁচিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, তাঁকে কি একেবারেই ভুলে গেছেন এখানের বাসিন্দারা? তখন তো অন্য কোনও দেবতাই বাঁচাতে পারেননি সেই বাঘের পেটে যাওয়া প্রায় দেড়শ জন হতভাগ্য মানুষকে।

আদৌ নয়।

চন্দ্রবদনী বলল।

তারপর বলল, রুদ্রপ্রয়াগের মানুষেরা অকৃতজ্ঞ নয়। সেই চিতাবাঘকে জিম করবেট সাহেব মেরেছিলেন "গুলাবরায় চট্টির" কাছেই, সেই বাঘেরই নখরাঘাতের চিহ্নবাহী "পণ্ডিত"-এর বাড়ির অদূরের একটি আমগাছে, রাতে বসে। সেদিন দুখের রাত পোহাল, নতুন দিন এল, স্বস্তির দিন, সুখের দিন। সে দিনটি ছিল দোসরা মে। উনিশশ ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ। তারপরের বছর থেকে প্রতিবছরই দোসরা মে তারিখে মানুষখেকো যেখানে মারা পড়েছিল সেখানে এক মেলা বসে। তার নামই করবেট মেলা। সেই মেলাতে, রুদ্রপ্রয়াগের চিতাবাঘ-এর হাতে নিহত হওয়া প্রতিটি নারী ও পুরুষের উত্তরসূরীরা প্রতিবছর যোগ দিতে আসেন দূরদূরান্ত থেকে। তা তারা এখন যেখানেই

www.MurchOna.com

থাকুক না কেন! পুরনো দিনের মানুষদের কাছে তো বটেই এবং তাঁদের মুখে গল্প-শোনা মাঝবয়সীদের কাছেও জিম করবেট সাহেবও তো এক দেবতাই। কুমায়ুঁ ও গাড়োয়াল কখনওই ভুলবে না তাঁকে।

চারণ বলল, বাঃ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি তো! দাঁড়ান, দাঁড়ান! একটু। পেছন ফিরে একটু দেখি ভাল করে।

দেখুন!

বলে, চন্দ্রবদনী মুখ না-ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে রইল। গ্রীবা একটু ডানদিকে হেলানো। কয়েকটি অলক আলতো হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। তার গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ, চারধারের গাছ-গাছালির গন্ধ, ওক, হর্সচেস্টনাট, তোন, তাড় আরও কত নাম না জানা গাছের গন্ধর সঙ্গে কলুষহীন দেবভূমির এই একশভাগ পবিত্র পরিবেশের মধ্যে ফলসা-রঙা শাড়ি-পরা চন্দ্রবদনীর দিকে তাকিয়ে চারণের হঠাৎই তুলির কথা মনে হল। তুলি দাঁড়িয়ে আছে বাঘমুণ্ডার হাতিগির্জা পাহাড়ের পথের একটা সমকৌণিক বাঁকে। তার পরনেও ফলসা-রঙা শাড়ি ছিল।

তুলি বলেছিল, চ্যাটার্জি সাহেব, ওই যে দেখুন। ওই যে বড় বড় কালো পাথরগুলো দেখছেন, ওইখানেই হাতিরা সব প্রার্থনা করতে আসে। তাইতো এই পাহাড়ের নাম হাতিগির্জা।

মনকে রুদ্রপ্রয়াগে ফিরিয়ে এনে চারণ বলল, আপনি পেছনে চেয়ে দেখবেন না একবার?

না।

কেন?

আমি পেছনে তাকাই না কখনও। কী জীবনে, কী পথে!

কেন? অমন ধনুকভাঙা পণ কেন?

পেছনে তাকালেই মানুষ পেছিয়ে পড়ে। সে কী কী অর্জন করেছে বা হারিয়েছে সেই সব ভাবনাতে মেদুর হয়ে যায় তার স্মৃতি। সেই মুহূর্তে, সেই দিনে তার আর নতুন কিছু করা হয় না। সামনে এগোনো হয় না। তাই...

বাঃ। মান্য যুক্তি। অবশ্যই!

চারণ বলল।

ও দেখছিল, তুলির চেয়ে চন্দ্রবদনী অনেক লম্বা। শারীরিক উচ্চতাতে তো বটেই, হয়তো মানসিক উচ্চতাতেও। সে যে এই তুষারাবৃত হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ চন্দ্রবদনী! তার মতন হবার সাধ্য আছে আর কার? সেই মুহূর্তে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নীচের আশ্চর্য সুন্দর নীলচে-সবজে-সাদা অলকানন্দার জলরাশি আর তার বিচিত্র রঙা সব নুড়িময়, বালুময় চরের দিকে চেয়ে চারণের মন তুলির স্মৃতি এবং চন্দ্রবদনীর উপস্থিতিতে আপ্লুত হয়ে উঠল।

নারীরা পুরুষের জীবনের কত বড় শূন্যতা যে পূরণ করেন, তা যদি সব নারীই জানতেন! চন্দ্রবদনীও কি জানে!

ভাবছিল, চারণ।

এখানে বসি?

বলেই, একটি বড় সাদা পাথরের চাঁঙড় দেখাল চন্দ্রবদনীকে চারণ।

যেখানে আপনার খুশি। তবে এই পাথরটার উপরেই একটা মস্ত বড় বাঘ বসে থাকত জ্যোৎস্না রাতে, গরমের দিনে, আমি যখন ছোট ছিলাম। আমাদের শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত। মা দেখাতেন, মনে আছে।

তারপর বলল, বসলেনই যখন, তখন আমিও আপনার পাশে বসি।

না, না। পাশে নয়, পাশে নয়।

চারণ বলে উঠল।

কেন? পাশ কি কারওকে ইজারা দিয়ে রেখেছেন?

না, তা নয়। পাশে থাকলে ভাল করে দেখা যায় না যে কারওকেই।

www.MurchOna.com

অদ্ভুত কথা। স্বামী-স্ত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, চিরদিন তো পাশাপাশিই থেকেছেন।

তা থেকেছেন। পাশাপাশি থাকলে অন্যদের পক্ষে তাদের দেখতে সুবিধা অবশ্যই হয়, কিন্তু তাদের দুজনের একে অপরকে দেখতে সুবিধা হয় কি আদৌ ?

চন্দ্রবদনী হেসে ফেলল।

বলল, সত্যিই তো ! কথাটা তো কখনও ভেবে দেখিনি। আপনার দেখার চোখ খুব ভাল।

আমার চোখের দেখাও ভাল।

আপনি তো চুকোরের মতন বললেন।

চুকোর ?

হ্যাঁ। আমার ভাই।

কি বলে সে ?

সে বলে, দ্যাখ দিদি। আমাকে তুই হেলা করিস না। একদিন দেখতে পাবি এই চুকোর শর্মাই গাড়োয়ালের সর্বকালীন সেরা লেখক বলে সারা ভারতবর্ষে গণ্য হবে।

ও লেখে বুঝি ?

কী করে না ও। গদ্য লেখে। গান গায়। ছবি আঁকে। বাঁশি বাজায়। চুকোর আমাদের গ্রামেরই শুধু নয়, এই পুরো তল্লাটের সবচেয়ে এলিজিবল ব্যাচেলর।

তা, তার সঙ্গে দেখার চোখ আর চোখের দেখার কি সম্পর্ক ?

চারণ জিজ্ঞেস করল।

না, এ কথা বলার কারণ, চুকোরের হাতের লেখা অসম্ভব খারাপ। তা নিয়ে চিরদিনই সকলেরই কাছেই ও গালমন্দ খেয়ে এসেছে। অন্যদের কিছু বলতে পারে না। যা বলার তা ওর একমাত্র দিদিকেই বলে।

কি বলে ?

বলে, হাতের লেখা কার কেমন সেটা টোটালি ইরেলিভেন্ট দিদি। কার লেখার হাত কেমন সেটাই আসল কথা। কত মূর্খ আমি দেখেছি এযাবৎ যাদের হাতের লেখা মুক্তোর মতন। আরও কত মূর্খ দেখেছি, যাদের ব্যাকরণের জ্ঞানও অসীম। যাদের হাতের লেখা ভাল তারা ইচ্ছে করলেই ভাল পোস্টার বা সাইনবোর্ড লিখিয়ে হতে পারে। আর যাদের ব্যাকরণের জ্ঞান গভীর তারাও ইচ্ছে করলে শ্রীনগরের বা নিদেনপক্ষে যোশীমঠের স্কুলের ব্যাকরণের মাস্টারমশায় হতে পারে। তাদের সঙ্গে একজন লেখকের তফাৎ আছে। লেখক যে, যেমন আমি, সে চেষ্টা করলে তার হাতের লেখা ভালও করে ফেলতে পারে কিন্তু পোস্টার বা সাইন-বোর্ড লিখিয়ে বা বৈয়াকরণ কস্মিনকালেও ইচ্ছে করলেই লেখক হয়ে উঠতে পারে না। লেখক হতে হলে উপরওয়ালার আশীর্বাদ লাগে। কেউ কেউ লেখক হয়েই জন্মায় রে দিদি আমার মতন। চেষ্টা করে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, রাজনৈতিক নেতা হওয়া যায়, কিন্তু চেষ্টা করে লেখক বা কবি কখনওই হওয়া যায় না।

ঠিকই তো বলেছে চুকোর।

চারণ বলল।

তারপরই বলল, চুকোর তো একরকমের পাখি, না ? চকোরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি ?

চন্দ্রবদনী হেসে ফেলল বলল, আপনি দেখছি পাটনের চেয়েও ছেলেমানুষ। চকোর-চকোরী তো জলের পাখি। হাঁস, একরকমের। আর আপনার চুকোর একরকমের Patridge।

Patridge মানে ?

সমতলভূমির তিতিরও Patridge Family-রই। আমাদের চুকোর সমতলের কালি তিত্বর, রঙ্গিলা তিত্বরেরই মতন। ওই প্রজাতিরই পাখি।

দেখতে কেমন ?

কী বলব ! ছাই-ছাই- গোলাপি-গোলাপি- খয়েরি-খয়েরি। লেজের শেষদিকটা চেস্টনাট রঙের। মাথার দুপাশে কালো দাগ আছে। দাগটা দুপাশেই ঘাড় অবধি নেমে গেছে। পেটের ও পিঠের

www.MurchOna.com

পাশও কালো কালো স্ট্রাইপ। মাথার দুপাশ ও ঘাড় বেয়ে যে কালো দাগ নেমেছে তা বুকের কাছে পৌঁছে জোড় লেগে যাওয়াতে ব্রেসলেট-এর মতন দেখায়।

বাঃ।

এই Patridge, হিমালয়ের এই সব অঞ্চলেই পাওয়া যায়। কুমায়ুনেও। এর নামের উচ্চারণ কিন্তু চুকোর নয়, চুকার। ইংরেজি নামও তাই। ''Chukar''

ভাইয়ের নাম চুকার রাখলেন কে ?

আমিই। বাবা ওর নাম রেখেছিলেন বদ্রীপ্রসাদ। মানে, বদ্রীনাথজির প্রসাদ আর কী। মা রেখেছিলেন আমার নাম, তাই ভাইয়ের নামের ব্যাপারটা বাবাকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমিই স্কুল-লিভিং-সার্টিফিকেট পরীক্ষার আগে ওর নাম বদলে চুকার করে দিই। ওর ভীষণই আপত্তি ছিল বাবার দেওয়া নামে। বাবা জানতে পেরে রাগ করাতে, ও বলেছিল, বাবার নাম থোড়াই বদলেছি। বদলেছি তো নিজেরই নাম।

বাবা ওর কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন।

চুকার বলত, বদ্রীনাথজির ছায়াতেই তো থাকি আমরা। নামের মধ্যেও তাঁকে না জড়ালে কি চলে না !

তা এত নাম থাকতে চুকারই বা কেন ? পাখির নামে নাম কেন ?

চারণ বলল।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, কারণ একটা ছিল অবশ্য। ভাই যখন ছোট ছিল ও ডাকত ঠিক মদ্দা চুকার-এর মতন।

মানে ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

মানে, চুকার যখন ডাকে, আপনাদের সমতলের তিতিরেরই মতন।

তিতিরের ডাক কেমন ?

আমি শুনিনি কখনও।

আঃ আপনাদের নিয়ে পারা যায় না। কলকাতার ইট-কংক্রিটের কীট আপনারা। এইসব পাহাড়ের নীচে নামলেই বটেই, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশে, তিতিরে তিতিরে ছয়লাপ। তিতির ডাকে চিঁহা চিঁহা চিঁহা চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে। বাবা যখন দেরাদুনে পোস্টেড ছিলেন তখন আমাদের বাংলোর হাতার মধ্যেই যে কত তিতির ছিল কী বলব। সকাল সন্ধেতে তাদের ডাকে মাথা গরম হয়ে যেত। একসঙ্গে এবং খুব ঘনঘন সমান গতিতে অনেকবার ডাকে তিতিরেরই মতন চুকারও। মদ্দা চুকার তো ডাকে বার কুড়ি, একবার ডাকতে শুরু করলে, ভাইও ডাকত দিদি ! দিদি ! দিদি ! দিদি ! দিদি ! অথবা, মা ! মা ! মা ! মা ! মা ! মা !

চারণ হেসে ফেলে বলল, তাই ?

হ্যাঁ। তাই চুকার।

চন্দ্রবদনী বলল।

তারপরেই উদাস হয়ে গিয়ে বলল, কী যে হবে ভাইটার আমার। ভীষণ জেদি, একরোখা অথচ ভাবালু, আদর্শপরায়ণ। ওর মতন ছেলের এই সময়ে, এই দেশে বেঁচে থাকাই মুশকিল।

চারণ বলল, ওর মতন অনেক ছেলেরই তো দরকার এই মুহূর্তে আমাদের দেশে।

চন্দ্রবদনী উদাস হয়ে গেল। তারপরে চুপ করে চেয়ে রইল নীচের অলকানন্দার দিকে।

ওর শাড়ি সরে গেছিল বুকের পাশ থেকে। চারণের অসভ্য চোখ দেখল, বেগুনি ব্লাউজে-ঢাকা বগলতলি ঘামে ভিজে গেছে। সেদিকে হঠাৎই চোখের ঝলক পড়তেই হঠাৎই এক তীব্র কামভাবে জর্জরিত হল চারণ। পরক্ষণেই লজ্জা পেল। পুরুষমাত্রই কি অসভ্য ? নিজেই নিজেকে নিরুচ্চারে বকে দিল খুব করে। বলল, ও ও ও দুষ্টু ছেলে ? একী অসভ্যতা ! ভীষণ শাস্তি দেব। নিজেকে বকল, যেমন করে চারণের মা ওকে বকতেন। ভাবল, দুমাস সাধুসঙ্গে থেকে উন্নতির এই রকম !

www.MurchOna.com

এক সময় চন্দ্রবদনী বলল, চলুন এবারে ওঠা যাক।

চারণ বলল, চলুন।

বেশ অনেকটা উঠে এসেছে ওরা। এখন উপরে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রবদনীদের গ্রাম, নানা গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে। রোদ-ঝলমল। সবে ধান উঠেছে, থাকে-থাকে Teracing-করা ক্ষেতে ক্ষেতে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে খড়ের গাদা। এই পাহাড়ি খড়ের গাদার রকম সমতলের গাদার মতন নয়। পাহাড়ি ছাগল ডাকছে এদিক-ওদিক থেকে। এখানের গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ অন্যরকম। পাখ-পাখালিও সমতলের মতন নয়। কোথায় কোন অদৃশ্য জায়গাতে বসে কোনও রাখাল ছেলে ভেড়ার পালের ওপরে নজর রাখতে রাখতে বাঁশি বাজাচ্ছে গাড়োয়ালি গানের সুরে। ভারী ভাল লাগছে চারণের।

নীচ দিয়ে যে পথ চলে গেছে, একটি কেদারনাথের দিকে আর অন্যটি বদ্রীবিশালের দিকে, অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর ধারে ধারে, সেই সব পথ বেয়ে প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী "জয় কেদার" "জয় বদ্রীবিশাল" ধ্বনি দিতে দিতে চলে যান তাঁরা জানেনও না যে, সেই সব পথের দুপাশেই পর্বতগাত্রের উপরে উপরে তাঁদের চোখের আড়ালে এরকম অনেকই গ্রাম আছে। জনপদ। এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে যাবার পায়ে-চলা পথ আছে পর্বতের মাথায় মাথায়, উপত্যকায়, মালভূমিতে, উতরাই ও চড়াইয়ে, অমিতাভর বর্ণনানুযায়ী, সরগুজা, মাক্কি, গেঁহু, জ, সাট্টি, ঝাঙ্গোরা, নারাঙ্গি, মালটা, চাকোতরা আর যোশিমারি আলুর ক্ষেত পেরিয়ে এবং সিলভার ওক, ধুপি, ওয়ালনাট, নানারকম পাইন, আরুপাটে ইত্যাদি আরও কত গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায়। এইসব গ্রামে গ্রামে সুগন্ধি বনপথে আর রোদ ও চাঁদের আশীর্বাদধন্য উঠোনে উঠোনে যুবক-যুবতী ভালবাসে একে অপরকে, বিয়ে করে, সংসার করে। তারপর একদিন তারাও বুড়ো হয়ে যায়। বহু-বর্ণ লেপের জামা আর পেতলের নথ আর দুল পরে জ্যাবজ্যাবে করে সিঁদুর মেখে বুড়ি পিঠ দিয়ে বসে নতুন-আসা নাতির জন্যে গাঢ় গোলাপি-রঙা উলের গাছি উঠোনে এলিয়ে সোয়েটার বোনে। আর বুড়ো দুহাতে তার হৃত-ক্ষমতার শেষ প্রতিভূ কালো থেলো-হুঁকোটি ধরে গুবুক-গাবুক শব্দ করে তার ক্ষেতের পাথরের দেওয়ালে রোদে পিঠ দিয়ে বসে তামাক খায়।

ভারী খুশি, ভারী আনন্দ এই আকাশে বাতাসে। এই সকালের রোদে। বড়ই ভাল লাগছে এখন চারণের। হয়তো চন্দ্রবদনীর সঙ্গও ভাললাগার একটা বড় কারণ। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে-যাওয়া অলকানন্দা এবং মন্দাকিনীর উপরে রামধনু-তোলা চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে ও ভাবছিল, ভাগ্যিস এসেছিল চন্দ্রবদনীর সঙ্গে। নইলে গাড়োয়ালের বুকের কোরকের মধ্যের এই, প্রাণের প্রাণ যে অজানাই থাকত!

এমন সময়ে পেছনে কাদের পায়ের শব্দ ও গলার স্বর শোনা গেল। পেছন ফিরে দেখল চারণ যে পাঁচ-ছজন নারী-পুরুষ উঠে আসছে উপরে, পাথরের পাকদণ্ডী বেয়ে রুদ্রপ্রয়াগ বাজার থেকে। তাদের মধ্যে চন্দ্রবদনীর সেই দুজন লোকও ছিল।

গাড়োয়ালিতে ওদের সঙ্গে কী সব সংক্ষিপ্ত দু-একটা কথা বলল চন্দ্রবদনী, কোমল আদেশের সুরে। তারা চারণদের ছাড়িয়ে টগবগিয়ে উপরে চলে গেল দেখতে-দেখতে।

চন্দ্রবদনী বলল, বসবেন না কি এখানে একটু। বসতে পারেন। আমার তাড়া নেই কোনও। আমার বড় পিসি এসেছেন চামৌলি থেকে। তিনিই আপনার জন্যে রান্না করছেন। ঠাকুমা নেই দাদু কিন্তু আছেন আমার। দাদুর বয়স তিরানব্বই। কিন্তু আপনার চেয়েও ফিট। গ্রাম থেকে বাজারে আসেন সপ্তাহে তিন-চারদিন। টানটান মেরুদণ্ড। ইংরেজ সাহেবদের মতন অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন। সপ্তাহে একবার শ্রীনগরেও যান বইয়ের দোকানে এবং লাইব্রেরিতে।

বলেন কি? নাঃ। দেখি, আপনাদের গ্রামে গিয়ে কেমন লাগে। পছন্দ হলে, বাকি জীবন ভাবছি এখানেই থেকে যাব।

তারপরই বলল, আপত্তি আছে?

আমি কে আপত্তি করার? জীবন আপনার, ইচ্ছে আপনার, সময় আপনার, মন যা চায় তাই

www.MurchOna.com

করবেন। তবে বড় শহুরেদের এই ভাবনাটাও একটা বিলাস। কল্পনার সাম্রাজ্যে তো কারও অধিকারই অন্য কেউ খর্ব করতে পারে না।

চারণ বলল। এখানে বসি ?

ওরা দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। যতই রোদের তাপ বাড়ছে ততই আরাম লাগছে। পেছন থেকে ঘাড়ে রোদ এসে পড়াতে আরামে চোখ বুঁজে আসছে চারণের। প্রায় সন্ধে রাত থেকে সকাল অবধি ঘুমিয়েও যেন ঘুমের আশ মেটেনি। কোন মানুষের মধ্যে কত ঘুম যে জমে থাকে সে তা নিজেও জানে না। আর কষে দম-দেওয়া টেনশন-এর স্প্রিং কখন কোথায় যে একেবারে গা-এলিয়ে দিয়ে এলো-খোঁপার মতন unwinding process শুরু করবে তাও আগে থাকতে জানা পর্যন্ত যায় না। এই মনুষ্য-শরীর বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কী নারীর শরীর, কী পুরুষের! এ এক বিচিত্র ঘড়ি। কোনওটা ব্যাটারিতে চলে, কোনটা বা স্প্রিং-এর। কোনওটাতে ক্লকওয়াইজ দম দিতে হয়, কোনওটাতে অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ। অথচ আশ্চর্য! ইংরেজি শব্দটাই হচ্ছে ক্লকওয়াইজ। যে ব্যাটারিতে চলে সেই ব্যাটারি যে কখন ক্ষয়ে আসে তাও ছাই বোঝা যায় না আগে থাকতে। রিমোট-কন্ট্রোলে কারও অদৃশ্য আঙুলের ছোঁয়াতে চলে শরীরী-ঘড়ি। অন্তত চারণের শরীরের ঘড়ি। কখন যে সে আপন খেয়ালে ফাস্ট হয়ে যায় আর আপন খেয়ালেই স্লো, তা আগে থাকতে বোঝা পর্যন্ত যায় না। কে জানে!

চন্দ্রবদনীর শরীরের ঘড়ি কেমন চলে! কিসে চলে ?

ভাবছিল চারণ।

নিজের মনকে তাও বোঝে কিন্তু শরীরকে যে বোঝেনি কোনওদিনই। সে যে বড়ই আনপ্রেডিকটেবল। অবুঝ তার চাওয়া, অসহায় তো বটেই।

আশ্চর্য! এখানে বসে বসেই চন্দ্রবদনীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওর তুলির কথা মনে হল। আর মনে হল, নিজের প্রথম যৌবনে লেখা দুছত্র কবিতার কথাও।

"বার বার চেয়োনাকো কারও পানে।
প্রতিটি চাহনি জেনো
অজানিতে আসক্তি আনে।"

চন্দ্রবদনীর প্রতি আসক্তি অবশ্য জন্মে গেছিল প্রথমবার হৃষীকেশ-এ ওর নাম উচ্চারিত হতেই। কিন্তু হিন্দুদের এই দেবভূমির পবিত্র গিরিশৃঙ্গর নামে যার নাম, তার দিকে চেয়েও চারণের মনে এমন কামভাব জাগছে কেন ? চারণের শিক্ষা, রুচি, সাফল্য, মান, যশ সবই কি ভেক ? মিথ্যা ? তার শরীরের উপরেই যদি তার নিজের দখল নাও থাকে, মনের উপরে তো থাকবে দখল অন্তত! নইলে, কিসের শিক্ষার গুমোর ওর ?

ভারী লজ্জা হল চারণের। ঘৃণাও হল খুব নিজের উপরে। তার সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কোথায় ? পুং-লিঙ্গর সব প্রাণীই কি একইরকম মানসিকতার ? তার শরীরী ক্ষুধায় ? মানুষও কি ব্যতিক্রম নয় ?

নিজেকে যে জানার অনেকেই বাকি সে কথাই আবার নতুন করে মনে হল।

তুলির ব্যাপারে ওর ভূমিকাটা passive ছিল। Active এবং Aggressive ভূমিকা ছিল তুলিরই। ইংরেজিতে যাকে বলে "অ্যাকুইসেন্স", চারণ তাই দিয়েছিল। মৌন-সম্মতি। কিন্তু চন্দ্রবদনী তার শরীর এবং মন দুইয়েরই উপরে এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই যে, তার এই উদাসী হওয়ার উচ্চাশায় এই উদাসী হাওয়ার পথে বেরিয়ে এতদূরে আসা এবং সাধুসঙ্গে এতগুলো দিন কাটানো বৃথাই হল মনে হচ্ছে। ইংরেজিতে যাকে বলে Back to square one, ওর অবস্থা একেবারেই সেরকম।

নিজের উপরে এক গভীর অনুকম্পা জন্মাল চারণের। ছিঃ। ছিঃ। বলল, নিজেকে।

কতক্ষণ সময় যে এই আত্মবিশ্লেষণে কেটে গেল, কে জানে। ততক্ষণ চন্দ্রবদনী যে কি ভাবছিল তাই বা কে জানে। মাঝে মাঝে সেও পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল চারণের দিকে। চোরা-চাউনি নয়।

www.MurchOna.com

চন্দ্রবদনীর স্বভাব-চরিত্রের অন্দরবাহিরে চৌর্যবৃত্তির বা বক্রতার আভাস পর্যন্ত নেই কোনও। এমন পর্বতশিখরের মতন ঋজু স্বভাবের নারী চারণ আগে দেখেনি।

একসময়ে স্বগতোক্তিরই মতন চন্দ্রবদনী বলল, আমাদের বাড়িতে গিয়ে আপনি ধন্দে পড়বেন কিন্তু। ধন্দই বলব শব্দটিকে। আগেই বলে রাখা ভাল।

কেন ? কিসের ধন্দ ?

মা তো নেই আমার। মা থাকলে আপনার কোনও অসুবিধেই হত না। মা তো শুধুমাত্র বাঙালিই ছিলেন না ! আমার মায়ের মতন Effiminate Feminine আমি আর দেখিনি। শিক্ষিতা বাঙালিনীর আদর্শ প্রতিমূর্তি ছিলেন। শিক্ষায়, রুচিতে, সংস্কৃতিতে, আচারে ব্যবহারে, চলায়-বলায়। আমি ছিটেফোটাও গুণ পাইনি আমার মায়ের। রূপও পাইনি। মা ছিলেন ব্রাহ্ম। বাবা হিন্দু। ঠার্কুদা বৌদ্ধ। আবার এমনি বৌদ্ধ নন। তিব্বতী বৌদ্ধ।

তারপর বলল, আমার মায়ের মতো অ্যাডভেঞ্চারাস বাঙালি মহিলাও আমি কমই দেখেছি। মানে, ভালবাসার ব্যাপারে। নইলে শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়ে এমন এক পরিবারে, এই উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে জীবন কাটাতে একটুও দ্বিধা কি করতেন না ?

আপনার মা যে অমন সাহস করেছিলেন তার পেছনে আপনার বাবার ভূমিকাও নিশ্চয়ই অনেকখানি ছিল। যেমন-তেমন পুরুষের জন্যে কোনও নারীই অমন ঝুঁকি নিতে পারতেন না।

চারণ বলল।

তারপর বলল, বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান, মহাযান এইসব বিভাগের কথাই জানতাম। তিব্বতী বৌদ্ধরা কি অন্য কোনওরকম ?

হাসল, চন্দ্রবদনী।

বলল, তা নয়। সে সব তো আছেই, থাকেই। তিব্বতের দালাই লামাকে যাঁরা মানেন, তাঁরাই তিব্বতী বৌদ্ধ। তাঁদের সঙ্গে জাপানের বৌদ্ধ ও ভারতের সমতলের বা দার্জিলিং বা সিকিম বা ভুটানের বৌদ্ধদের সঙ্গে কিছু তফাৎ আছে।

তারপরে বলল, আপনি Zen ধর্মের নাম শুনেছেন ?

অবশ্যই।

তিব্বতী বৌদ্ধদের সঙ্গে Zen-এর কিছু কিছু মিল আছে। আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে ঠাকুর্দা আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। উনি তিব্বতে ছিলেন বছর পাঁচেক, চাইনিজ অ্যাগ্রেশানের আগে পর্যন্ত। দারুণ ইন্টারেস্টিং মানুষ।

কী করে বোঝাবেন ওসব আমাকে ? মানে, কোন ভাষায় ?

বাঃরে ! আপনাকে বললাম না যে, ঠাকুর্দা ইংরেজদের মতন অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন। জিম করবেট সাহেবের বন্ধু ছিলেন। সারা পৃথিবীতেই যে কত তাঁর বন্ধু ছিলেন। আমরা রুদ্রপ্রয়াগে থাকি বলে আমাদের হেয় করবেন না মশাই। গেঁয়োও ভাববেন না যেন।

ছিঃ ! আমি কি ইডিয়ট ?

চারণ বলল।

তারপর চন্দ্রবদনীকে বলল, দেখুন ! আপনাকে দেখেই আপনার পরিবার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়। আমি বুদ্ধু তো নই ! বৌদ্ধ না হতে পারি !

ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, তিব্বতী বৌদ্ধদের মধ্যেও নানারকম মত-পার্থক্য আছে, মানে বিভিন্ন Relegious schools, যেমন সব ধর্মের মধ্যেই থাকে।

যেমন ?

যেমন, লঙ্গচেম্পা, নাগার্জুনা, শান্তিদেভা, অতীশ...

অতীশ ? মানে অতীশ দীপঙ্করের মতাবলম্বী ?

ঠিক তাই। আরও আছে, সং খাপা। আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে ঠার্কুদা সব বুঝিয়ে দেবেন।

আপনার মা কি গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন ?

www.MurchOna.com

চারণ জিজ্ঞেস করল।

ব্রাহ্মধর্মও তো একটি আলাদা ধর্ম। তবে সবচেয়ে খোলামেলা, উদার, Minimum Rituals-এর ধর্ম। হিন্দুধর্মের মতন এতরকম Rituals সম্ভবত আর কোনও ধর্মেই নেই। তাছাড়া, আপনার তো "গোঁড়া" শব্দটার মানে জানার কথা। গোঁড়ামি, কোনও ধর্মেরই মান বাড়ায় না। গোঁড়ামির বীজ সুপ্ত থাকে অশিক্ষারই মধ্যে, কূপমণ্ডুকতার মধ্যে। হিন্দুদের মধ্যেও তো গোঁড়া হিন্দু আজকাল নেইই বলতে গেলে।

তারপর বলল, একটা সময় পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা বড়মানুষ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই তো হয় ব্রাহ্ম নয় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন।

তাই?

যেমন, রামমোহন রায়, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, চিত্তরঞ্জন দাস, সুকুমার রায়, ডঃ বিধান রায়, আরও কত নাম বলব।

তা ঠিক। তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ইদানীংকালের ছেলেরা বোধহয় একটু নিষ্প্রভ। তাই না? অধিকাংশ মেয়েরাই তো বিয়ে করে দেখি অন্য ধর্মাবলম্বী ছেলেদের।

আজকাল ধর্ম মানেই বা কজন? নিজস্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম কি আর আদৌ আছে?

তা যা বলেছেন।

তারপর বলল,

হিন্দুধর্মের মতন এমন ভেদবোধ অন্য কোনও ধর্মেই নেই। বিরাদরী ব্যাপারটাই নেই হিন্দুধর্মে। যেমন আছে ইসলাম-এ।

তা আছে। তবে ওই বিরাদরী, ইসলাম-এর Virtue যেমন, তেমন আবার Vice-ও। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে, ইরানের খোমেইনি বা দিল্লির শাহী ইমামের ভাবভঙ্গি দেখে।

চন্দ্রবদনী বলল।

চারণ বলল, আস্তে বলুন। এই জন্যেই হয়তো আপনাকে কোতল করার ফতোয়া জারি হতে পারে। কূপমণ্ডুকতার একটা সীমা সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই থাকা দরকার বলে মনে হয় আমার।

ঠিকই তাই। হিন্দুধর্ম একটি Confused Mass-এর সংজ্ঞা যেন। ইসলাম-এর বিরাদরীর Antithesis। সাধারণী এবং অল্পশিক্ষিতরা এই Rituals-এর গোলোকধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরে। বৈতরণী পেরুনো আর হয় না। পরস্পরবিরোধী মত ও পথে হেঁটে মরে। হিন্দুধর্মকে আজকাল আর কোনও "Binding Force"-এর মধ্যেই গণ্য করা যায় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সব জাফরি ভেঙেই তো ব্রাহ্মধর্মের জন্ম।

চন্দ্রবদনী বলল, হিন্দুধর্মের মধ্যে জাতপাতটা খারাপ। খুবই খারাপ। কিন্তু এই ধর্মাবলম্বীরা অন্য সব ধর্ম সম্বন্ধে যতখানি ঔদার্য পোষণ করে ততখানি অন্য কম ধর্মাবলম্বীই করেন।

চারণ বলল, হিন্দুদের ব্রাহ্মরা কি একটু ছোট চোখে দেখেন না?

কেউ কেউ হয়তো দেখেন। তাঁরা সৎ ব্রাহ্ম নন। উদারও নন। আবার যে সব হিন্দু ব্রাহ্মদের ছোট চোখে দেখেন তাঁরাও সৎ হিন্দু নন। কোনও ধর্মই তো কোনও গন্তব্য নয়। সব ধর্মই এক একটি Means মাত্র।

ঠিকই বলেছেন।

চারণ বলল।

তারপর বলল, তাঁর জামাই নগেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি কিছুদিন আগে পড়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকাতে। রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুধর্ম আর ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্কে কয়েকটি খুব দামি কথা বলেছিলেন সেই চিঠিতে। ঠিকঠাক মনে নেই কিন্তু যতদূর মনে আছে, তা সম্ভবত এইরকম।

কি বলেছিলেন?

চন্দ্রবদনী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন যে "আমরা হিন্দু"?

ঠিক তা বলেননি। তবে অনেকটা তাই। শুনুন আগে।

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

বলুন।

বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু। আমাদের কোনও প্রাচীন ইতিহাসের বন্ধন নেই কোন প্রাচীন সমাজের ভিত্তি নেই আমরা হঠাৎ মুহূর্তকালের বুদ্বুদের মত স্ফীত হয়ে উঠেছি এমন অদ্ভুত দীনতা আমরা প্রচার করতে পারব না। হিন্দুসমাজ যে মৃত পদার্থ নয় তার মধ্যে নবভাবস্রোত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে পারে, ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্বই তার প্রমাণ। হিন্দু সমাজ যদি মৃত হত তবে ব্রাহ্ম সমাজকে সে প্রসব করতেই পারত না। সেই কথা মনে রেখে ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু সমাজের নবতর পরিণতি বলে আমরা যেন গৌরব করতে পারি। আমরা হিন্দুসমাজের জীবন থেকেই উদ্ভূত এবং এই পিতৃঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।"

আর ?

চন্দ্রবদনী বলল।

আরও অনেক কথা লিখেছিলেন। পড়ে, খুব ভাল লেগেছিল।

তারপর মুগ্ধস্বরে বলল, জানেন, রবীন্দ্রনাথ পড়লেই বুঝি, তাঁর চিঠিপত্র, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা, তাঁর গান শুনলে যে, মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনাতে আমরা কত ছোট। কত সামান্য আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি-শুদ্ধি।

তা ঠিক।

কী ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেন আপনি! সত্যি! আমার গলাতে যদি বিধাতা একটুও সুর দিতেন।

চন্দ্রবদনী বলল, "একলা গায়কের নহে তো গান।" সকলে গাইলে শুনবে কে? আজকাল যেমন হয়েছে! ক্যাসেটের বিজ্ঞাপন দেখলে তো মনে হয় দেশের যত কাক চিল ব্যাঙ ইঁদুর সকলেই গায়ক হয়ে গেছে। ভাল শ্রোতার ভূমিকা গায়কের ভূমিকার চেয়ে একটুও খাটো নয়। ছিল না কোনওদিনই।

তারপর বলল, আমার তো মনে হয় "রাবীন্দ্রিক"ও একটি ধর্মই। আমার মাও একথা বলতেন। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মরই মতন ব্রাহ্মধর্মর মধ্যেও "রবীন্দ্রিক" একটি আলাদা বিভাগ। School.

ঠিকই হয়তো বলতেন আপনার মা।

হঠাৎই চন্দ্রবদনী উঠে পড়ে বলল, চলুন, এবারে আমরা উঠি। নইলে, পিসি আবার চিন্তা করবেন। আপনার জন্য ব্রেকফাস্টও করতে চেয়েছিলেন। আমিই নিবৃত্ত করে এসেছি। সেই ক্ষোভটা দুপুর আর রাতের খাওয়াতে পুষিয়ে নেবেন।

তারপর বলল, যারা ভাল খেতে না-পারে, তারা আমার চামৌলির পিসির দুচোখের বিষ। আমার স্বামী এই কারণেই পিসির খুবই প্রিয় ছিল। ওর আকস্মিক মৃত্যুটা আমার যত না বেজেছে আমার ঠার্কুদা, বাবা ও পিসিকে বেজেছে তার চেয়েও বেশি। মা তো চলে গিয়ে বেঁচেই গেছেন।

আর চুকারের ?

চুকারের কোনও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখর বোধই নেই। অনেক বছরই হল ও সে সব বিসর্জন দিয়েছে। ও-ও শ্যামানন্দজিরই মতন এক সন্ত। হয়তো রবীন্দ্রনাথেরও মতন। যাঁরা প্রকৃত বড় মাপের মানুষ হন তাঁদের কোনও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থাকে না। সুখকে তো বটেই সব দুঃখকেও তাঁরা আত্মস্থ করে নেন। তাঁরা তাঁদের পরিবারের কেউ নন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারওকেই তাঁদের প্রয়োজন হয় না। যে-ব্রততে জীবনযাপন করতে এসেছেন তাঁরা, সেই ব্রততেই জীবন নিবেদিত করেন। আমার ছোট ভাই হলে, কি হয়, চুকারও সেই জাতের মানুষ। ওর প্রকৃতি, Material-ই আলাদা। আমাকে দেখে চুকারের সম্বন্ধে কোনও ধারণাই আপনি করতে পারবেন না। আমি অতি সাধারণ আর ও অসাধারণ।

চলুন, ওকে দেখলে, ওর সঙ্গে আলাপ হলেই বুঝবেন। পাটনের সঙ্গে ওর খুবই বন্ধুত্ব। পাটনও কিন্তু অসাধারণ ছেলে। ওই বয়সী খুব কম ছেলের মধ্যেই অমন গভীরতা দেখেছি।

গভীরতা তো আর বয়স নির্ভর নয়। অনেকে, আমারই মতন, বুড়ো হলেও অগভীরই থাকে।

www.MurchOna.com

আবার যখন শাক্যসিংহ সংসার ছেড়েছিলেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল ? স্বামী বিবেকানন্দ কতদিন বেঁচেছিলেন ?

তা ঠিক।

চন্দ্রবদনী বলল।

তারপর বলল, তা যেমন ঠিক, বিনয় যেমন গুণ বলে মান্য, অতিবিনয় কিন্তু আদৌ গুণ নয়, দোষ। অতি-বিনয়ী মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু দুর্বিনীত !

তাই ? আপনার ধারণা ?

হেসে বলল, চারণ।

হ্যাঁ। আপনি কিন্তু অতি-বিনয়ী।

চন্দ্রবদনী বলল।

আরও অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। এইখানের পরিবেশ যেন দুই নদীর প্রয়াগের থেকেও নির্মল। সম্পূর্ণ কলুষহীন। এইখানে কোনওদিনও, আশা করা যায়, পেট্রল বা ডিজেল-এর পোড়া-গন্ধ ওড়ানো কোনও যানবাহন আসবে না। একেকবারের নিশ্বাসে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে চারণের ভিতরে।

চন্দ্রবদনীদের বাড়ি পৌঁছে সকলের সঙ্গে আলাপিত হয়ে নানারকম গল্পটল্প করে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে দুটো বেজে গেল। অভিনব পরিবেশ এবং নিবিড় আন্তরিকতাতে মুগ্ধ হল চারণ।

বিয়ে ও করেনি। কোনওদিনও করবে কিনা তাও ঠিক নেই কিন্তু মনে মনে বলল, কোনও পুরুষের শ্বশুরবাড়ি যদি কখনওই হয়, তবে যেন এমনটিই হয়। নারীরা হয়তো জানেনও না যে, তাঁদেরই মতন প্রত্যেক পুরুষেরই মনে তাঁদের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে একধরনের প্রত্যাশা ও কল্পনা থাকেই। সেই প্রত্যাশা পূরিত না হলে নারীদেরই মতন আশাভঙ্গতাজনিত গভীর এক কষ্টবোধ প্রত্যেক পুরুষকেও পীড়িত করেই।

কী আদর ! কী আদর ! চন্দ্রবদনীর ঠার্কুদার 'তো কোনও তুলনাই নেই। মুখে সবসময়েই এক ফালি স্মিত হাসি হলুদ ফানুসেরই মতন ঝুলে আছে। কথা বলার সময়ে সেই ঈদের-চাঁদ হাসি হঠাৎই কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। আর কী গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান মানুষটির ! জ্ঞান যেখানে গভীর সেখানেই সাধারণত তাকে বদ্ধ বলে মনে হয়। মনেই হয়। আসলে সেই বদ্ধতার গভীরতা চারণের মতন সাধারণ মানুষদের অনুমেয়ই নয়। অগভীর মানুষেরাই পুঁটিমাছের মতন অল্প জলে ফরফর করে। তেমন মানুষদেরই শহুরে চারণ বেশি কাছ থেকে দেখেছে। কেশর সিং সাহেবের মতন প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানী অথচ সংসারী মানুষ বেশি তো দেখেনি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে জ্ঞানের এবং স্থৈর্যের যেন এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় চারণের। "ওঁ মণিপদ্মে হুঁম" এই মুখ্য ধ্বনিই বৌদ্ধ-তীর্থর চারপাশে অনুরণন তোলে। "বোধি" বা জ্ঞান লাভ করার পরই শাক্যসিংহ "বুদ্ধ" হয়েছিলেন তাই বোধহয় তাঁর অনুরাগীদের হাঁটা চলা কথা বলা সবকিছুর মধ্যেই এক বিশেষ ধরনের স্থৈর্য ও আড়ম্বরহীনতা লক্ষিত হয়।

চন্দ্রবদনীর দাদু পৃথিবীর সমস্ত সময়টুকুই যেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লামাদের লাল বা হলুদ জোব্বার পকেটে তিনি বন্দি করে রেখেছেন। কোনও কিছুতেই বিন্দুমাত্র তাড়া নেই। না, জন্মানোতে, না বড় হয়ে ওঠাতে, না মৃত্যুতে। রোগ, জরা এবং মৃত্যুকে জয় করার সাধনাই যে রাজপুত্র শাক্যসিংহের সাধনা ছিল !

চন্দ্রবদনীর চামৌলির বড় পিসিমারও তুলনা নেই। "বড়ি বুয়া" এই নামেই ডাকছিল তাঁকে চন্দ্রবদনী। সর্বজনীন মাতৃমূর্তি যেন ! সদাহাস্যময়ী অথচ লাস্যহীনা। তাঁকে প্রথম দর্শনেই দেখে চারণের দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একখানি আগমনী গানের বাণী মনে পড়ে গেছিল

"শারদ সপ্তমী উষা গগনেতে প্রকাশিল।
দশদিক আলো করে আমার দশভুজা মা আসিল।...
পুলকে ভরিল হিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া

www.MurchOna.com

চল সখী উলু দিয়া বরণ করো
মা আসিল।"

মানুষীর মধ্যে যদি জগন্ময়ী মূর্তি কেউ দেখতে চান তবে এই রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের অনেক উপরের এই গ্রামে এসে চন্দ্রবদনীর "বড়ী বুয়াকে"ই দেখে আসতে হবে।

চন্দ্রবদনী বলল, বড়ি বুয়ার রান্নার উৎকর্ষ অথবা পদ দেখে কিন্তু একবারও ভাববেন না যে, আমরা রোজই এইরকমই খাই। আমরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই মাড়োয়ারি-গুজরাটিদেরই মতন সিম্পল। আমার মা এই ব্যাপারটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন। সে কোটিপতিই হন আর দীনদরিদ্র, মাড়োয়ারি-গুজরাটি এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যেও কিন্তু বাঙালিদের মতন অমন খাওয়ার "পটি" নেই। রান্না করতে আর খেতেই যদি দিনের আট ঘণ্টা চলে যায় তাহলে অন্য কাজ করা যাবে কখন ? শুধু খাওয়ার জন্যেই তো এখানে আসা নয় মানুষ জন্ম নিয়ে !

আমার ঠার্কুদা তো বটেই, বাবাও Plain living and high thinking-এ বিশ্বাসী। ভবিষ্যতেও যদি আবার কখনও যদি আমাদের এখানে আসেন তখন কিন্তু এইরকম মহাসমাদর প্রত্যাশা করবেন না।

চন্দ্রবদনী বলল।

বড়ি বুয়া বললেন, হ্যাঁ। হ্যাঁ। পরে এলে, বাড়ির ছেলের মতনই থাকবে, খাবে। রাজাবাহাদুর তো চলেই গেছে। চুকার তো থেকেও নেই। এ বাড়িতে ছেলে কোথায় ? তুমি এলে বাড়ির ছেলে হয়েই থাকবে। তাছাড়া, যদি ভালমন্দ দশপদ খেতে ইচ্ছেই হয় তবে চামৌলিতে চলে এসো। আমার বড় ছেলে খড়গ ঠিক তার বাবার মতনই হয়েছে।

"বাপ কী বেটা সিপাহীকি ঘোড়া
কুছ নেহিতো থোড়া থোড়া।"

চারণ হাসল। বড়ি বুয়ার কথা শুনে। তারপর বলল কিন্তু চামৌলি যেতে হয় কোথা দিয়ে ? মানে, কী করে ?

ওমা। তাও জানো না ? এখান থেকে তো কাছেই।

তাই ?

হ্যাঁ।

চন্দ্রবদনী বলল।

কাছে মানে ? কতদূর এখান থেকে ?

এখান থেকে চামৌলি যতদূর, চামৌলি থেকে রুদ্রপ্রয়াগও ততই দূর।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল।

হাসল, চারণও।

এই বাক্যটিই দেবপ্রয়াগে শুনেছিল, মনে পড়ল। কে বলেছিল ? চন্দ্রবদনীই কি ? নাকি সাধু সন্তদের মধ্যেই কেউ, তা অবশ্য মনে পড়ল না।

'বড়ি বুয়া' বললেন, রুদ্রপ্রয়াগে নেমে গিয়ে অলকানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে বাঁয়ে যে পথ চলে গেছে সে পথে গিয়ে, ডান দিকে ঘুরে গেলে 'মোহনখাই' বলে একটি জায়গা পড়বে। তারপর চোপ্তা, চামৌলি। আমাদের ওখানে কিন্তু পথ এখনও কাঁচাই আছে। পিচ পড়েছে সবে তাতে। তাই সেই জায়গায় প্রকৃতিও কীরকম তার একটা আন্দাজ নিশ্চয়ই করতে পারো, মানে যে-পথ এখনও পাকাই হয়নি সেই পথপাশের গ্রামের।

—নিশ্চয়ই ! পারি বইকী ! কল্পনা করতেও ভাল লাগে যে, পৃথিবীতে এখনও এমন কিছু কিছু জায়গা রয়ে গেছে যেখানে বিজলীর আলো নেই, বাস বা ট্রাকের কান-ফাটানো এয়ার-হর্ন নেই, কেবল-টিভির ডিশ-অ্যান্টেনা নেই, ভোগ্যপণ্যের লাগাতার এবং লজ্জাকরভাবে নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন নেই।

www.MurchOna.com

চারণ বলল।

খেতে-করতে সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে। খাওয়া তো নয়, "ফাঁসির খাওয়া"। আসলে, ঢলেনি ততটা, পাহাড়টা এতটাই উঁচু যে, বেলাবেলিই আড়ালে পড়ে গেল সে। তার প্রাত্যহিক অধঃপতনটা শেষ অবধি কেউ ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে দেখুক তা বোধহয় এখানের সূর্যের ইচ্ছে নয়।

বড় বড় হাই উঠছিল চারণের। আলো কমতেই শীতও বাড়ল। সবসময়ই কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে একটা।

চন্দ্রবদনী বলল, একটু শুয়ে নেবেন নাকি আপনি ? আপনার অভ্যেস তো নেই।

কিসের ?

এতখানি চড়াই ওঠবার কষ্ট করার।

চারণ বলল, এমন সাধ্বী-সঙ্গর অভ্যেসও নেই, এমন আদর যত্নরও। শুধু কষ্টটার কথা ধরলেই বা চলবে কেন ? তা করলে তো অন্যায় করা হবে।

তারপরই বলল, চুকার কোথায় ? তার সঙ্গেই তো আলাপ হল না।

কোথায় তা আমিও জানি না। আপনাকে যখন আনতে যাবার জন্যে নামলাম নীচে, ঠাকুর্দার কাছে শুনলাম যে, সে নাকি শেষ রাতে বেরিয়ে গেছে।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ।

তারপরই বলল, তাহলে কি পাটনের সঙ্গেই গেল ? সেও তো একখানি চিঠি লিখে রেখে ভোররাতেই চলে গেছে। সে অবশ্য গন্তব্যর আভাস দিয়ে গেছে। তবে সত্যি বলেছে কি না তা বলতে পারি না।

একসঙ্গে বেরোলেই যে একই গন্তব্যে যাবে তার কি মানে আছে ? কতজনেই তো একসঙ্গে প্রতিমুহূর্তেই বেরোয় পথে। তাই বলে, কোন পথ যে কাকে কোথায় নিয়ে যায়, তা কি আগে থাকতে জানা যায় ? পথিকও জানে না অনেক সময়। পথ তো জানেই না।

বাঃ।

বলল, চারণ।

আপনি ভারী সুন্দর কথা বলেন।

আপনিও।

তাই ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মক্কেলরা ছাড়া আর কেউই বলেনি এ কথা।

পাটনের মা তুলিদিও নয় ?

তুলিকে আপনি চিনতেন ?

চমকে উঠে বলল, চারণ।

এক দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে চন্দ্রবদনী বলল, This world is really small.

তারপরে বলল, তুলিদির কাছে আপনার কথা এতই শুনতাম একসময়ে যে, তুলিদিকে খুব ঈর্ষা হত। ওর বাবা-মা সত্যিই আক্ষরিকভাবে তুলিদিকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তুলিদির রূপ-গুণের কোনও তুলনা ছিল না। একটাই দোষ ছিল। সাহস বড় কম ছিল। পরকীয়াতে যতটুকু সাহস লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি সাহস লাগে সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। বড় বেশি মেনে নেওয়ার প্রবণতা ছিল ওর মধ্যে।

তারপর বলল, সত্যি ! পাটনকে দেখে এবং জেনে, পাটনের বাবা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায় না। আমি তো তাঁকে দেখেছি দিনের পর দিন।

অধিকাংশ অশিক্ষিত বড়লোকেরা ওইরকমই হয়। সব দেশেই।

বড়লোক হওয়ার পর অধিকাংশ মানুষই আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না। এ কথা অশিক্ষিত বড়লোকদের মতন শিক্ষিত বড়লোকদের বেলাতেও প্রযোজ্য।

www.MurchOna.com

সারা জীবন টাকাওয়ালা মানুষদের নিয়েই তো কাটালাম ! টাকা হজম করা, পাথর হজম করার চেয়েও কঠিন। টাকাই মানুষকে হজম করে ফেলে মানুষের অজানিতে।

সত্যিই তুলিদির কথা মনে হলে বড় কষ্ট হয়।

চন্দ্রবদনী চারণের দুচোখে দুচোখ রেখে বলল, যদি বা একটু সুখের মুখ দেখেছিল বেচারি, সেই সুখেও তো বেশিদিন সুখি হওয়া হল না তার। সাত-তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল।

কোন সুখ ?

চন্দ্রবদনী অনেকক্ষণ চারণের চোখে চেয়ে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

তারপরে বলল, আপনি জানেন না ?

চারণও একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি আমার নিজের সুখের কথাটুকুই শুধু জানি। অপরের সুখের কথা তো অপরেরই জানার কথা। মানে, সে সুখের গভীরতার কথা। কারও পক্ষেই কি অন্যের সুখের কথা জানা সম্ভব ? যদি কেউ কাউকে সত্যিই সুখী করে থাকে, তার পক্ষেও জানা সম্ভব নয়।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে চারণ চন্দ্রবদনীকে বলল, আপনি বহুদিন কাছ থেকে দেখেছেন বললেন পাটনের বাবাকে, সেটা কীরকম ?

বাঃ রে। আমি পাঁচ মাস ছিলাম যে তুলিদিদের বাড়িতে একসময়ে।

সে কি ? কোন সুবাদে ?

বিস্মিত এবং একটু ভীতও হয়ে জিজ্ঞেস করল চারণ।

চন্দ্রবদনী বলল, সুবাদ সুবোধ্যও হতে পারে অথবা দুর্বোধ্য। অত জেনে কী করবেন ?

চিন্তাতে ফেললেন দেখছি আপনি আমাকে।

সে কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠল চন্দ্রবদনী।

বলল, চিন্তা করা ভাল। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না।

তীর্থ করতে এসেছিলাম আর এ কোন জটিল অঙ্কর মধ্যে এনে ফেলল আমাকে পাটনচন্দ্র ?

স্বগতোক্তির মতন বলল চারণ।

তীর্থ করতে আপনি মোটেই আসেননি।

তো ? কী করতে এসেছিলাম ?

নিজেকে খুঁজতে এসেছিলেন। আয়নার সামনে দাঁড়াতে এসেছিলেন।

তারপরই বলল, আশ্চর্য ! আয়নার দোকানিরাও কখনও কখনও অন্য দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন হয়তো। দেখতে হয়ই। যে পরিবেশে মানুষ থাকে, সেই পরিবেশ যতই, ভাল বা মন্দ হোক না কেন, তা তাকে আবিল করে দেয়ই। অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখার আর কোনও উপায়ই থাকে না বোধহয়। তাই না ? নইলে মি. চারণ চ্যাটার্জি এই দাড়িতে-ছারপোকা, কম্বলে-ছারপোকা, দুর্গন্ধ, উপোসী, অপার্থিব জগতের জীব, ছায়ামূর্তির মতন সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে আসবেন কেন ?

তারপর বলল, জানেন, আপনার কথা আমি আগেই জেনেছিলাম, মানে, এই অঞ্চলে যে আপনি এসেছেন। আপনার আসা তো আসা নয়। সে যে আবির্ভাব।

কী করে ?

পাটনের কাছ থেকেই। কিন্তু যেদিন দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার পারে, গুরুজির গুহাতে আপনাকে দেখলাম, জোড়াসনে বসলেন আপনি এসে, পাটনের সঙ্গে, ছেঁড়া কম্বলের উপরে, তখন তুলিদিদের বাড়িতে দেখা আপনার, সাদা-রঙা লেফ্‌টহ্যান্ড-ড্রাইভ ওপেল ক্যাপিটান গাড়ি থেকে থ্রি-পিস স্যুট পরে-নামা সেই চেহারাটার কথা মনে পড়ে গেল। এখন তো Opel Astra গাড়ি নিয়েই কত মানুষ হই-হই তুলেছে। Opel Kapitan তো Astra-র চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ বড় গাড়ি ছিল, তাই না ? আর তখন দেশে তো হত না, ইমপোর্ট করতে হত।

হ্যাঁ।

www.MurchOna.com

লজ্জিত হয়ে বলল, চারণ।

তারপরই বলল তাতে কি ? কোনও শিক্ষিত মানুষেরই কাছে গাড়ি-বাড়ি টাকা-পয়সা কি গর্বের জিনিস ?

না তা নয়। তবে আপনার পরিবেশ প্রতিবেশের মানুষকে যে অমন পরিবেশে দেখব তা ভাবতেও পারিনি।

চন্দ্রবদনী বলল।

তাহলে বলতে হয়, আপনি আমার গাড়ি, আমার শোফার, আমার থ্রি-পিস-স্যুটকেই দেখেছিলেন, আমাকে দেখেননি। মানে, আমার আসল আমিকে।

কার আসল আমিকেই বা কে দেখতে পায় অত সহজে ? আসল আমিকে অত সহজে দেখতে পাওয়া গেলে কি সক্রেটিস অমন করে বলতে পারতেন যে ''Catch Me, Me, Me, the real me'' ! তাছাড়া, তুলিদি যে আমাকে সবই বলেছিল, মানে আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কের রকম, গভীরতার কথা।

তুলি আপনাকে সব বলেছিল ? মানে ? কী সব ?

সব, সব। সেই কটকের প্রথম রাতের কথা থেকে শুরু করে সবই বলেছিল। আসলে, বড় একলা ছিল তো বেচারি। মনে এমন কিছু কথা সব মানুষেরই থাকে, কারওকে না বলতে পারলে সদ্য মা-হওয়া নারীর স্তনভারের মতনই তার মন ভারী হয়ে ওঠে। সে ভার লাঘব না করতে পারলে অস্বস্তির আর শেষ থাকে না।

আপনি সেই ভারের কথা জানলেন কি করে ? আপনি তো মা হননি কখনও।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, মেয়েরা মা না হলেও মায়ের জাত বলেই মায়েদের অনেক কথা এমনিতেই জানে। সে প্রসঙ্গ থাক।

চারণ বলল, ঘুমুবার আর দরকার নেই। ঘুম কেটে গেছে। শীতের দিনে, অবেলায় না ঘুমনোই ভাল। গতকাল পাটনের পাল্লায় পড়ে স্কচ-হুইস্কি খেয়ে তারপর হেভি লাঞ্চ করে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়াতে দিনটাই নষ্ট হয়ে গেল। তাছাড়া, কাল মনও অভিঘাতে ভারাক্রান্ত ছিল।

কিসের অভিঘাত ?

সে কথা এখন থাক। আজকের দিন ও রাতটা আমি নষ্ট করতে চাই না।

দিন ও রাত তো নষ্ট হবেই। সব দিন সব রাত নষ্ট হবারই জন্যে। মানে, ফুরিয়ে যাবারই জন্যে। দিন ও রাতের গায়ে লেবেল মারার ক্ষমতাটুকুই শুধু আছে আমাদের হাতে। আসলে, মানুষের এইখানেই মস্ত হার। তাই না ? আপনি কি বলেন ? চাঁদে পা দিল মানুষ। কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে দিল আকাশে, পুকুরে, চারা-পোনা ছাড়ার মতন আকাশময়, কিন্তু সময়কেই ধরে রাখতে পারল না। এঁটে উঠতে পারল না তার সঙ্গে। তার গায়ে আঙুলই ছোঁয়াতে পারল না। সময়ের চেয়ে বেশি Perishable আর কোনও জিনিসই নেই বোধহয়।

সময়কে কি কোনও জিনিসের পর্যায়ে আদৌ ফেলা যায় ?

মানে, কংক্রিট নয়, অ্যাবসট্র্যাক্ট জিনিস ? জিনিস বলব না, বলব কনসেপ্ট।

ঠিকই।

বলল, চারণ।

তারপর বলল, প্রসঙ্গটা ওঠালেন আপনিই তাই বলি যে, আমি এখানে তীর্থ করতে আদৌ আসিনি। তেমন তীর্থ করতে এলে, খেতে খেতে, বমি করতে করতে, দেব-দেবতাদের নাম করে হুংকার দিতে দিতে যতদিন এসেছি এই অঞ্চলে তার এক-বিশাংশ সময়েরও কম সময়ে, কলকাতায় ফিরে যেতে পারতাম। গিয়ে, ''জোয়ালেও'' জুতে যেতে পারতাম। কিন্তু মনের অশান্তি, ছটফটানি, কাটেনি এখনও। 'তীর্থ'র ধারণাটা আমার কাছে একেবারেই অন্যরকম। তা সকলের পক্ষে বোঝাও হয়তো সম্ভব নয়।

বলুনই না একটু চেষ্টা করে দেখি, বুঝতে পারি কি না।

www.MurchOna.com

জানি না, পারবেন কি না ! তবে আপনার মা সম্বন্ধে পাটনের কাছে ও আপনার কাছে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয়, তিনি হয়তো বুঝলেও বুঝতেন ।

তারপর বলল চারণ, তীর্থ সম্বন্ধে এই ধারণাটিও আমার নিজস্ব ধারণা নয় । এও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই ধার করা ।

বলুনই না শুনি ।

তীর্থ তো অন্তরেরই ব্যাপার । তীর্থ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গেলেই হয় না, যদি না "অন্তর তীর্থে" যাওয়া যায় ।

বাঃ !

বলল, চন্দ্রবদনী ।

"প্রতিদিনই এসো, অন্তরে এসো । সেখানে সব কোলাহল বারণ হোক । কোনওরকম আঘাতই না যেন পৌঁছয় আমার অন্তরের গভীরে, কোনও মলিনতা যেন না স্পর্শ করে । সেখানে ক্রোধকে পালন কোরোও না, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিও না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রেখো না কেন না সেখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেব-মন্দির ।"

বাবাঃ আপনি এতও জানেন ।

ঠাট্টা করছেন ?

চারণ বলল ।

না, ঠাট্টা করছি না । সিরিয়াসলিই বলছি । কিন্তু যা বললেন এই যদি আপনার বিশ্বাস হয়, তবে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না, এত নৈতিকতা, শুদ্ধতা সত্ত্বেও তুলিদির সঙ্গে "অ্যাফেয়ারটা" করলেন কি করে ? "বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে যদি না জ্বালানোতেই" বিশ্বাস করেন আপনি ?

চারণ হেসে ফেলল । হেসে ফেলেই মনে হল, যখন ওর শঙ্কা পাওয়ার কথা তখন হাসল কী করে ।

চন্দ্রবদনী লক্ষ করল যে, সেই হাসির মধ্যে শিশুর হাসির অপাপবিদ্ধতা আছে । লক্ষ করে আশ্চর্য হল ।

চারণ বলল, আপনাকে এর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে করেছিলাম আমি ।

মানে ?

এ তো রবীন্দ্রনাথেরই কথা । আমি তো নিজে রবীন্দ্রনাথ নই । আমি যে অতি সাধারণ একজন রক্তমাংসের মানুষ । যে-ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষাতে নব্বুই পার্সেন্ট নম্বর পাওয়ার সাধনা করেছিল, ফল বেরুলে দেখা গেল যে, সে হয়তো টায়-টায় নম্বর পেয়ে কোনওরকমে পাস করে গেছে । কিন্তু তা বলে তার সাধনা তো মিথ্যে নয় । সাধনার পবিত্রতা এবং মান্যতা তো সিদ্ধিনির্ভর নয় । তবে তো সব সাধনাতেই এমনকি শব-সাধনাতেও ব্যবসাদারীর সঙ্গে কোনওই তফাৎ থাকত না । শুধুমাত্র লেন-দেন এরই ব্যাপার হত এইসব অন্তর্গত দেওয়া-নেওয়া । প্রত্যেকেরই সামনে তাই কোনও মহৎ আদর্শ রাখাটা খুবই জরুরি । কোনও আদর্শে আস্থা রাখাটাই একটা মস্ত সাধনা । অন্ধকার রাতে ঝড়ের মধ্যে "হাল" এর উপরে হাত রেখে নৌকো বাওয়াটাই "দাঁড়ের" উপরে হাত রেখে বাওয়ার চেয়ে অনেকই বেশি জরুরি । হালে হাত থাকলেই যে সব মাঝিই দরিয়া পেরোতে পারতই, পারবেই, তার যদি কোনও স্থিরতা থাকত তবে তো সাধনা কথাটাই মিথ্যে হয়ে যেত । তাই নয় কি ? শুধুমাত্র এই তীর্থর কথাই আমি জানি । উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে উঠে সুন্দর কালো পাথরের মন্দিরগাত্রে সাদা চকখড়ি দিয়ে যেসব তীর্থযাত্রী লিখে রাখেন, "আমি এসেছিলাম", "শ্রীরামপুরের কালু রায়" বা "চন্দননগরের ভুলু দাস" অথবা কামিনী, যোগেন অথবা হৃদয়ে তীর বেঁধা ছবি ইত্যাদি, তাঁদের তীর্থযাত্রার রকম আর আমার তীর্থযাত্রার রকম তো এক নয় ! "পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, পুষ্প আছে অন্তরের" মতন আমিও বিশ্বাস করি, শারীরিকভাবে কোনও ক্ষেত্রতে পৌঁছলেই শুধু সেই কারণেই কোনও মানুষ-মানুষীরই "তীর্থ" করা হয় না । যদি না, অন্তরকেই তীর্থ করে তোলা যায় ।

ঠিক । অবশ্যই ঠিক । চন্দ্রবদনী বলল ।

www.MurchOna.com

তারপর হেসে বলল, আবারও বলছি আপনাকে যে, খুবই ভাল কথা বলেন আপনি।

আগেই তো বলেছি, আমার জীবিকার্জন তো মুখ দিয়েই করতে হয়। তা বলে, আমি মানুষটা মুখ-সর্বস্ব, এ কথা ভুলেও ভাববেন না।

সেটা না বললেও চলত।

তারপরই বলল, এখনও যতটুকু বেলা আছে চলুন আপনাকে আমাদের গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।

কোনও ফাঁকা জায়গাতে চলুন। ঘিঞ্জি জায়গাতে নয়।

চারণ বলল।

নিজের মনটাকে ফাঁকা করে তুলুন তাহলেই আর ফাঁকা জায়গার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

বাবাঃ! আপনি দেখি সন্ন্যাসী ভীমগিরি মহারাজের মতন কথা বলছেন।

সন্ন্যাসী নাই বা হলাম বিবাগী হতে ক্ষতি কি?

এখন রাত কত তা কে জানে!

রাত নামার আগে আগে ওরা দুজনে পুরো গ্রামে একটা টহল দিয়ে এসে, জামাকাপড় বদলে, বসবার ঘরে বসে গল্প করছিল এখন। ঘরের দুকোণে কাঠ-কয়লার কাঙরি রাখা ছিল, ফায়ার-প্লেস-এর বিকল্পে। যেমন কাশ্মীরের ঘরে ঘরে থাকে। "ফারহান" পরে গড়গড়ার লম্বা নল হাতে তুলে সুগন্ধি তামাক খায় কাশ্মীরীরা গুড়ুক-গুড়ুক শব্দ করে। গাড়োয়ালি, কুমায়নি, হিমাচল প্রদেশের মানুষেরাও খায়। তেমনই যেন বন্দোবস্ত, রুদ্রপ্রয়াগে চন্দ্রবদনীদের বাড়িতেও। শুধু গড়গড়ার বদলে পাইপ।

চন্দ্রবদনী বিকেলে ফিরে এসে চান করেছিল গরম জলে। এখন একটা কাঁঠালি-চাঁপারঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে হালকা হলুদ ফুলহাতা কার্ডিগান, শাড়ির নীচে হালকা-হলুদ সিল্কের সায়ার আভাস দেখা যাচ্ছে রুপোর পায়েজোরের উপরে। পায়েও হালকা হলুদ রঙা মোজা। পুরু কার্পেটের উপরে পা দুটি মেলে রেখেছে। উজ্জ্বল বিজলী আলোর নীচে বসে ভারী উষ্ণ লাগছে চারণের। সেই উষ্ণতা কতখানি "কাঙরীর" আর কতখানি বিজলী-আলোর এবং আরও কতখানি চন্দ্রবদনীর সান্নিধ্য-জনিত তা চারণ বুঝতে পারছে না।

চন্দ্রবদনীর ঠার্কুদার কাছে "ধম্মপদ"-এর কথা শুনছিল। বৌদ্ধধর্মের "ধম্মপদ"-এর কথা শুনছে শিশুকাল থেকেই কিন্তু কী তার শিক্ষা, তা কখনওই জানবার সুযোগ হয়নি।

কেশর শিং শর্মা সাহেব পাইপ খান। বহু পুরনো হয়ে যাওয়া ইংলিশ ব্রায়ার পাইপ। কে জানে? হয়তো "ডানহিল"ই হবে। সবসময়ই তাঁর হাতে থাকে। মনে হয়, যেন পাইপই তাঁর Staple Food।

কি টোব্যাকো খান?

চারণ শুধিয়েছিল।

কী আর খাব? প্রিন্স হেনরি। যা পাওয়া যায় দিল্লি বা দেরাদুনে। তার সঙ্গে কখনও সখনও হল্যান্ড-এর ''Amphora'' পেলে মিশিয়ে নিই Aroma-র জন্যে। 'Amphora' কলকাতা-বম্বে-দিল্লি সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। হয়তো চোরা-চালানিরাই নিয়ে আসে।

তা না হলে আর আসে কি করে!

www.MurchOna.com

সকলের চোখের সামনেই বিক্রি হয়, পুলিশ-কনস্টেবল যেমন সকলের চোখের সামনেই ট্রাকওয়ালাদের কাছ থেকে ঘুষ নেয়। এসব অন্যায় আর অন্যায় বলে মানে না কেউই।

চারণ হেসে বলল, অন্যায় যে করে বা যারা করে আর সেই অন্যায়কে আমরা যারা মেনে নেই, তারাও কি সমান অপরাধী নই ?

তা ঠিক। তবে ন্যায়-অন্যায় ব্যাপারটা, বিশেষ করে পোস্ট-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াতে একটি রিলেটিভ টার্ম। আমাদের অনেক ধ্যান-ধারণার খোলনলচে পালটে ফেলার সময় হয়েছে যাতে স্বদেশী যুগের মতন অন্যায়কে অন্যায় বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এবং চিহ্নিত করে তাকে বর্জনও করতে পারি। সব গ্রহণ-বর্জনের পেছনেই এক বিশেষ মানসিকতা থাকে। পরিবর্তন আসা দরকার সেই মানসিকতাতেই।

তারপরেই বললেন, এ প্রসঙ্গ থাক। বুড়ো হলে, মানুষ বেশি কথা বলে। তোমরাই বরং বল, আমি শুনি। তবে আমার টোব্যাকোর স্টক, চুকার কিংবা চুকারের বাবা একবার মাস দু-তিনেকের মতন এনে দেয় আমাকে।

চন্দ্রবদনীর দাদুর চেহারার মধ্যে ভারী একটা প্রশান্তি আছে। তার কাছে গেলেই নিজের মনও যেন শান্ত হয়ে যায়। মাথাতে একটা সন্ন্যাসীদের তন গেরুয়া-রঙা গরম টুপি। অথচ পরেন প্যান্ট-কোট।

কেশর সিং সাহেবের পাইপের ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ শুনে মনে হল চারণের যে, পাইপটার stem-এ মনে হয় থুথু জমেছে। পরিষ্কার করা দরকার।

ভাবল, চারণ।

চুপ করে গেলেন যে বড় ! কী ভাবছেন ?

তারপর বলল, বড়ি বুয়ার হাতে-বানানো দারচিনি-তেজপাতা-লবঙ্গ দেওয়া আর এক কাপ চা খাবেন না কি ?

চারণ বলল, না, না। আর নয়। ভাল জিনিস কম বলেই ভাল।

হালকা কচি-কলাপাতা-রঙা উলের লাছি নিয়ে সোয়েটার বুনতে-বসা চমৌলির বড়ি বুয়ার দিকে ও ফিরে বলল, দারুণ খেলাম বুয়া, চাটা।

বড়ি বুয়া ওকে বললেন, একদফা মেরী নজদিক আওতো বেটা।

কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে, চারণ উঠে ওঁর কাছে গেল।

উনি বললেন, আররে বেটা, জারা উলটো হো যাও।

চারণ উলটো হয়ে, মানে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতে বড়ি বুয়া চারণের কাঁধের মাপ নিলেন উলের গাছি-সমেত কাঁটা দিয়ে।

চন্দ্রবদনী মুখ টিপে হাসল। চারণকে বলল, বাঃ বাঃ আপনাকে বড়ি বুয়ার এতই ভাল লেগে গেছে যে আপনার জন্যে সোয়েটারই বুনতে বসে গেলেন। রংটা অবশ্য আপনাকে মানাবে খুব।

বড়ি বুয়া কপট রাগ করে বললেন, দশ পাতা ইংরেজি পড়াটাই একমাত্র শিক্ষা নয় বেটি। প্রতিবছরই কোনও-না-কোনও প্রিয়জনের জন্যে একাধিক সোয়েটার-বোনা ভালবেসে, তাদের ভালবেসে রেঁধে খাওয়ানো, তাদের জন্যে পাঁপড়-আচার বানানো এই সবই হচ্ছে মেয়েদের ভালবাসার প্রকাশ।

চন্দ্রবদনী বলল, তোমরা সময় কী করে নষ্ট করতে হয় তাই শিখেছিলে বড়ি বুয়া। তুমি দিল্লির কনট-সার্কাসে চল না একবার আমার সঙ্গে। কি পালিকা বাজারে। কত রকমের কত রং-এর যে, মেশিনে-তৈরি রেডিমেড সোয়েটার পাবে সেখানে যে, একেবারে ভালবাসার "পিং-হুলার"এ হয়ে যাবে।

বড়ি বুয়া হেসে ফেললেন চন্দ্রবদনীর কথা শুনে।

চারণ বলল, 'পিং-হুলারে'টা আবার কী জিনিস ?

হাসছিল চন্দ্রবদনীও। চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দাও যোগ দিলেন হাসিতে।

স্বগতোক্তি করলেন, নাতনির রসিকতা দ্যাখো !

www.MurchOna.com

হাসছিল, চন্দ্রবদনীও।

কারওকে হাসতে দেখে এত সুখি এর আগে আর হয়নি চারণ। ওর মনে হল চন্দ্রবদনীর এই একটি দিনের সান্নিধ্যতেই সাধু হওয়ার মতন কাবু হয়ে পড়েছে। প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল চন্দ্রবদনী নামটিতেই। তারপর তার সঙ্গে দেবপ্রয়াগে দেখা হবার পর, তার গান শোনার পর এবং গত দু-আড়াই মাসের এক সম্পূর্ণ অন্য জীবনযাপনের পর চন্দ্রবদনীদের বাড়িতে বসে তার ঠাকুর্দা এবং চামৌলির বড় পিসিমার সঙ্গে গল্প-মস্করা করা এক পরমাসুন্দরী আধুনিকা অথচ সম্পূর্ণ ভারতীয় নারীকে খুবই কাছ থেকে দেখে অজগরের চাউনিতে আটকে-পড়া হরিণশিশুরই মতন অবস্থা হয়েছে যেন দুঁদে ব্যারিস্টার চারণ চ্যাটার্জির।

চারণের মনে পড়ে গেল যে, ওর মা বলতেন, "কার মরণ যে কোথায় লিখে রেখেছেন ঈশ্বর তা শুধুমাত্র তিনিই জানেন।" বাক্যটির যথার্থ তাৎপর্য এতদিন পরে হৃদয়ঙ্গম করল যেন চারণ। তার মৃত্যু যে, এই দেবভূমির রুদ্রপ্রয়াগের উপরের এই সুউচ্চ পর্বতের উপরের একটি বাড়ির এই উষ্ণ পরিমণ্ডলেই, unseen question-এর উত্তরেরই মতন, সেই সত্য, অদৃশ্য, ঈশ্বর-নামক element যে স্থির করে রেখেছিলেন, তাকি সে আজ সকালেও জানত! এত কিছু কি ঘটে যেতে পারে অল্প কঘণ্টার মধ্যে? একি সম্ভব? চারণ চ্যাটার্জি অন্য পক্ষের মতামতের জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই কী দারুণ দুঃসাহসে জীবনের এমন পরম এক জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল? কি করে? সওয়াল না জিজ্ঞেস করেই জবাব দিয়ে দিল কোন অন্ধ মুর্খতাতে?

চারণের একটা উর্দু শায়ের মনে পড়ে গেল,

"ম্যায় দিল দে দিয়া হ্যায় উনকি,
দেখে উ্য ক্যা করেঙ্গে,
রাখতি হ্যায় দিলকে দিলমে,
ইয়া কি জুদা করেঙ্গে?"

ভাবছিল, জীবনের এতখানি উষর বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসে সেকি মরুদ্যানের সামনে দাঁড়াল? প্রেমেই পড়ল কি? কোন সকালের পাখি যে কার জন্যে কী গান মুখ করে নিয়ে আসবে, তা আগের শেষ রাতেও বা কে বলতে পারে!

চারণ আবারও বলল 'পিং-হুলারে'টা কী? বলবেন না?

চন্দ্রবদনী হাসতে হাসতেই বলল, পিংহুলারে একটি গুরুমুখী শব্দ। মানে, ধরুন, কী বলব, জলসা বা ভ্যারাইটি-শো।

তাই?

বলে, চারণও যোগ দিল হাসিতে।

চন্দ্রবদনী তারপর বড়ি বুয়াকে হাসতে হাসতেই বলল, আর শুধুই সোয়েটার? ইন্ডানা কোম্পানির নানান আচার, পাচরঙ্গের আচার, তারই বা স্বাদ খারাপ কি? দিল্লির মেয়েরা প্রেগন্যান্ট হলেই আচারের বিক্রির ধুম পড়ে যায়। এখন নিজের হাতে সোয়েটার পাপড় আচার বানাবে, তার সময় কার আছে? তুমি একবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে রইলে বড়ি বুয়া।

বড়ি বুয়া বললেন, সময় সকলেরই আছে। নিজের প্রিয়জনের জন্যে নিজে হাতে সোয়েটার বোনাতে যদি সময় নষ্ট হয়, তবে সেই সময় নিয়ে তোরা, কি করলি, না করলি তাতে কিই বা এসে যায়। আমার অন্তত যায় আসে না। সকলের সময়ই দামি। কে কার সময় কী ভাবে খরচ করবে সেটা তার সম্পূর্ণই নিজস্ব ব্যাপার। আমার দামি সময় আমি এইভাবেই 'নষ্ট' করেছি আজীবন এবং ভবিষ্যতেও করব। পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, পঁয়তাল্লিশ বছর বড় সুখি, দাম্পত্যজীবন কাটিয়েছি। পাঁচবছর হল একলা হয়ে গেছি। কিন্তু জীবনের একমুহূর্তও 'নষ্ট' হয়েছে বলে মনে হয়নি।

তা হয়তো হবে। কিন্তু বড়ি বুয়া, আমাদের পৃথিবীটা যে তোমার দেওদার-ওক-পাইন—হর্স চেস্টনাট, তোন, তাড় গাছেদের গায়ের খুশবু আর "চুকার" এবং "খালিজ ফেজান্টস"-এর ডাকে

www.MurchOna.com

জেগে-ওঠা লক্ষ হীরের দ্যুতিতে ঝলমল করে-ওঠা শিশির-ভেজা চামৌলির সকাল বা বড় বিষণ্ণ 'ভগুয়া' লাল এর আকাশ-ঘেরা সন্ধের মতন সুন্দর নয়। আজকের আমাদের পৃথিবী যে বড়ই দোড়াদৌড়ির, মারামারির, প্রতিযোগিতার। বড়ি বুয়া এ কথা তোমরা না বুঝলে চলবে কী করে। চন্দ্রবদনী বলল।

এ জীবনে যা বুঝেছি, যা জেনেছি, যা শান্তি পেয়েছি তাই নিয়েই যেন বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। তোদের বুদ্ধি তোদের যুক্তি তোদেরই থাক। স্বামী বাইরের কাজ সামলাবে, রোজগার করবে, আর স্ত্রী নিজের বাড়িকে ছবির মতন সুন্দর করে রাখবে। নিজের ছেলেমেয়েকে মনের মতন করে মানুষ করবে, স্বামী ও স্ত্রী দুজনে দুজনকে খুব ভালবাসবে, এর চেয়ে ভাল গার্হস্থ্য আর কী হতে যে পারে, তা আমি তো জানি না।

চন্দ্রবদনী বলল, আজকাল যে একজনের আয়ে কারওই সংসার চলে না বড়ি বুয়া।

এই 'চলা' বলতে কে কি বোঝে তার উপরেই সব নির্ভর করে। এই চলার তো শেষ নেই। উপরে তাকাবার শেষ নেই। সুখ কাকে বলে, সে কথা তোদের মতন মেমসাহেবরা যে কখনই জানবি না। সুখ আর আরাম যে কোনওদিনও এক কথা ছিল না রে বেটি।

"সুখ" একটা মানসিক অবস্থা। সুখের সঙ্গে কোনওরকম Material Gains-এর কোনওদিনই কোনও সাযুজ্য ছিল না।

নিজের সহোদরার স্বপক্ষে বললেন, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কেশর সিং সাহাব।

তারপরই বললেন, চারণকে, তুমি কি ইংরেজ দার্শনিক Bertand Russell-এর Conquest of Happiness বইটা পড়েছে?

না তো!

বলেই বলল, আপনার তো অনেক পড়াশোনা।

উনি হেসে বললেন, আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা বেশি পড়িনি বেটা। কিন্তু যতটুকু পড়েছি তা থেকে শেখার বা জানার মতন অনেক কিছুই পেয়েছি। গানের বেলাও তাই। আজকের মতন ব্যাঙ, ঝিঁঝিপোকা, গিরগিটি, তক্ষক, দাঁড়কাক, ষাঁড় সকলেই তখন ক্যাসেট করত না? যে যাই করত, তার পেছনে দীর্ঘদিনের সাধনা থাকত। শর্ট-কার্টও বা ফাঁকিতে জগৎ মাৎ করার প্রবৃত্তি ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, আত্মসম্মান আর লজ্জাবোধ তখনও ছিল মানুষের। জানি না কেন, হয়তো বুড়ো হয়েছি বলেই এখন মনে হয়, তরুণতর প্রজন্মর এমন অনেক গুণই আছে যা আমাদের ছিল না। আবার একথাও মনে হয় যে, তাঁদের এমন অনেক দোষও আছে, যা আমাদের ছিল না।

Russell কি বলেছিলেন তাই বলুন, মানে ওই বইয়ে?

চারণ বলল।

Russell বলেছিলেন, সুখি হওয়ার কথা। সুখি হতে পারা তো আর সহজ কাজ নয়। এভারেস্ট জয়ের মতনই কঠিন কাজ। তাই নাম দিয়েছিলেন বইয়ের "The Conquest of Happiness"। সুখ-অসুখ-এর একটি উদাহরণও দিয়েছিলেন তাতে।

কি উদাহরণ?

লানডান-এর এক টিউব স্টেশনে একটি সুন্দরী মেয়ে নেমে এসে প্লাটফর্ম-এ দাঁড়াল ট্রেইন-এর অপেক্ষায়। অপরূপ সুন্দরী সে। প্লাটফর্ম-এর সব মানুষ তার দিকে চেয়ে রইল। সে, সেই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখি মহিলা হয়ে গেল। সুখের দেমাকে সে ঝলমল করে উঠল।

তারপর?

তার সামান্য পরে আর একটি মেয়ে এসে নামল সেই প্লাটফর্ম-ই। তার ফিগার আরও ভাল, সে আরও অনেক বেশি সুন্দরী। এবং সে আসা মাত্র সবাই প্রথম জনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দ্বিতীয় জনকে দেখতে লাগল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম মেয়েটি পৃথিবীর দুখিতম মহিলা হয়ে গেল।

তারপর উনি একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সুখ তো থাকে যার যার বুকেরই মধ্যে। অথচ সেই খবরটাই না জেনে, আমরা সুখের খোঁজে কোথায় না কোথায় দৌড়ে বেড়াই।

www.MurchOna.com

তারপর আবারও একটু থেমে বললেন, চন্দ্রবদনীর স্বামী বাজবাহাদুর এই কথাটা বুঝত।

পাঞ্জাবিরা সাধারণত বহির্মুখী হয়, যদিও দারুণ দিলদার, মন-মৌজী হয় সকলেই। কিন্তু বাজবাহাদুর ছিল আমার বৌমার মতন, মানে চন্দুর মায়ের মতন। মানসিকভাবে যেন বাঙালিই ছিল সে। তাই তো চন্দু এবং তার মায়ের অত পছন্দ ছিল তাকে।

বলেই বললেন, দেখ তার ফোটো।

চারণ বসার ঘরের দেওয়ালে চেয়ে দেখল, এয়ার-ফোর্সের উনিফর্ম পরা নয়, ক্যাজুয়াল পোশাকে এক অতি বুদ্ধিমান, উজ্জ্বল-চোখের পুরুষ।

তার তুলনাতে নিজেকে ছুঁচো বলে মনে হল চারণের।

চন্দ্রবদনীর মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করল না চারণ।

তাছাড়া সুখ ব্যাপারটা সবসময়ই রিলেটিভ ব্যাপার। যে কথা Russell অতদিন আগে বলে গেলেন। সেই কথা আজও আমরা, মানে সারা পৃথিবীর মানুষই বুঝতে পারলাম না। উনি বলেছিলেন, ''We do not struggle for existence, we struggle to outshine our neighbours.''

আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী কেউই যেন আমার চেয়ে ভাল না থাকে, কারও বাড়ি, গাড়ি, আসবাব, আজকাল তো আরও কত কী হয়েছে, মাইক্রোআভেন, ভিডিওক্যামেরা সে সব যেন আদৌ না হয় তাদের। আমার চেয়ে ভাল বা উঁচুদরের, কারওই যেন না হয়। এই একমাত্র প্রার্থনা হলেই মুশকিল। দুঃখে মরে যায় মানুষে। কী দুঃখ! কী দুঃখ!

বড়ি বুয়া বললেন, এই মিথ্যার মরীচিকার পেছনে দৌড়বার কি শেষ আছে কোনও? কোনও ধর্মই মানুষকে লোভী হতে শেখায় না। বস্তুবাদী হতে শেখায় না। পরকে হিংসা করতে তো বটেই, দ্বেষ করতে বা ঈর্ষা করতেও শেখায় ন। তা সে ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানিজম, শিখ বা যাই হোক না কেন।

শেখর সিং সাহেব বললেন, আসলে মানুষ হিসেবে আমরা অনেকই নিকৃষ্ট হয়ে গেছি। ভোগ্যপণ্যর যোগান যত বেড়েছে, শরীরে এবং মনের শ্রমহ্রাসের নানা যন্ত্র যতই আবিষ্কৃত হয়েছে, মানুষ ততই নিকৃষ্ট হয়েছে চরিত্রে। তারা মনুষ্যত্ব থেকে তীব্রবেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

চারণ চুপ করে ভাবছিল।

চন্দ্রবদনী বলল, দাদু আর একটা কথা বললেন না আপনি Russell-এর ওই বইয়ের।

কি কথা?

সেই যে উনি বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের Industrial Revolution ঘটে যাওয়ার পরে মানুষেরই উদ্ভাবিত সব যন্ত্রপাতি যত সাধারণ, একঘেয়ে, mundane, কাজ, তার ভার নিয়ে নেবে আর মানুষে তখন অনেক বেশি সময়ে পাবে মানবিক কাজ করার জন্যে। ''To do the humane things.''

শেখর সিং সাহেব বললেন, আর আজ কি ঘটল বল? এত যুগ পরে মানুষ তার কায়িকশ্রম তো সব বিসর্জন দিলই এমনকি মস্তিষ্কও ইজারা দিল Computer নামক যন্ত্রকে। সারা বিশ্বে এখন Computer-এর জয়জয়কার।

বড়ি-বুয়া বললেন, একদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে, সে আসলে গুহামানবের সভ্যতাতেই নিজ পায়ে হেঁটে যে ফিরে গেছে। বেশিদিন দেরি নেই আর। যা কিছু গড়ে তুলেছিল মানুষের মতন মানুষেরা সারা পৃথিবীতে, মানবিক, মন-নির্ভর, মস্তিষ্ক-নির্ভর সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি ইত্যাদি তার সবকিছুকেই সে সঁপে দিয়েছে Computer-এর হাতে।

এই ক্রিয়াকাণ্ডর মাধ্যমে সে নিজের সবরকম নিজস্বতাকেই বিসর্জন দিতে যে বসেছে এই কথা বোঝার মতন মানুষ এখন আর বেশি নেই। বিজ্ঞানের, বিজ্ঞাপনের জয়ধ্বনির মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতর রব কারও কানে পৌঁছচ্ছে না। সকলেই ভাবছে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! কিন্তু অদূর ভবিষ্যতও যে কি বয়ে আনবে তাদের জন্যে সে সম্বন্ধে কারওই কোনও ধারণাই নেই। ওই কম্প্যুটারের বোতামেই মানুষের মরণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে। ''লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু''-এর

www.MurchOna.com

চেয়ে বড় সত্য আর নেই। এটা ভাবলেও এই পাহাড়চুড়োর গ্রামে বসে আতঙ্কিত বোধ করি আমি। জানি না মানুষের এই বিজ্ঞান-মনস্কতা, ঈশ্বর-অবিশ্বাস এবং যন্ত্রনির্ভরতা মানুষকে কোথায় কোন সুগভীর কণ্টকাকীর্ণ গিরিখাদের দিকে তাড়িত করছে। কোন রাহু ভর করেছে এই ঈশ্বরবোধ-রহিত ভোগবাদী দু-পেয়েদের।

চারণের মনে হল যে, এসব কথা কখনও যে তার মনেও আসেনি এমন নয়। স্বভাবতই ও শিশুকাল থেকেই বিজ্ঞানবিরোধী, যন্ত্রবিরোধী। এই বিজ্ঞানের যুগেও। বিজ্ঞানের এই রগরগে অগ্রগতি মানুষের ভোগবিলাস আর অর্থর যোগান অবশ্যই বাড়াবে, আরও আয়েসী করবে তাদের, কিন্তু সুখি কি করবে আদৌ ? এইসব প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছিল বলেই সে কলকাতা ছেড়ে এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে হলেও এই সাধুসন্তদের মধ্যে এসে সেইসব প্রশ্নর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে। সন্তদের এই অনাড়ম্বর কষ্টের জীবনের মধ্যে তাঁদের সুখটা যে কোথায় লুকিয়ে আছে সেটাই খুঁজতে এসেছে। তাই স্বাভাবিক কারণে চন্দ্রবদনীর দাদু আর চন্দ্রবদনীকেও ভাল করে জেনে ভারী ভাল লাগছে ওর। পাটনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। অতি গভীর কৃতজ্ঞতা।

এখন কোথাওই আর কোনও শব্দ নেই। সব দরজা-জানালাও তো বন্ধই। তবে রাত গভীর হওয়াতে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে-যাওয়া অলকানন্দার মৃদু শব্দ উঠে আসছে, একটানা, মর্মরধ্বনির মতন। নদীর বুকের উপরে উপরে কোনও রাত-চরা পাখি ডাকছে উড়তে উড়তে। তার ক্ষীণ কিন্তু সি-শার্প-এ উচ্চারিত তীক্ষ্ণ ডাক, নদীর শব্দের সঙ্গে বন্ধ দরজা-জানালাতে এসে মৃদু করাঘাত করছে।

চারণের পাশের ঘরই চন্দ্রবদনীর। মধ্যের দরজাতে খিল-তোলা। ওদিকেও খিল আছে। চন্দ্রবদনী খিল তুলতে বলেনি। তবু চারণ খিল তুলে দিয়েছে। দরজার ওদিকেও খিল তোলা কি না, জানে না চারণ।

ভাবছিল ও, ইট-কাঠ-কংক্রিকেটর দরজাতে কত সহজে খিল তুলে দেওয়া যায়। এদিক-ওদিক-সবদিকের দরজাতেই। কিন্তু একজন মানুষের মনে যে অগণ্য অদৃশ্য দরজা-জানালা থাকে— লোভের, আশার, আকাঙ্ক্ষার, বাসনার, কামনার সেই সব তাতেও খিল তুলে, এক ঘর থেকে অন্য ঘরকে নিশ্ছিদ্র আড়াল তুলে দুর্ভেদ্য করা যদি যেত, তবে কী ভালই না হত।

এই ঘরটাই চুকারের। ঘরের বইপত্র, বাথরুমের দরজার পিঠে লাগানো হ্যাঙ্গার থেকে ঝুলিয়ে-রাখা, শেষ রাতে ছেড়ে যাওয়া, একটি ফেডেড জিনস এবং দেওয়ালে চে-গুয়েভারা আর হো-চি-মিন-এর ছবি দেখে এই ঘরের মালিকের বয়স এবং মানসিকতা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

পাটন, চারণকে যে সব কথা বলেছিল, বিদ্রোহের কথা, উত্তরাখণ্ডর স্বীকৃতির কথা সে সব শুনে চারণ কিছুই বলেনি। বলেনি, কারণ চারণ মনে মনে অত্যন্তই প্রগতিবাদী। ছাত্ররা এবং যুবারা যদি সবসময়ে সজীব না থাকে তাদের ন্যায্য দাবি (যে দাবিকে, তারা অন্তত নিজেদের বিবেকমান্যতাতে ন্যায্য বলে মনে করে) নিয়ে সোচ্চার না হয়, তবে তো তাদের শিক্ষাই বৃথা।

ওর মনে পড়ে গেল ড. সর্ভপল্লী রাধাকৃষ্ণান লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "If we are to preserve ourselves; we must use the lighted torch, the cleansing fire, the spirit that rebels...we hear on all sides about the revolt of youth. I am afraid I have a good deal of sympathy with this attitude of revolt, and my complaint is, that it is not sufficiently widespread,"

যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্তব্য নির্দেশ উনি বলেছিলেন :

"Any university that produced graduate who played for safety and cared for comfort had failed in its eventual task. Timidity and conservation were the greatest dangers to the society."

তবে যা নিয়ে বিপ্লব, যা নিয়ে বিদ্রোহ, তা সত্য ও ন্যায্য কারণের জন্যে হতে হবে।

www.MurchOna.com

কিন্তু এও ঠিক যে, এই আন্দোলন ও বিপ্লবের অন্য একটি পিঠও আছে। ভাঙা একবার আরম্ভ হলে, টুকরো হওয়া আরম্ভ হলে, কত টুকরো যে হবে তা কেউই বলতে পারে না। "বিপ্লব" বা "আন্দোলন" করার মতন অবস্থার মধ্যে যাতে দেশের কোনও রাজ্যের অধিবাসীদেরই পড়তে না হয়, অসন্তোষ যাতে ধিকিধিকি আগুন হয়ে না জ্বলে কোনও রাজ্যবাসীরই মনে, তা কেন্দ্রর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার দায়িত্বে যাঁরা থাকেন বা ছিলেন, তাঁরা যদি প্রথম দিন থেকে মনে রাখতেন তবে আজ সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই এমন এমন আগ্নেয়গিরিসুলভ অবস্থার উদ্ভব হত না। হওয়া আদৌ উচিতও ছিল না। উরুগুয়ের টুপামারো বা ফিলিপিনস-এর হুকস্‌রা যা বলেন এবং পাটনও গতকাল যা বলছিল : "If the country does not belong to everyone it will belong to no one." তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে চারণের। চারণ Rigis Debray-র সেই বিখ্যাত উক্তিতেও বিশ্বাস করে "For a revolutionary, failure is a springboard. As a source of theory it is richer than Victory as it accumulates experience and knowledge."

কিন্তু একই সঙ্গে চারণের T.S. Ellot-এর বিখ্যাত পংক্তিগুলির কথাও মনে হয় :

"Time present and time past.
Are both perhaps present in time future,
And time future is contained in time past."

সারা দিনের নানা সুখকর ঘটনার পরে শুয়ে শুয়ে কত কথাই যে মনে হচ্ছে চারণের। শরীরের বিশ্রাম হয় কিন্তু মননশীল মানুষের মন কি কখনওই বিশ্রাম পায় ?

একটা সুগন্ধি লেপ বের করে দিয়েছেন বড়ি বুয়া চারণের জন্যে। অতিথিদের জন্যে সম্ভবত আলাদা করে রাখা থাকে। পরিষ্কার ওয়াড় পরানো। সম্ভবত আতরও লাগানো।

চারণ ভাবছিল, সচ্ছলতার নিজস্ব কোনও বিশেষ গুণ না থাকলেও তা এক এমন পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, তার ভাগীদার হতে পেরে ভালই লাগে। তবে সেই সচ্ছলতা অবশ্যই সৎপথে অর্জিত হওয়া উচিত।

'বড়ি বুয়ার' কচি-কলাপাতা-রঙা উল দিয়ে তার জন্যে সোয়েটার বোনা দেখে চারণের মনের মধ্যেও নানা-রঙা উলের লাছির ভিড় জমতে শুরু করে ছিল। সে মুহূর্ত থেকেই ওর মন এক সুখানুভূতিতে ছেয়ে গেছে। চন্দ্রবদনীর চোখেও কি সেই সময়ে কিছু ও দেখেছিল ? কে জানে। সেই মুহূর্তে নিজেকে যেন সদ্য-যুবক বলে মনে হচ্ছিল, অনভিজ্ঞ, এমন কি সন্দেহহীনভাবে অজ্ঞ বলেও, যে নির্মল অজ্ঞতা, মানুষকে স্বর্গদ্বারে নিয়ে যায় (যে Ignorance is Bliss!)।

বিছানাতে এপাশ ওপাশ করছিল চারণ। ঘুম আসছিল না। অথচ অতখানি পাহাড় চড়েছে, আসা উচিত ছিল। এমন হয় কখনও কখনও। ঔচিত্য, অনৌচিত্যতে পর্যবসিত হয়।

পাশের ঘরে চন্দ্রবদনীও উসখুস করছে মনে হল। তার চুরির রিনঠিন, পায়জোরের অস্পষ্ট ঝুনুঝুনু। কি পরে শুয়েছে চন্দ্রবদনী, কে জানে। তারও কি ঘুম আসছে না ? তারপরই ও ভাবল, চন্দ্রবদনীর মতন রূপসী এবং সর্বগুণসম্পন্না এক নারীর মনে চারণ সম্বন্ধে কী করে এমন বৈকল্য জন্মাল ? সত্যিই কি জন্মাল ? এও কি সম্ভব ? এত তাড়াতাড়ি কি ভুলে যেতে পারল এই বিধবা তার স্বামী রাজবাহাদুরকে ?

তারপরেই মনে পড়ল, কটক শহরের বাখরাবাদে এক রাতে এক সধবা নারীর মনে এবং শরীরেও অমনই বৈকল্য ঘটেছিল।

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম দেবা না জানন্তি,
কুতো মনুষ্যাঃ।"

তার নিজের শরীর মনের কথাও তার নিজের তো অজানাই, হয়তো দেবতাদেরও অজানা। শুধু নারীদের দোষ দিয়ে কি লাভ ? কখন যে কি ঘটে, আগে থাকতে কে বলতে পারে !

ওর মনে পড়ে গেল বাখরাবাদের সেই রাতের কথা। তুলিও এমনই পাশের ঘরেই শুয়েছিল। মাঝরাতে যখন চারণ তার ঘরের দরজাতে মৃদু করাঘাত শুনল, তখন ভেবেছিল, চোর এল কি ?

www.MurchOna.com

নতুন জায়গাতে, নতুন বিছানাতে, প্রথম রাতে খুবই দেরি করে ঘুম আসে কিন্তু ঘুম আসার পর হঠাৎ কোনও কারণে ঘুম ভেঙে গেলে ওর মনে হয় নিজের বাড়ির শোওয়ার ঘরেই বুঝি শুয়ে আছে। এমন বোধহয় সকলেরই মনে হয়। তা যে নয়, তা বুঝতে সময় লাগে একটু।

পরমুহূর্তেই ভেবেছিল, চোর আর কবে কার ঘরে মৃদু করাঘাত করে ঢুকেছে? কি করবে, তা ভেবে না পেয়ে চারণ উঠে বসেছিল খাটে। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলেছিল যথাসম্ভব কম শব্দ করে। ওর মনে করাঘাতের শব্দতেই একটি সন্দেহ জেগেছিল। খুলেই, আতঙ্কিত হয়েছিল মাঝরাতে তুলিকে দরজাতে দেখে। কি করবে তা বুঝে উঠতে পারার আগেই তুলি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এসেছিল। পরণে ফিকে গোলাপি নাইটির উপরে গাঢ় গোলাপি হাউসকোট।

কি করছেন? কি করছেন?

ফিসফিস করে বলেছিল চারণ। উদ্বিগ্ন, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে।

তখনও তুলিকে ও আপনি করেই সম্বোধন করত। তার কিছুদিন পরে তুলিরই আবদারে "তুমি" বলত। তুলি বলত, যার "বড় আদর" খাই, সে আপনি বললে লজ্জা করে।

ঘরে ঢুকে, তুলি নিজেই ছিটকিনি তুলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে চারণের পায়ের কাছে বসে হাঁটুর একটু উপরে, দুউরুর মধ্যে তার মুখটি রেখেছিল। থরথর করে কাঁপছিল উত্তেজনাতে, ভয়ে এবং হয়তো পাপবোধেও চারণের শরীর। তারপরেই চারণ লক্ষ করেছিল যে, তুলির চোখের জলে তার পায়জামার দুহাঁটুর উপরের অংশটুকু ভিজে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বড় করুণা হয়েছিল তুলির ওপরে, কষ্ট হয়েছিল ওর জন্যে, মায়া হয়েছিল, দয়া এবং আরও কী কী যে হয়েছিল তা ও জানে না। সব অন্যায়বোধ, পাপবোধ, ভয়, উত্তেজনা, আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে নিচু হয়ে দুহাতে তুলিকে কোলে তুলে নিয়ে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়েছিল। আজকে মনে পড়ছে সেই বিছানাতেও আতরের গন্ধ ছিল, অম্বর আতরের। আর আজ বুড়ি-বুয়ার দেওয়া রজাইতে আছে রুহ খসস-এর গন্ধ।

তারপরে অনভিজ্ঞ চারণকে কিছুই করতে হয়নি আর। তৃষিতা, বেচারি কিন্তু অভিজ্ঞা তুলিই করল যা কিছু করার একে একে।

চারণ শুধু ভয় পেয়ে অস্ফুটে একবার বলেছিল, যদি...অ্যাকসিডেন্ট?

তুলি প্রায়ান্ধকার ঘরে তার উষ্ণ কোমল পুষ্ট ঠোঁটে চারণের আধোখোলা ঠোঁটদুটি চেপে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লাইগেশান করা আছে। .....দশ বছর। কথা বলবেন না এখন।

বর্ষার বাগান থেকে রজনীগন্ধা আর বেলফুলের গন্ধ উড়ছিল। একটা মস্ত কনকচাঁপা গাছ ছিল তুলিদের বাড়ির বাগানের গেটের পাশে। কনকচাঁপার তীব্র গন্ধ ভাসছিল বৃষ্টি শেষের হাওয়াতে। পরিবেশে। সেই রাতটি ছিল শুক্লপক্ষের। সপ্তমী কী অষ্টমী হবে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আধখানা চাঁদের আলো জানালার কাছের কাঁঠালগাছেদের ভিজে পাতাতে পড়ে পিছলে আসছিল খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে। স্নিগ্ধ দুধলি আলোর আভাসে আভাসিত করেছিল তুলির পেঁজা-তুলোর মতন স্নিগ্ধ, সুগন্ধি নগ্নতাকে। দূরে বহমানা মহানদীর জলের গন্ধ আসছিল জোলো হাওয়াতে।

সেই বহুদূরে ফেলে-আসা রাতটাকে এখনও কোনও স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয় চারণের। কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে ছাই হয়ে-যাওয়া উনচল্লিশ বছরের তুলির অস্তিত্বটাও এক স্বপ্ন বলে মনে হয়।

পাটনের সঙ্গে এখানে দেখা না হলে সেই সব কথা, মনে হয়তো আসতও না। সেই রাতেই বুঝেছিল চারণ যে, নারীরা পুরুষদের থেকে অনেক, অনেকই বেশি সাহসী। জীবনের সব ব্যাপারেই। কী রণে, কী রমণে।

রুদ্রপ্রয়াগে চন্দ্রবদনীদের বাড়ির উঠোনের সামনেই যে মস্ত সিলভার-ওক গাছটি আছে, তার মগডাল থেকে কোনও বড় রাতচরা শিকারি ঈগল হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল।

চমকে উঠেছিল চারণ।

নিজেকে বকল চারণ। ও নিজেও কি রাতের শিকারি পাখিরই মতন?

www.MurchOna.com

ছিঃ ! ছিঃ !

নাঃ। চারণ বলল নিজেকে, কী করতে এই দেবভূমিতে এসেছিলে, কী খুঁজতে এসেছিলে পাতক ? আর মনের মধ্যে কি পরম স্বার্থপরায়ণ ও সাধারণ সব Mundane স্থূল ভাবনা উঁকি-ঝুঁকি মারছে অনেকক্ষণ থেকে ! ছিঃ। শরীরের মতন Mundane ব্যাপার মনসর্বস্ব শিক্ষিত মানুষের কাছে আর কি আছে ? ও তো নিজেকে মনসর্বস্ব জেনে চিরদিনই শ্লাঘাবোধ করে এসেছে। আত্মার শুদ্ধি সম্পূর্ণ করতে এসে কি শরীরসর্বস্ব করে তুলল নিজেকে ?

মনে মনে অন্য প্রসঙ্গে ফিরল ও।

চন্দ্রবদনীর দাদু কেশর সিং সাহেব বলেছিলেন ধম্মপদের উপদেশের কথা। ভারী ভাল লাগছিল শুনতে। যদিও কয়েকটির কথাই মাত্র বলেছিলেন উনি চারণকে। তাও ক্রমানুসারে নয়। যেমন যেমন মনে এসেছিল তাঁর তেমন তেমনই বলেছিলেন।

(১) বলেছিলেন, ঘৃণাকে কখনও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না। প্রেমই একমাত্র বোধ যা দিয়ে ঘৃণাকে জয় করা যায়।

(২) একজন মূর্খ, যে নিজেই জানে যে সে মূর্খ, শুধু সেই কারণেই সে একজন জ্ঞানী মানুষ। যে মূর্খ নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে সে অবশ্যই মূর্খ।

(৩) যদি কেউ হাজার মানুষকে কোনও যুদ্ধে পরাস্ত করে থাকেন তিনি তো মহাবীর। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় বীর তিনি, যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন।

(৪) যদি কেউ একশ বছর বেঁচেও পরম সত্য যা তাকে না জেনে থাকেন তবে যিনি সেই সত্যকে জেনে গেলেন তাঁর মাত্র একদিনের জীবনও অনেক মূল্যবান প্রথমজনের জীবনের চেয়ে।

একটু থেমে থেমে, চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দা ধম্মপদের এই নিদানগুলি যখন বলছিলেন তাঁর রোদ-পোড়া হলদেটে-তামাটে মুখে ফানুসের মতন একটি হাসি ঝুলেছিল।

শেষে উনি শেষ উপদেশটা বলেছিলেন :

মৃত্যুর হাত থেকে কারওকেই কারও ছেলে বা কারও বাবা বাঁচাতে পারেন না। মৃত্যু যখন দরজাতে কড়া নাড়ে তখন তার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন না জ্ঞাতিগুষ্টি, প্রজা বা শাস্ত্রীরাও, কেউই পারে না। মৃত্যু অমোঘ, অবিসংবাদী।

হৃষীকেশ থেকে যে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা এসেছিল, সেটাকে সম্ভবত হোটেলের অমিতাভই হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে মানা করেছিল। চন্দ্রবদনীদের বাড়িতে যেতে হলে যেখানে বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চড়াইয়ে উঠতে হয়, সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল গাড়িটাকে সে।

চন্দ্রবদনীর সঙ্গে তার ঠাকুর্দা কেশর সিং সাহেব এবং চামৌলির "বড়ি বুয়ার" আশীর্বাদ নিয়ে নেমে এসে গাড়িতে যখন উঠল চারণ, তখন আলো ফুটে গেছে, তবে রোদ আসেনি। পাহাড়তলিতে তো বটেই, অলকানন্দাতেও।

নদীরও রূপ, সমুদ্রেরই মতন, দিনে রাতের প্রহরে প্রহরে যে কত বিভিন্ন হয়, তা এই সব অঞ্চলে এসে লক্ষ করে ও অবাক হয়েছে।

নদী তো এর আগেও কতই দেখেছে ! কিন্তু যেখানেই গেছে এর আগে বেড়াতে, সেখানেই হয়তো ওর কলকাতার মনটা আর চোখদুটিকে কলকাতার অনুষঙ্গের সঙ্গে সাথী করে বয়ে নিয়ে গেছে। এই বোধহয় প্রথমবার নিজের উপরে নিজে তিতিবিরক্ত হয়ে, নিজের জীর্ণ, মলিন, অভ্যেসে-অভ্যেসে পরাভূত "আমিটা"র ভিতর থেকে ওর "অন্য" আমিকে নিয়ে এই দেবভূমিতে

www.MurchOna.com

এসেছে। অন্যত্র যখন গেছে এর আগে চোখ দিয়ে দেখেছে অনেক কিছুই। কিন্তু আবার দেখেওনি। মানে, চোখ দিয়ে দেখেছে, মন দিয়ে দেখেনি। তাই এবারের চারণের জন্যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন চমক উপস্থিত হচ্ছে। চারণের জীবন সাম্প্রতিক অতীত থেকেই কোনও এক আশ্চর্য যাদুকরের যাদুদণ্ডের পরশে সত্যিই নতুন হয়ে উঠেছে। নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছে ও। প্রতিমুহূর্তে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। অলকানন্দার উপরের ছোট ব্রিজ পেরিয়ে এখন চলেছে অলকানন্দাকে ডানপাশে রেখে শ্রীনগরের দিকে। দেখতে দেখতে জিম করবেট-এর রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতা শিকারের জায়গাটাও পেরিয়ে এল ওরা। পাটনের বর্ণনা-দেওয়া সেই বোর্ডটিও দেখল। এক ঝলক মাত্র, চলন্ত গাড়ি থেকে।

চন্দ্রবদনী বলল, দিনের এই সময়টুকুকে ভারী ভাল লাগে আমার।

তাই ?

হুঁ।

পউরিতে যাওয়ার কি অন্য কোনও পথ নেই ?

এখান থেকে ? না, এখান থেকে একটিই পথ।

শ্রীনগর হয়ে ?

হ্যাঁ।

শ্রীনগরের উচ্চতা কত ?

শ্রীনগর উপত্যকায়। সমতলও। তবে সমুদ্রতল থেকে দুহাজার ফিট মতন হবে। কেন ? দেবপ্রয়াগ থেকে আসবার সময়েতো শ্রীনগর হয়েই এসেছিলেন ! লক্ষ করেননি বুঝি।

ফিট কেন ? মিটার নয় কেন ?

বলেই বলল। আমরা অবশ্য "সতেরোশ ষাট গজে মাইল" এই হিসেবই জেনে এসেছি। আমি গোঁড়া মানুষ। ক্যালকুলেটরও ব্যবহার করতে পারি। পারি না, না। অথবা করি না।

বাঃ।

বাঃ কেন ?

আমিও পারি না।

চন্দ্রবদনী বলল, লজ্জিত না হয়েই। কম্প্যুটারের যুগে যে-মানুষ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারে না তার অবশ্যই লজ্জা হওয়া উচিত। তবু হয় না দেখেই লজ্জিত হয়।

চারণ শুধোল, এই জায়গাটির কি নাম ?

চান্টিখাল।

তারপরই বলল, আশ্চর্য ! দেখতে দেখতে আমরা দশ মাইল চলে এলাম।

অর্থাৎ ষোলো কিমি মতন ?

হবে।

রুদ্রপ্রয়াগের উচ্চতা কত ?

দুহাজার ফিট মতো।

এই চান্টিখাল থেকে শ্রীনগর কতদূর পড়বে ?

বারো-তেরো মাইল হবে।

শ্রীনগর থেকে কোনদিকে যাব আমরা ?

আপনি পাটনের সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছেন, দেবপ্রয়াগ হয়ে, অলকানন্দার বাঁপাশ থেকে ডানপাশে নতুন সেতু পেরিয়ে, সেই পথে না গিয়ে আমরা চলে যাব শ্রীকোট হয়ে পউরি। চীর, পাইন, দেওদার-এর সুগন্ধি বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় খাড়া চড়াইয়ে। পউরির উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট মতন।

আপনার পউরিতে কি কাজ ?

www.MurchOna.com

কাজ তো তেমন কিছু নেই ! আমার শ্বাশুড়ি ওখানে এসে রয়েছেন ট্যুরিস্ট লজ-এ। চেঞ্জের জন্যে। প্রতি বছরই এখানে এই সময়ে এসে থাকেন দিন পনেরো।

ও।

চারণের মনে নানারকম ভাবনা এল। চন্দ্রবদনী, তার বাড়ি, তার ঠাকুর্দা, তার বড়ি-বুয়া পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল। যদিও চুকারের সঙ্গে দেখা হল না। কিন্তু চন্দ্রবদনীর চলে যাওয়া স্বামীর মায়ের কাছে, কাছে মানে, তার শ্বাশুড়ির কাছে তাকে হাজির করানোর পেছনে কি অভিপ্রায় থাকতে পারে, তা ভেবে পেল না চারণ। চন্দ্রবদনী স্থানীয় মেয়ে এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ, শিক্ষিত মেয়ে। তার পক্ষে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে পউরি একা একা যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। অথচ পাটন কেন যে চারণের জিম্মায় দিল তাকে, তা কে জানে ! এর পেছনেও কি কোনও চক্রান্ত আছে ? He can very well small a rat। সে কি জ্যোতি বসু হয়ে যাবে ? চতুর্দিকেই, তাঁর নিজ মতে, গভীর চক্রান্ত-বেষ্টিত ?

মুখে সে প্রসঙ্গে কিছু না বলে, চারণ বলল, পউরি জায়গাটাতে কী আছে ? দেখার মতন কিছু আছে ?

দেখার মতন কিছু আছে কি নেই সে কথা তো যে দেখে তার চোখ, আর যাকে বা যা দেখে, তার গুণপনার উপরেই নির্ভর করে। তৃতীয় জনের কি কোনও এক্তিয়ার আছে সে বিষয়ে মন্তব্য করবার ? তবে ?

পউরি, জওহরলাল নেহরুর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা ছিল। বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা হিসেবে। এখান থেকে যে কতগুলি বরফাবৃত চুড়ো পরিষ্কার দেখা যায়, তা বলার নয় ! ট্যুরিস্ট লজ-এর বাগানে রোদের মধ্যে চেয়ার পেতে বসে থাকলেই দিন কেটে যায়। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত তো এই দৃশ্যের কোনও তুলনাই নেই।

কোন কোন পিক দেখা যায় ?

কত নাম বলব ? যেমন, স্বর্গারোহিনী, চৌখাম্বা, হাতিপর্বত, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, কামলিং...

বা বাঃ। আপনিও ভুগোলের দিদিমণি হয়ে গেলেন দেখছি।

আরও আছে।

যেমন, সুমেরু পর্বত, খর্চাকুণ্ড। কেদারনাথ তো আছেই ! এ ছাড়াও আছে বান্দরপুঞ্ছ, ভৃগুপন্থ, জৌনলি, গঙ্গোত্রী গ্রুপ ইত্যাদি।

এ সবই শৃঙ্গ ?

হ্যাঁ।

এত শৃঙ্গর মধ্যে বাস করে কেউ ? শৃঙ্গবিদ্ধ হয় না ?

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, যাদের মধ্যে বিদ্ধ হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তারা হয়তো হয়।

চারণ হেসে বলল, বাবাঃ এক নাগাড়ে ট্যুরিস্ট গাইডেরাও এত নাম আউড়াতে পারবে না।

হাসল, চন্দ্রবদনী।

রোদে এখন চারপাশ ঝলমল করছে। রোদ এসে পড়েছে চন্দ্রবদনীর কোলে।

হালকা ছাই-রঙা একটি শান্তিপুরী শাড়ি পরেছে ও। সাদা ব্লাউজ। শাড়ির পাড় গাঢ় খয়েরি। চুলে একটি সাদা চন্দ্রমল্লিকা গুঁজেছে। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মতন কার্তিকের প্রথম চন্দ্রমল্লিকা। আ লিটল আর্লি ফর দ্যা সিজন, দো। গায়ে একটি ছাইরঙা পশমিনা শাল। তার শরীর থেকে ফিরদৌস আতরের হালকা খুশবু উড়ছে। কেন জানে না, ভারী ভাল লাগছে চারণের। এত ভাল বহুদিন, বহু বছর লাগেনি। তুলির কাছাকাছি যখন থাকত, তখন ছাড়া। তাও শেষের দিকে তুলির সঙ্গও তেমন ভাল লাগত না।

এই মুহূর্তে, এক গভীর কারণহীন প্রশান্তি তার মনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছে। কেন জানে না, বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে শরীর পৌনঃপুনিক ভাবে এসে গেলেই সম্পর্কর জেল্লাটা সম্ভবত চটে যায়। শারীরিক ব্যাপার মাত্রই বোধহয় স্থূল। কিংবা কে

www.MurchOna.com

জানে ! চারণের মানসিকতাটাই বোধহয় অস্বাভাবিক সূক্ষ্ম। সবরকম স্থূলতার সঙ্গেই তার জন্মবিরোধ। আর সে জন্যেই তো এত এবং এতরকম কষ্ট ওর ! জয়িতার মানসিক সঙ্গয় ও খুবই আনন্দ পেত, কিন্তু যে মুহূর্তে চারণ বুঝে গেছিল যে, জয়িতা তাকে ভালবাসে না, ভালবাসা ভালবাসা খেলা করে মাত্র, ধড়িবাজ বেড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলে, সেই মুহূর্তেই জয়িতার প্রতি সব দুর্বলতাই আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল। তবু, জয়িতার মধ্যেও ভাললাগার মতন অনেক কিছুই ছিল। প্রতিরাতেই জয়িতাকে ফোন করত একবার করে পুরনো অভ্যেসের বশে। কোনও কোনও উইক-এন্ডে বা রবিবার তাজ-বেঙ্গলে কী ওবেরয় গ্রান্ডে কী অম্বারের দোতলাতে বা বেঙ্গল-ক্লাব বা স্যুইমিং ক্লাবে খেতে যেত ওকে নিয়ে। একদিন "পিয়ারলেস ইন"-এর আহেলীতে গিয়ে বাঙালি খানাও খেয়েছিল। কিন্তু সেই সব ক্ষিদেহীন খাওয়া, প্রেমহীন কাম এরই মতন মনকে আলোড়িত করত না আদৌ। সেই সব outing-ও অভ্যেসেই পর্যবসিত হয়ে গেছিল। চারণের মতনই হয়তো অনেক আধুনিক, শিক্ষিত, কৃতী মানুষই বোঝেন যে, জীবনে অন্য অনেক বিপদের হাত থেকেই বাঁচা যায়, বাঁচা যায় না একঘেয়েমি, অভ্যেসের দাগা আর জরার হাত থেকে। অমন জীবন, মৃত্যুর চেয়েও অনেকই বেশি অনাকাঙ্ক্ষিত।

চন্দ্রবদনীর মধ্যে শতকরা কুড়ি ভাগ তুলির, তুলির শর্তহীন সমর্পণ-তন্ময়তা, কুড়িভাগ জয়িতার চাকচিক্য, সমাজে প্রেজেন্টেবিলিটি এবং ষাট ভাগ চন্দ্রবদনী আছে। ওরিজিনাল। তার কোনওই প্রোটাটাইপ বা বিকল্প নেই। চন্দ্রবদনীর মতন মেয়ে হয়তো ভারতবর্ষে একটিই ! গাড়োয়াল হিমালয়ের বরফাবৃত একমাত্র শৃঙ্গ, কুঞ্জাপুরী থেকে দেখা চন্দ্রবদনীরই মতন।

লোকজন গাড়িঘোড়া দেখছি আজ শ্রীনগরে এখনও খুবই কম। ভালই হল। আমরা ফাঁকায় ফাঁকায় পউরির রাস্তাতে উঠে যেতে পারব।

চন্দ্রবদনী বলল।

প্রায় আটটা তো বাজে। শহর যেন সত্যিই আজ একটু বেশি ঘুমঘোরে আছে বলে মনে হচ্ছে। আসবার সময়ে এগারোটা নাগাদ এসে পৌঁছেছিলাম। তখন প্রায় কলকাতা শহর বলেই মনে হয়েছিল।

চারণ বলল।

চন্দ্রবদনী বলল, এই শ্রীনগরই তো ছিল আগে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী। শ্রীনগর চিরদিন শহরই ছিল ! গোর্খাদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশের সাহায্য নেওয়ার সময়ে গাড়োয়ালের আধখানি ভেট দেন গাড়োয়াল রাজ। গাড়োয়াল যে দুভাগ হয় শুধু তাইই নয়, দুটি আলাদা নামও হয়, গাড়োয়ালের। "তেহরি" গাড়োয়াল আর "পউরি" গাড়োয়াল। গাড়োয়াল-রাজ-এর রাজধানী শ্রীনগর থেকে "তেহরিতে" স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর পউরি গাড়োয়ালের পুরোটাই চলে যায় ব্রিটিশের তাঁবে।

চারণ বলল, সেই জন্যই জিম করবেট-এর লেখাতে পড়েছি পউরির ডিভিশানাল কমিশনার, করবেট-এর বন্ধু ইব্বটসন সাহেব থাকতেন পউরিতে। জানতাম না যে পউরি, পউরি-গাড়োয়ালের হেড-কোয়ার্টার্সও ছিল পউরিতে। উঁচু জায়গা। সুন্দর নিসর্গ। সাহেবদের বেশ "হোম হোম" লাগত বোধ হয়, তাই ডিভিশানাল কমিশনার সেখানেই থাকতেন।

হয়তো তাই।

চন্দ্রবদনী বলল। অবশ্যই ওটি ছাড়াও আরও নানা কারণ ছিল।

তারপরই বলল, আজ কী বার ? রবিবার কি ?

না তো !

একটু পরেই জেগে উঠবে শহর রই-রই করে। শহর জেগে ওঠার আগেই আমরা পেরিয়ে যাব শ্রীনগর। ও, জানি না পাটন আপনাকে বলেছে কি না, এই শ্রীনগরেই কিন্তু গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ও। উত্তরাখণ্ড নিয়ে যে আন্দোলন তার Epicentre হচ্ছে শ্রীনগরের বিশ্ববিদ্যালয়।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আর বিখ্যাত কমলেশ্বর মন্দিরও এখানেই। মানুষে বলেন, এই

Chaprash by Buddhadeb Guha

[Part.2]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com